হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

১

সম্পাদনায়
গীতা দত্ত
সুখময় মুখোপাধ্যায়

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলকাতা সাত

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮—১৯৬৩ খৃ) বহুমুখী সৃষ্টিশক্তির অধিকারী। এই সৃষ্টিশক্তির নানান পরিচয় তিনি রেখে গেছেন। যদিও, আমার ধারণা মূলত তিনি ছিলেন কবি। কবিতা তিনি খুব বেশি লিখেছেন, কিম্বা কবিতা রচনাতেই তাঁর সর্বাধিক ক্ষমতা—এমন কথা বলছি না। বলতে চাই, উজ্জ্বল কোমল রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণ একজন সুকবির মানসিকতা তাঁর পুরোপুরি ছিল। মধুর কাব্যরস আস্বাদন ও বিতরণে তাঁর সবচেয়ে আনন্দ। মেজাজ ও জীবন-দর্শনে তিনি সৌখীন ও মার্জিত রুচিবোধসম্পন্ন এক উদারচেতা বনেদী বাঙালী, স্বদেশপ্রেমিক বাঙালী।

কি শিক্ষাক্ষেত্রে কি কর্মজীবনে তিনি আঁটাআঁটি বন্ধনে থাকতে পারতেন না। তিনি নিজের চেষ্টায় ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে এবং ইতিহাসে প্রচুর পড়াশুনা করে তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলের শ্রদ্ধা অর্জন করলেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথাগত শিক্ষা তথা ডিগ্রি অর্জনের দিকে আগ্রহ আদৌ দেখাননি। এরপর শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। তখনো দেখা যায় যে, ভাল ভাল চাকরি তিনি পেয়ে ছেড়ে দিয়েছেন বার বার। ক্রমে তিনি পাকাপাকিভাবে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এলেন, যাকে বলে ফুল-টাইম লেখক। এটিই তাঁর যথার্থ জায়গা। প্রথমে লিখতে লাগলেন বড়দের জন্য।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রকুমারের জীবনের ধ্রুবতারা। আজন্ম তিনি রবীন্দ্র ভক্ত। রবীন্দ্রনাথকে তিনি নিজের একমাত্র সাহিত্যগুরু বলে মানতেন। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাবার এবং ওঁর স্নেহ পাবার দুর্লভ সৌভাগ্য হেমেন্দ্রকুমারের হয়েছিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বিচিত্রা ভবনে কিম্বা শান্তিনিকেতনে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে বসে আছেন এবং মহাপুরুষ সস্নেহে তাঁর পিঠে হাত রেখে কথা বলছেন, এ দৃশ্য অনেকের দেখা।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও হেমেন্দ্রকুমারের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। সেই ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে 'যমুনা' মাসিকপত্রে শরৎচন্দ্র 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি প্রথম দিককার লেখা যখন লিখছেন এবং পাঠকেরা চমকে চমকে উঠে ভাবছেন, এ মহাশক্তিশালী লেখক কোথা থেকে এলো! প্রায় তখন থেকেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয়। পরবর্তীকালে দুজনের সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়েছিল। হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে 'সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র' নামে ছোটদের উপযোগী একটি চিত্তাকর্ষক রচনা আছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, কবি নজরুল ইসলাম সহ তৎকালীন তাবৎ শিল্পী ও সাহিত্যরথীর সঙ্গে তাঁর ভাল পরিচয় ছিল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নটশ্রেষ্ঠ শিশিরকুমার ভাদুড়ি ছিলেন তাঁর আড্ডার বন্ধু—

একেবারে গলাগলি সম্পর্ক। পেশাদার নাট্যমঞ্চের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সেখানে তিনি গান লিখতেন, নাচ শেখাতেন ও পরিকল্পনা করতেন। বিদগ্ধ নাট্য সমালোচক-রূপেও তিনি বিশেষ খ্যাতি পান। নাটক বিষয়ক একটি সাময়িক পত্রিকা 'নাচঘর' তিনি সম্পাদনা করেছেন।

কিশোর সাহিত্যে হেমেন্দ্রকুমার এলেন আচমকা। এবং "এলেন, দেখলেন, জয় করলেন" তাবৎ কিশোর কিশোরীর হৃদয়। নেহাৎ খেয়াল বশে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'মৌচাক' মাসিকপত্রে 'যকের ধন' কিশোর উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেন। দু'তিন কিস্তি প্রকাশ হতে না হতে বোঝা গেল কিস্তিমাৎ হয়ে গেছে! সম্পূর্ণ দিশী পরিবেশে, দিশী চরিত্র নিয়ে লেখা। এ অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদই আলাদা! নিজের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি আরো কয়েকটি লেখা লিখলেন। ঐ রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলি পড়বার জন্যে কিশোর কিশোরী মহলে সে কি উন্মাদনা। ক্রমে তাদের অভিভাবক মহলেও ভাললাগা সম্প্রসারিত হয়ে গেল। হেমেন্দ্রকুমারও নিজেকে পুরোপুরি ঢেলে দেন কিশোর সাহিত্যে। তাঁর যৌবনকালের শেষ থেকে আমৃত্যু ছোটদের জন্যই লেখেন গোয়েন্দাকাহিনী, রোমাঞ্চকর গল্প, অ্যাড-ভেঞ্চার, ভূতের গল্প, জীবনী, ঐতিহাসিক কাহিনী, হাসির গল্প।

তিনি যে কিশোর সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, তাতে সন্দেহ নেই। একদা তিনি বলেছিলেন—টাকা নয়, ছোটদের মিষ্ট হাসিই তাঁর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

ঈশ্বর সাক্ষী, এ পুরস্কার তিনি লক্ষ লক্ষ বার অর্জন করেছেন।

প্রধানত 'মৌচাক' মাসিকপত্র এবং দেব সাহিত্য কুটির প্রকাশন সংস্থার বার্ষিক পূজা সংখ্যাগুলির মাধ্যমে তিনি ছোটদের মুখোমুখি হন। তাছাড়া অন্য পত্র-পত্রিকা ও পূজাসংখ্যায় লিখতেন। কিছুকালের জন্য সম্পাদনা করেছিলেন 'রং মশাল' নামক কিশোর মাসিক পত্র। তাঁর লেখা ছোটদের বহুসংখ্যক বই বিভিন্ন প্রকাশকের ঘর থেকে প্রতি বছর বেরোত। এ যাবৎ তাঁর প্রচুর বই বেরিয়েছে। ছোটদের জন্যে লেখা তাঁর সমস্ত বইয়ের সঠিক হিসেব পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

ছোটদের জন্য তিনি যখন প্রথম কলম ধরেন, তারপরে দীর্ঘ সময় পার হয়েছে। তখনকার আর এখনকার পরিবেশ ও সমাজে বিরাট ব্যবধান। তবু তিনি এখনো জনপ্রিয়, কেন?

প্রথম কারণ—গল্প বলবার ক্ষমতা তাঁর ছিল এবং তিনি ছোটদের মনস্তত্ত্ব ভাল বুঝতেন। তাঁর গল্প জমাবার কায়দা এমন চিত্তাকর্ষক যে ছোটরা সহজে তা উপভোগ করতে পারে এবং তাকে আপনজন বলে মেনে নেয়।

দ্বিতীয় কারণ—তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রগুলি জীবন্ত। চরিত্রগুলিকে তিনি তাঁর কলমের উজ্জ্বল আঁচড়ে যেন পাঠকের চোখের সামনে চলাফেরা করান। শুধু জয়ন্ত, মাণিক, বিমল, কুমার, সুন্দরবাবু, রামহরি, বাঘা নয়—পাপী দুষ্কৃতিকারী সহ অন্যান্য সাধারণ চরিত্রগুলিও বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য। তাঁর কাহিনীগুলির বিন্যাসে মুন্সীয়ানা আছে, কৌতুকবোধ আছে, সংলাপগুলিও চোস্ত। তিনি অবান্তর কচাকচি বাদ দিয়ে সরাসরি গল্প শুরু করে দেন এবং তা সোজা গেঁথে যায় পাঠকচিত্তে। ঠিক কখন কাহিনী শেষ করতে হবে সেই পরিমিতি জ্ঞান তাঁর ছিল। নেহাৎ আজগুবী

উদ্ভটকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। যথাসম্ভব যুক্তিসিদ্ধির প্রতিই তাঁর ঝোঁক।

তৃতীয় কারণ—চমৎকার কাব্যময় ভাষা তাঁর আয়ত্তে। এই কাব্যময় ভাষা কিন্তু এলানো বা আলগা নয়, বরং তা তেজি ও জোরালো। ভাষার প্রসাদগুণে হেমেন্দ্রকুমার তাঁর পাঠকের চোখের সামনে খুলে দেন সুন্দর বর্ণময় রূপময় কল্পনার জগৎ। আবার অন্যদিকে ভয়ের কিম্বা আতঙ্কের সিচুয়েশন বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর ভাষার ব্যবহার অসাধারণ ও সার্থক। পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, চল্লিশ / পঁয়তাল্লিশ বছর আগে যে পাঠকগোষ্ঠী তাঁর লেখা পড়ে আনন্দ পেয়েছিল, আজও তাদের ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনীরা তাঁর লেখা পরমানন্দে উপভোগ করছে।

আরেক বিষয়েও হেমেন্দ্রকুমার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে গেছেন—বিদেশী রোমাঞ্চকর কাহিনীকে বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করায়। মনে রাখতে হবে যে, তিনি বিদেশী কাহিনীকে ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় স্রেফ 'ট্রানস্লেসন' কখনোই করেননি, বরং করতেন 'ট্রানস্ক্রিয়েশন।' অর্থাৎ মূল বিদেশী কাহিনীর ছায়া কিম্বা ভাব নিয়ে তিনি দেশীয় পরিবেশে এবং দেশী মালমশলা যোগ করে নতুনভাবে কাহিনী তৈরি করতেন। লেখাগুলি তাই কিশোর চিত্তের উপযোগী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আমাদের একান্ত ঘরের জিনিস বলে মনে হতো। আলোচ্য খণ্ডে রয়েছে 'শাজাহানের ময়ূর', 'মৃত্যু মল্লার', 'সুন্দরবনের রক্তপাগল', 'সুন্দরবনের মানুষ-বাঘ', 'আধুনিক রবিন্‌হুড্' প্রভৃতি সুখ্যাত রচনা। প্রতিটি লেখা পাঠকের ভাল লাগবে নিশ্চয়।

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি খণ্ডে খণ্ডে হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী ছেপে রুচিবান বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এটি নবম খণ্ড। এশিয়া হেমেন্দ্রকুমারের বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছেটানো ভাল ভাল লেখাগুলি একসঙ্গে গেঁথে চিরকালের জন্য হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারলেন।

একটি করুণ মধুর ঘটনা উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের কথা, সুখ্যাত বইয়ের দোকান 'এম সি সরকার'-এর ভেতরে 'মৌচাক' মাসিকপত্র কার্যালয়ে বসে হেমেন্দ্রকুমার জোর আড্ডা দিচ্ছেন সম্পাদক ও আরো কয়েকজন লেখকের সঙ্গে, হাসি গল্পে আড্ডা মশগুল। দোকানের কাউন্টারে বিভিন্ন ক্রেতা আসছে যাচ্ছে। একজন কিশোরও এসে কিনল হেমেন্দ্রকুমারের একখানা বই। কেনবার পর সে মৃদু-কণ্ঠে সেলসম্যানকে জিজ্ঞেস করে, 'হেমেনবাবু এখানে কবে কবে আসেন? ওঁকে একবার দেখতে বড্ড ইচ্ছে করে।'

সেলসম্যান সহাস্যে দোকানের ভিতরদিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'ঐ তো হেমেনবাবু বসে আছেন।'

গভীর আগ্রহে কিশোরের দু'চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল। সে অনুনয়ের স্বরে বলে, 'একবার ভেতরে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করব?'

'বেশতো, যাও। কিন্তু ওঁকে বেশি বিরক্ত কোরো না যেন।'

কিশোর একছুটে ভিতরে ঢুকে প্রথমে হেমেন্দ্রকুমারকে এবং তারপর অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেমেন্দ্রকুমারের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। হাতের বইটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'একটা সই করে দিন।'

ভক্তের আগমন হেমেন্দ্রকুমারের কাছে নতুন কিছু নয়। তখনই তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়। যেখানে তিনি যান, খবর পেয়ে তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করে কিশোর-কিশোরী ভক্তরা। কাজেই সহজ ভাবে তিনি কিশোরটির সঙ্গে দু'চারটি মিষ্টালাপ করলেন, বইতে সই করে দিলেন। কিশোরটি রীতিমতো তো সুদর্শন, চেহারায় বুদ্ধির দীপ্তিও বেশ রয়েছে। আড্ডার সবাই স্নেহ ভরে তার সঙ্গে দুটি একটি কথাও বললেন।

কিশোরটি ভাবতেই পারেনি এমন সমাদর। খুশিতে উজ্জ্বল মুখে সে হেমেন্দ্রকুমারকে বলে, 'জানেন, আমাদের পরিবারের সবাই আপনার লেখার ভক্ত, আমি, আমার ভাই, বোন, আমার বাবা-মা, কিন্তু আপনার লেখার সবচেয়ে ভক্ত আমার মা।'

হেমেন্দ্রকুমার হাসতে হাসতে বললেন, 'তাই নাকি? তাহলে এ বই বাড়ি নিয়ে গেলে সবচেয়ে আগে পড়তে চাইবেন তোমার মা?'

তক্ষুনি সেই কিশোরের খুশিতে উজ্জ্বল মুখ তীব্র বেদনায় কালো হয়ে গেল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে প্রাণপণে কান্না চাপতে চাপতে সে বলে, 'আমার মা আর নেই যে। তিনি গত বছর স্বর্গে চলে গেছেন। অসুখে যখন তিনি বিছানায় শুয়ে থাকতেন, বই পড়ার শক্তি ছিল না। তখনো তিনি শুনতে চাইতেন আপনার লেখা, আমি তখন তাঁর শিয়রে বসে আপনার লেখা তাঁকে পড়ে শোনাতাম। এখন আর আমি কাকে এ বই পড়ে শোনাব?'

কান্না আর চাপতে না পেরে চোখের জল মুছতে মুছতে কিশোর তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বার হয়ে রাস্তায় নেমে যায়।

আড্ডা একেবারে চুপ। মাতৃহারা কিশোরের হাহাকার সকলের মনই গভীর বিষণ্ণতায় ভরে দিয়েছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (মহাস্থবির) বললেন, 'এই তো জীবন, হাসি আর কান্নার খেলা!' হেমেন্দ্রকুমারের দু'চোখের কোণ চকচক করছিল অশ্রুতে। মৃদুকণ্ঠে তিনি বললেন, 'কিশোর সাহিত্যে করুণ রস প্রয়োগের আমি বরাবর বিপক্ষে। ছোটদের কাঁদাতে চাই না। এমন লেখা কখনো আমি পছন্দ করি না যা পড়ে ছোটরা দুঃখে কাঁদে। নিজে আমি করুণ লেখা খুব কমই লিখেছি। আর, আজ আমার এক অচেনা ছোট্ট বন্ধু, আমার লেখার ছোট্ট পাঠক আমাকেই কাঁদিয়ে দিয়ে চলে গেল!'

ডি ১৮ সি. আই. টি. বিল্ডিং
সিংহীবাগান, কলকাতা ৭

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

হেমেন্দ্রকুমার
রায়
রচনাবলী
নবম

সূচীপত্র

সাজাহানের ময়ূর / ৯—৭১

মৃত্যু মল্লার / ৭৩—১৩৬

সুন্দরবনের রক্তপাগল / ১৩৭—২০৪

সুন্দরবনের মানুষ-বাঘ / ২০৫—২৬১

আধুনিক রবিন্‌হুড্ / ২৬৩—৩২০

আধুনিক রবিন্‌হুড্ / ২৬৩

পৃথিবীর প্রথম গোয়েন্দা-কাহিনী / ২৭৪

সত্যিকার দানব-দানবী / ২৮০

প্যারিসের কুব্জ রাজা / ২৮৮

এ-যুগের সবচেয়ে বড় ডাকাত / ২৯৬

ইয়াঙ্কি খোকা-গুণ্ডা / ৩০৪

ফরাসী বিপ্লবে বাঙালীর ছেলে / ৩১৩
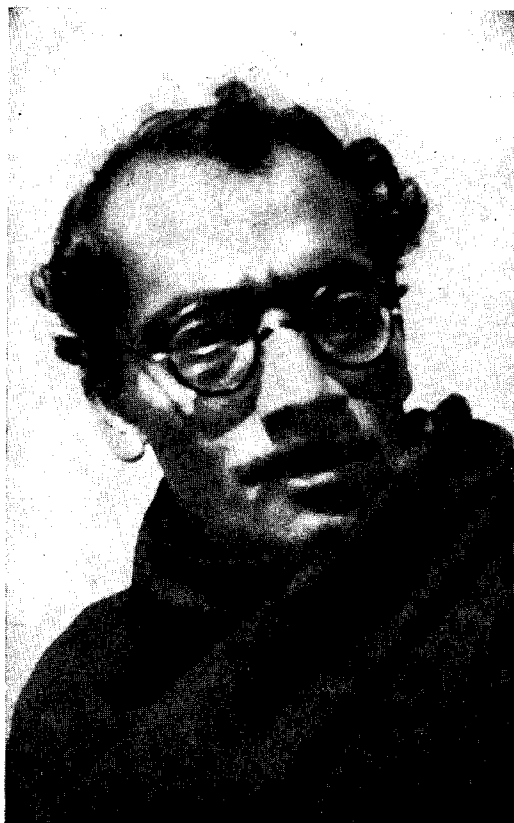
জন্ম
২রা সেপ্টেম্বর ১৮৮৮

মৃত্যু
১৮ই এপ্রিল ১৯৬৩

সাজাহানের ময়ূর

এক

পত্রবাহক তীর

প্রভাতী চায়ের আসর। ধড়াচূড়াধারী সুন্দরবাবুর আবির্ভাব যথাসময়ে।

মাণিক সুধোলে, "চায়ের আসরেও আপনি কি ধড়াচূড়ো ত্যাগ ক'রে আসতে পারেন না?"

—"উঁহু! সময় নেই ভায়া, সময় নেই। সর্বদাই 'ডিউটি'তে থাকি, ধড়াচূড়ো ছাড়বার সময় পাই না।"

জয়ন্ত হেসে বললে, "চেম্বারলেনের যেমন ছাতা, চার্চিলের যেমন চুরোট, গান্ধীজীর যেমন ট্যাঁক-ঘড়ী, তেমনি সুন্দরবাবুরও বিশেষত্ব হচ্ছে ঐ ধড়াচূড়ো। ওর দিকে আর নজর দিও না মাণিক!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, মাণিকের কথা ছেড়ে দাও, এই ধড়াচূড়োর উপরে জোর-নজর দেবার জন্যে অন্য লোকেরও অভাব নেই।"

—"কি-রকম?"

—"অদূর-ভবিষ্যতেই বোধ হয় এই ধড়াচূড়ো প'রেই আমাকে পর-লোকে যাত্রা করতে হবে।"

মাণিক বললে, "তা আর আশ্চর্য কথা কি? ঢেঁকি তো স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে!"

—"না হে ভায়া, ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়— দস্তুরমত মারাত্মক!"

—"কেন, বলুন দেখি?"

—"যে কোন মুহূর্তে আমি পটল তুলতে পারি।"

—"বলেন কি? আপনার 'ব্লাড-প্রেসার' বেড়েছে নাকি?"

—"বাড়েও নি, কমেও নি। আসল কথা কি জানো? আমার

পিছনে পিছনে শত্রু ঘুরছে।"

—"শত্রু ?"

—"হ্যাঁ, ভয়াবহ শত্রু, অদৃশ্য শত্রু!"

—"ব্যাপারটা খুলে বলুন।"

—"তাই বলতেই তো এসেছি। কিন্তু রোসো ভায়া, আগে গলাটা একটু ভিজিয়ে, পেটের ফাঁকটা একটু ভরিয়ে নি। আজকের খাদ্য-তালিকা কি ?"

—"শুনলে প্রফুল্ল হবেন আশা করি।"

—"বল কি, বল কি। আমি তো না শুনেই প্রফুল্ল হয়ে উঠছি। প্রকাশ ক'রে বল শুনি।"

—"চায়ের সঙ্গে আজ পাবেন 'অ্যাস্‌পারাগাস ওম্‌লেট', 'চকোলেট স্যাণ্ডউইচ', 'স্পঞ্জ কেক' প্রভৃতি।"

—"আবার 'প্রভৃতি' ? নৈবেদ্যের উপরে চূড়ো-সন্দেশ। সাধু, সাধু। খেয়ে-দেয়ে নাও রে যাদু, ক'দিন বই তো নয়।"

সুন্দরবাবু সহর্ষে এত জোরে চেয়ারের উপরে নিজের বিপুল বপু-খানি স্থাপন করলেন যে চেয়ারখানা প্রতিবাদ ক'রে উঠল সশব্দে।

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু মাণিক কি বলে জানেন ?"

—"মাণিকের স্বভাব তো আমি জানি, নিশ্চয়ই সে ভালো কথা বলে না।"

মাণিক বললে, "ওহো, শালুক চিনেছেন গোপাল-ঠাকুর।"

জয়ন্ত বললে, "মাণিকের মত হচ্ছে, দেশ এখন স্বাধীন, ইংরেজদের আমরা বর্জন করেছি, ঐ সঙ্গে বিলিতি খাবারগুলোও বর্জন করা উচিত।"

মাণিক হাসতে হাসতে বললে, "আমি কি মন্দ প্রস্তাব করেছি সুন্দরবাবু ?"

—"অতিশয় মন্দ প্রস্তাব। রীতিমত অসাধু প্রস্তাব।"

—"কেন ?"

—"ইংরেজদের ত্যাগ করেছি ব'লে তাদের ভালোকেও ত্যাগ করতে

হবে নাকি? তুমি এ সব বাজে কথায় কান পেতো না জয়ন্ত। আর দেশ স্বাধীন হয়েছে ব'লে ইংরেজদেরই বা ত্যাগ করব কেন? যে জাত ফাউল-কাটলেট আবিষ্কার করেছে, সে কি বড় যে-সে জাত?"

মাণিক বললে, "আর যে জাত সন্দেশ-রসগোল্লা আবিষ্কার করে, তাকে আপনি কি বলেন?"

—"তাকেও আমি ধন্যবাদ দি। আমি কাটলেট বা সন্দেশ কিছুই ছাড়তে রাজি নই। গদাধরের মত আমি দুধও খাব, তামাকও খাব।"

—"এই যে এতকাল ধ'রে ইংরেজরা আমাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করেছে, তবু কি তারা সন্দেশ-রসগোল্লা খেতে চেয়েছে?"

—"স্বাদ পায় নি, তাই চায় নি।"

কখ্‌খনো না। সন্দেশ-রসগোল্লা ইংরেজদের ধাতে সয় না। তেমনি বিলিতি খাবারগুলোও আমাদের ধাতে সইতে না পারে।"

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "তুমি কে বট হে? তুমি বললেই সইবে না? এত কাল স'য়ে এল, ভবিষ্যতেও সইবে না কেন। আর ফাউল-কাটলেট যার ধাতে সইবে না, সে মনুষ্য-নাম ধারণের যোগ্য নয়। যাক্ সে বাজে কথা। কোথায় হে জয়ন্ত, কোথায় তোমার চা এবং টা? আমি যে যুগপৎ তৃষ্ণার্ত আর ক্ষুধার্ত। হুম্ হুম্!"

চায়ের পালা সাঙ্গ ক'রে সুন্দরবাবু চাঙ্গা হয়ে বললেন, "হুম্। এই-বারে আমার পালা শুরু করি?"

"নিশ্চয়!" জয়ন্ত বললে।

সুন্দরবাবু একখানা ইজি চেয়ারে আশ্রয় নিয়ে একটা বার্মা চুরোট ধরিয়ে বললেন, "বড়ই শক্ত পাল্লায় পড়েছি ভায়া! কাল বৈকালে আমার থানায় একটা ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। একটা মামলার তদন্ত নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছিলুম। এমন সময়ে থানার রামলাল নামে এক পাহারাওয়ালা একটা প্যাকেট নিয়ে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল—প্যাকেটটা আমারই নামে ডাকে এসেছিল। প্যাকেটটা শক্ত সুতো দিয়ে ভালো ক'রে বাঁধা ছিল। আমার কাছে ছুরি বা কাঁচি ছিল

না ব'লে আমি তাকে অন্য ঘরে গিয়ে সুতো কেটে প্যাকেটটা খুলে আনতে বললুম। সে চ'লে গেল, আমিও নিজের কাজে মন দিলুম।

মিনিট কয়েক পরেই ভীষণ এক শব্দে থানাটা কেঁপে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে বিষম এক আর্তনাদ। তাড়াতাড়ি ছুটে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দেখি, পাশের ঘরের মেঝের উপরে রামলালের রক্তাক্ত দেহ ছটফট করছে, ঘরের ভিতরে ধোঁয়া উড়ছে, আর পাওয়া যাচ্ছে যেন কোন বিস্ফোরকের গন্ধ। আমার এক সহকারী সামনের আর এক ঘরে ছিলেন। তাঁর মুখে শুনলুম, রামলাল টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে একটা প্যাকেটের মত কি খোলবার চেষ্টা করছিল, তারপরেই হঠাৎ ঐ ভয়াবহ কাণ্ড।

আমি তো তখনি রামলালকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলুম, কিন্তু সেখানে যাবার অল্পক্ষণ পরেই বেচারার মৃত্যু হয়েছে। আমার তো দৃঢ়-বিশ্বাস, ঐ সাংঘাতিক প্যাকেটটাই তার মৃত্যুর কারণ। তাই যদি হয়, তাহ'লে এটুকু অনুমান করাও কঠিন নয় যে, আমাকেই হত্যা করবার জন্যে এ প্যাকেটটা আমার নামে পাঠানো হয়েছিল।"

জয়ন্ত বললে, "প্যাকেটটা দেখতে ছিল কি-রকম?"

—"আমি সঠিক জবাব দিতে পারব না। কাজে এত ব্যস্ত ছিলুম যে, প্যাকেটের দিকে ভালো ক'রে তাকাবার সময় পাই নি—এমনকি সেটা দেখি নি বললেও চলে।"

জয়ন্ত বললে, "ইউরোপে আমেরিকায় মাঝে মাঝে এই রকম ঘটনা ঘটেছে। সেখানেও জেলিগ্‌নাইট (Gelignite)-ভরা বিপদজনক প্যাকেট খুলে কেউ কেউ মারা পড়েছে।"

—"জেলিগ্‌নাইট (Gelignite)?"

—"হ্যাঁ। একরকম বিষম বিস্ফোরক। তাতে থাকে শতকরা ৬৫ ভাগ নাইট্রো-গ্লিসেরিন, সাতাশ ভাগ পোটাসিয়াম নাইট্রেট, সাত ভাগ উড্‌-মীল (Woodmeal) প্রভৃতি। অবশ্য আপনার এই প্যাকেটের ভিতরে কি-রকম বিস্ফোরক ছিল, তা আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারি না।"

—"পুলিশের কাজ দুরাত্মাদের নিয়ে। দুরাত্মারা পুলিশের বন্ধু হয়

না। কিন্তু আমার কে শত্রু আছে, যে এইভাবে আমাকে হত্যা করতে চায়?"

—"আপনি কারুকে সন্দেহ করতে পারছেন না?"

—"উঁহু!"

—"উপস্থিত আপনার হাতে কি কি মামলা আছে?"

—"বিশেষ জটিল কোন মামলাই নেই। না, না, একটা উল্লেখযোগ্য মামলা আছে বটে!"

—"মামলাটা কিসের?"

সুন্দরবাবু জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ জানলা দিয়ে কি একটা জিনিস ঘরের মাঝ-বরাবর এসে ঠকাস্ ক'রে মেঝের উপরে গিয়ে পড়ল।

সুন্দরবাবু চমকে ব'লে উঠলেন, "ও আবার কি?"

মাণিক বললে, "খুব সরু একটা কঞ্চি। কেউ ওটা ধনুকে জুড়ে তীরের মতন ব্যবহার করেছে। কঞ্চির পিছনে ঝুলছে সুতোয় বাঁধা একখানা কাগজ।"

জয়ন্ত উঠে গিয়ে কঞ্চি থেকে কাগজখানা খুলে নিয়ে উচ্চস্বরে পাঠ করলে, "জয়ন্তবাবু, আপনার সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই। কিন্তুআপনি যদি কোন বিশেষ মামলা নিয়ে সরকারি পুলিশকে সাহায্য করেন, তা'হলে জেনে রাখবেন, আপনার জীবনের কোনই মূল্য থাকবে না।"

মাণিক বললে, "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! মামলা হাতে না নিতেই শাসানি চিঠি।"

সুন্দরবাবু দৌড়ে জানলার ধারে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে বললেন, "রাস্তার কোন লোককেই তো দেখে সন্দেহ হচ্ছে না।"

জয়ন্তও জানলার ধারে গিয়ে বললে, "রাস্তা থেকে কেউ ঐ কঞ্চি ছোঁড়েনি।"

—"কি ক'রে জানলে?"

—"আমরা আছি দোতালায়! নিচের রাস্তা থেকে কেউ ঐ তীর ছুঁড়লে ওটা জানলা দিয়ে ঢুকে উপরদিকে উঠে ঘরের ছাদে গিয়ে

ঠেকত। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, তীরটা সোজাসুজি ঢুকে ঘরের মাঝখানে গিয়ে পড়েছে।"

—"বটে, বটে, হুম্! আমাদের সামনে রাস্তার ওধারে তো দেখছি একখানা মাত্র বাড়ি। তা'হলে কি ঐ বাড়ির দোতালার কোন ঘর থেকেই ঐ তীরটা ছোঁড়া হয়েছে?"

—"আমার তো তাই বিশ্বাস।"

—"তা'হলে এখনি চল ঐ বাড়িতে।"

—"চলুন।"

দুই

বারোয়ারি বাড়ি

রাস্তায় এসে সুন্দরবাবু শুধোলেন, "ও বাড়িখানা কার জয়ন্ত?"

—"ওখানা হচ্ছে বারোয়ারি বাড়ি।"

—"বারোয়ারি পুজোর কথাই শুনেছি, বারোয়ারি বাড়ি আবার কি বাবা?"

—"ওটা হচ্ছে মেস। ওর ভিতরে কেরানী থাকে, ছাত্র থাকে, ব্যবসাদার থাকে, আরো কোন কোন শ্রেণীর লোক থাকে।"

—"কিন্তু মেসের একজন কর্তা আছে তো?"

—"তা আছে বৈকি! তার নাম শুনেছি সুরেনবাবু। লোকটির সঙ্গে আমার চোখের পরিচয়ও আছে।"

—"বেশ, আগে আমার তাকেই দরকার।"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "না। সুরেনবাবুর সঙ্গে পরে আলাপ করলেও চলবে। আমার দোতালার ঘরের সরাসরি মেস-বাড়ির ঐ যে দোতালা ঘরখানা আছে, আগে আমি ঐখানেই যেতে চাই। ওটা মেস, সুতরাং কারুরই প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। দেরি করলে সব সূত্রই

হারিয়ে যাবে। আসুন। এস মাণিক।"

তিনজনে মেস-বাড়ির ভিতরে ঢুকে একসার নোংরা সিঁড়ি বয়ে দোতালায় গিয়ে উঠল। তিন-চার জন লোক সুন্দরবাবুর 'ইউনিফর্মে'র দিকে চকিত দৃষ্টিতে তাকালে বটে, কিন্তু কেউ কোন কথা বললে না।

একখানা ঘরের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ ক'রে জয়ন্ত বললে, "তীর ছোড়া হয়েছে খুব সম্ভব ঐ ঘর থেকেই।"

কিন্তু ঘরের দরজা বাহির থেকে তালাবদ্ধ!

ঠিক এই সময়ে একটি বেঁটেসেটে, কালোকোলো, হৃষ্টপুষ্ট লোক হন্তদন্তের মত এসে বললে, "নমস্কার জয়ন্তবাবু, হঠাৎ আমার এখানে আপনাদের পায়ের ধুলো পড়ল কেন?"

জয়ন্ত প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সুন্দরবাবুর দিকে ফিরে বললে, "ইনিই মেসের কর্তা সুরেনবাবু।"

সুন্দরবাবু কটমট দৃষ্টিতে সুরেনের আপাদমস্তকের উপরে একবার নিজের পুলিশ-চক্ষু বুলিয়ে নিলেন। সুরেন সভয়ে দুই পা পিছিয়ে গেল।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "এ ঘরে কে থাকে?"

সুরেন বললে, "আজ্ঞে, ওটা একটা সমিতির ঘর। জাতীয় সেবক-সমিতি।"

জয়ন্ত একটু বিস্মিত স্বরে বললে, "এ বাড়িতে আবার কোন সমিতি আছে নাকি?"

—"আঁজ্ঞে, আগে ছিল না। জাতীয় সেবক-সমিতি ঘরখানা ভাড়া নিয়েছে মোটে দিন পনেরো আগে।"

—"সমিতির সভ্য-সংখ্যা কত?"

—"আমি জানি না। তবে রোজ সন্ধ্যার পর এখানে দশ-পনেরো জন লোক এসে জড়ো হয়। মাঝে মাঝে দুই-একটি মেয়েও আসে। তারা নিজেদের মধ্যে কি কথাবার্তা কয় বলতে পারি না, তবে তারা ঘন ঘন খাবার আর চা আনায় বটে। তারপর রাত দশটা কি এগারোটার সময়ে সকলে আবার দরজায় তালা লাগিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।"

—"সকালে তাদের কেউ এখানে আসে না ?"

—"সকালেও নয়, দুপুরেও নয়, বিকালেও নয়। তাদের আসর বসে সন্ধ্যার পর।"

—"আপনি ঠিক জানেন, আজ তাদের কোন লোক ঐ ঘরে ঢোকেনি ?"

—"কেমন ক'রে হলপ্ ক'রে বলি ? আমি একলা মানুষ, নানান কাজে এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করতে হয়। তবে সমিতির কোন লোককে কোনদিন সকালে আসতে দেখিনি।"

জয়ন্ত আর কিছু না ব'লে বাইরের বারান্দার দিকে গেল। সেদিকে ছিল তালাবদ্ধ ঘরের তিনটে জানলা—তার মধ্যে একটা জানলা খোলা। একবার সে নিজের বাড়ির দিকে তাকালে। সেখান থেকে তার নিজের দোতালা ঘরের ভিতরটা বেশ দেখা যায়। তারপর সে ফিরে জানলার ফাঁক দিয়ে মেস-বাড়ির ঘরের ভিতরটা উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে।

ঘরের ভিতরে নজর চলে প্রায় সর্বত্রই। আসবাব-পত্তর বেশি নেই। একদিকে একখানা সতরঞ্চি-মোড়া চৌকি, আর মাঝখানে একটা গোল টেবিলের চারিপাশে সাজানো রয়েছে কয়েকখানা চেয়ার—এইমাত্র।

আর একটা জিনিস জয়ন্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। সে মৃদু হেসে ডাকলে, "সুরেনবাবু, একবার এদিকে আসবেন কি ?"

—"আঁজ্ঞে, কি বলছেন ?"

—"আপনি বললেন, সমিতির কেউ সকালে এ ঘরে আসে না ?"

—"আঁজ্ঞে, তাই তো জানি।"

—"জানলার কাছে এসে ঘরের ভিতরে তাকিয়ে দেখুন।"

কথামত কাজ করলে সুরেন। অজানা কোন বিপদের সম্ভাবনায় তার ভাবভঙ্গি জড়োসড়ো।

জয়ন্ত বললে, "গোল টেবিলটার উপরে কি রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন ?"

—"হুঁ। একটা 'অ্যাস্-ট্রে'।"

—"তারপর ?"

সুরেনের দুই ভুরু কুঞ্চিত হ'ল। থেমে থেমে সে বললে, "আশ্চর্য।
'অ্যাস্-ট্রে'র ভিতর থেকে ধেঁায়া বেরুচ্ছে।"

জয়ন্ত বললে, "কাল রাত্রে কেউ যদি খানিকটা জ্বলন্ত সিগারেট ঐ 'অ্যাস-ট্রে'র মধ্যে ফেলে থাকে, তাহ'লে আজ সকালে নিশ্চয়ই সেটা থেকে ধেঁায়া বেরুত না?"

—"না।"

—"অতএব বোঝা যাচ্ছে, একটু আগেই এই ঘরের ভিতরে কারুর আবির্ভাব হয়েছিল?"

একটা ঢোক গিলে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে সুরেন বললে, "কিন্তু দোহাই আপনার, আমি তাকে দেখিনি।"

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "বন্ধ ঘরের ভিতরে রয়েছে জ্বলন্ত-সিগারেটের ধেঁায়া, কিন্তু সিগারেট-ধারী কোথায় গেল বলতে পারেন?"

সুরেন কিছুই বলতে পারলে না।

সুন্দরবাবু এগিয়ে এসে কঠোর স্বরে বললেন, "সুরেনবাবু, এ ঘর প্রথমে কে ভাড়া নিতে আসে?"

—"তারাপদবাবু। পরে জেনেছি তিনিই সমিতির সম্পাদক।"

—"তাঁর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?"

—"বিশেষ কিছুই নয়। তবে একদিন কথায় কথায় জানতে পেরেছিলুম, গেল যুদ্ধের আগে তিনি থাকতেন সিঙ্গাপুরে।"

সুন্দরবাবু সচমকে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "সিঙ্গাপুরে?"

—"আঁজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"আর কিছু জানতে পেরেছেন?"

"আঁজ্ঞে না। তারাপদবাবু আর তাঁর সমিতির লোকরা মেসের কারুর সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না। তাঁরা নিজেদের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, আর নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাও বলেন খুব নিচু-গলায়। কেউ যদি কৌতূহলী হয়ে তাঁদের ঘরের আশেপাশে উঁকি ঝুঁকি মারে, তাহ'লেও বিরক্ত হন তাঁরা।"

—"তাদের ব্যবহার আপনার কাছে রহস্যজনক ব'লে মনে হয়নি ?"

—"তা হয়েছে বৈকি !"

—"এই তারাপদ লোকটিকে দেখতে কেমন ?"

—"একেবারে চমৎকার ! রাজপুত্তুর বললেও হয়। দুধে-আল্‌তার মত গায়ের রং, ভুরু-চোখ-নাক-ঠোঁট যেন তুলি দিয়ে আঁকা, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, কিন্তু পরিপুষ্ট দেহ, মাথায় কাঁধ-ছোঁয়া কোঁকড়ানো চুল, ঠোঁটের উপরে খুব সরু একটি গোঁফের রেখা। দোষের মধ্যে তাঁর দেহে পুরুষালি ভাব কম, আর মাথাতেও তিনি বেশ খাটো।"

—"তার বয়স কত হবে।"

—"ছাব্বিশ-সাতাশ থেকে ত্রিশের মধ্যে।"

—"পোশাক-পরিচ্ছদ কি-রকম ?"

—"অত্যন্ত সৌখীন। জামা-কাপড়-জুতো সবই দামী। সিল্কের পাঞ্জাবী ছাড়া আর কোনরকম জামা তাঁকে ব্যবহার করতে দেখিনি, তার উপরে থাকে কোনদিন হীরার আর কোনদিন মুক্তার বোতাম্। দুই হাতের আঙুলেই আছে দামী দামী পাথর-বসানো আংটি,—এমন কি তাঁর সোনার হাতঘড়িরও উপরে আছে সারি সারি হীরার ঝলক। তারাপদবাবু যেখান দিয়ে যান, সেইখানেই খানিকক্ষণ পর্যন্ত ছড়ানো থাকে অতি মধুর এসেন্সের সুগন্ধ। বলতে কি মশায়, তারাপদবাবুর মতন ফুলবাবু আমি জীবনে আর দুটি দেখিনি। তিনি যে ধনকুবেরের ছেলে, তাতে আর সন্দেহ নেই।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! ধন্যবাদ সুরেনবাবু, আপনার কাছ থেকে তারাপদর চমৎকার একখানি ফোটোগ্রাফ পেলুম। চল হে জয়ন্ত, এইবারে আমরা যেতে পারি।" দুই পা এগিয়ে হঠাৎ থেমে প'ড়ে আবার বললেন, "হ্যাঁ, শুনুন সুরেনবাবু, আর একটা কথা ব'লে যাই। যদি নিজে বিপদে না পড়তে চান তাহ'লে আপনি—"

ভয়ে চমকে উঠে সুরেন বললে, "বিপদ ? কেন ? তারাপদবাবুরা কি বিপ্লববাদীর দল ?"

সুন্দরবাবু বললেন—অতিরিক্ত গম্ভীর স্বরেই বললেন,—"ওরা যে কি, তা আমরাও জানি না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন—নিজের ভালোর জন্যে খুব ভালো ক'রেই মনে রাখবেন। আমরা যে আজ এখানে এসেছি, সমিতির কোন লোক যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। চল জয়ন্ত, চল হে মাণিক!"

রাস্তায় এসে জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, তারাপদ সিঙ্গাপুরে থাকত শুনে হঠাৎ আপনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন?"

সুন্দরবাবু অর্থপূর্ণ স্বরে বললেন, "এখানে নয় ভায়া, এখানে নয়। বাড়িতে চল, সব বলছি।"

এমন সময়ে পথিমধ্যে জয়ন্তের পুরাতন ভৃত্য মধুর আবির্ভাব। তাড়াতাড়ি এসে সে বললে, "বাবু, একটি মেয়ে আপনাকে ডাকতে এসেছে।"

ভ্রূ সংকুচিত ক'রে জয়ন্ত বললে, "মেয়ে? কোথায় সে?"

—"বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখেছি বাবু। সে বললে, 'তোমার বাবুকে এখুনি দরকার, শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে এস। তাই আমি ছুটতে ছুটতে খবর দিতে আসছি।"

তারা দ্রুতপদে বাড়িতে এসে বৈঠকখানার ভিতরে প্রবেশ করলে।

জয়ন্ত এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "কৈ মধু, এখানে তো কেউ নেই!"

মধু হতভম্বের মত বললে, "আমি তো ঐ চেয়ারের উপরেই মেয়েটিকে বসিয়ে আপনাকে খবর দিতে গিয়েছিলুম!"

জয়ন্ত অগ্রসর হয়ে বললে, "চেয়ারের উপরে কোন মানব বা মানবীর মূর্তি নেই বটে, কিন্তু একখানা কাগজ প'ড়ে রয়েছে দেখছি।"

সে কাগজখানা তুলে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করলে: "জয়ন্তবাবু, সাবধান। আপনি আমার অনুরোধ রাখলেন না, সুন্দরবাবুর পক্ষই অবলম্বন করলেন। উত্তম! ভিমরুলের চাকে যখন হাত দিয়েছেন,
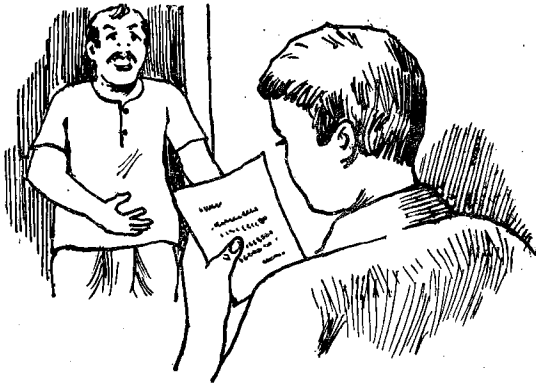
দংশনের জ্বালা আপনাকে সহ্য করতেই হবে! এ দংশন কি জানেন? অনিবার্য মরণ—নিশ্চিত মরণ।"

তিন

মস্ত-বড় অ্যাডভেঞ্চার

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্‌! জয়ন্ত-ভায়া, বুঝতে পারছ কি, আমরা নিশ্চয়ই কোন একটা মস্ত-বড় অ্যাডভেঞ্চারের দিকে এগিয়ে চলেছি।"

মাণিক সায় দিয়ে বললে, "হুঁ, বিপদজনক অ্যাডভেঞ্চার। আসল ব্যাপার কি জানলুম না, অথচ গোড়া থেকেই উত্তেজনার ধাক্কা। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি?"

সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত, তুমি চুপ ক'রে আছ কেন?"

জয়ন্ত বললে, "কতকগুলো কথা ভাবছি।"

—"কি কথা?"

—"একদল লোক যে কারণেই হোক্, আপনাকে পথ থেকে সরাতে চায়। আপনাকে যে সাহায্য করবে তাকেও তারা ক্ষমা করবে না। তারা আমাদের প্রত্যেকের গতিবিধির উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছে। খুব সম্ভব ঐ মেস-বাড়ির সঙ্গেও তাদের কোন না কোন সম্পর্ক আছে। তারা চালাক বটে, কিন্তু উপর-চালাক। নইলে এ-রকম সেকেলে পদ্ধতিতে চিঠি লিখে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করত না। কিন্তু তারা যে সাংঘাতিক লোক, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তাদের দলে যে স্ত্রীলোকও আছে, সে প্রমাণও আজ পাওয়া গেল। কিন্তু কে তারা? কেন তারা আমাদের পিছনে লাগতে চায়? সুন্দরবাবুর কাছে বোধ হয় এ প্রশ্নের জবাব আছে।"

সুন্দরবাবু একখানা চেয়ারের উপরে অঙ্গভার ন্যস্ত ক'রে বললেন, "হয়তো আছে, হয়তো নেই। আমি নিশ্চয় ক'রে কিছু বলতে পারি না।"

—"সুরেনবাবুর মুখে সিঙ্গাপুরের নাম শুনে আপনি উত্তেজিত হলেন কেন?"

—"আমি যা জানি বলছি শোনো। তোমরা তো জানো, মাস-পাঁচেক আগে একজন জালিয়াতকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে আমাকে সিঙ্গাপুরে যাত্রা করতে হয়েছিল?"

"তা জানি। কিন্তু মামলাটার কথা ভালো ক'রে জানি না।"

—"সংক্ষেপে বলি শোনো। বীরেন্দ্রলাল একজন শিক্ষিত লোক আর সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। কিন্তু বদখেয়ালিতে পৈতৃক সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে শেষটা অর্থাভাবে জালিয়াতি ব্যবসা অবলম্বন করে। নোট জাল করতে সে অদ্বিতীয়। জাল নোট চালিয়ে সে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার দলের কয়েকজন লোক ধরা প'ড়ে যায়, আর সেও হয় নিরুদ্দেশ। এইটা হচ্ছে দুই বছর আগেকার কথা। তারপর মাস কয়েক আগে আমরা খবর পাই, সিঙ্গাপুর-অঞ্চলে নাকি জাল নোটের বড়ই বাড়াবাড়ি হয়েছে। গুপ্তচরের মুখে আরো শুনি, কলকাতা থেকে এক বাঙালী বাবু নাকি সিঙ্গাপুরে গিয়ে একদল জালিয়াতের

সর্দার হয়ে বসেছে! সেই দলের লোকেরা নাকি কেবল জালিয়াতি নয়, মানুষ খুন করতেও ভয় পায় না। আমাদের সন্দেহ হ'ল, সিঙ্গাপুরের ঐ বাঙালীবাবু আর কলকাতা থেকে নিরুদ্দিষ্ট বীরেন্দ্রলাল অভিন্ন ব্যক্তি!

আমাদের সন্দেহ সত্য কিনা জানবার জন্যে ইন্‌স্পেক্টার চারুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আমি সিঙ্গাপুরে গিয়ে হাজির হই। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল, আমাদের সন্দেহ মিথ্যা নয়। বীরেন্দ্রকেও প্রায় গ্রেপ্তার করে-ছিলুম, কিন্তু একটুর জন্যে সে আবার আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ে। বীরেনের বাসা হাতড়ে পেলুম খালি তার ডায়েরি আর ফোটো-গ্রাফ। ডায়েরিখানা বাজে কথায় ভরা, আমাদের কোন কাজে লাগবে না, কিন্তু ফোটোগ্রাফখানা পেয়ে আমার ভারি উপকার হয়েছে।"

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "কি-রকম উপকার?"

—"জানতে পেরেছি যে কলকাতায় আবার বীরেন্দ্রলালের শুভা-গমন হয়েছে।"

—"কেমন ক'রে জানতে পারলেন?"

—"তোমাদের ঐ সুরেনবাবুর কথায়! উনি তারাপদর যে বর্ণনা দিলেন, তার সঙ্গে বীরেনের চেহারা হুবহু মিলে যায়।"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। তারপর বললে, "আপনার আর কিছু বলবার নেই?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আরে, আমার আসল বক্তব্য তো এখনো বলাই হয় নি। বীরেন কলকাতায় এসেছে জানতে পেরে আমাদের চোখের সামনে থেকে অনেকখানি অন্ধকার সরে গিয়েছে। শোনো! দিন-পনেরো আগে আমার হাতে আসে একটা খুনের মামলা। হত ব্যক্তির নাম মুকুন্দলাল মুখোপাধ্যায়। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নি। পাড়ার লোকের মুখ থেকে কেবল এইটুকু শুনেছি,—মাস-ছয়েক আগে তিনি বাহির থেকে কলকাতায় এসে বাড়ি ভাড়া ক'রে বাস করছিলেন। মুকুন্দবাবুর বয়স পঞ্চাশের কম নয়। তিনি বিপত্নীক। তাঁর দুই ছেলে। জ্যেষ্ঠের নাম সনৎকুমার, কনিষ্ঠের নাম অশোককুমার।

আন্দাজি বয়স যথাক্রমে ছাব্বিশ আর চব্বিশ। দুইজনেই অবিবাহিত। পিতা-পুত্র সকলের স্বভাব ছিল একরকম! পাড়ার কারুর সঙ্গেই তাদের মেলামেশা ছিল না। তারা বাইরের লোককে এড়িয়ে চলবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করত।

জয়ন্ত সুধালে, "তাদের কি পেশা ছিল?"

—"আশ্চর্য এই, তাদের কোনই পেশা ছিল না। কোন ব্যাঙ্কেও মুকুন্দবাবুর নামে টাকা গচ্ছিত নেই। হয়তো তাঁর হাতে নগদ টাকা ছিল, তাই ভাঙিয়েই সংসার চলত।"

—"বাড়িতে ঝি-চাকর-পাচক ছিল তো?"

—"পাচকও ছিল না, চাকরও ছিল না। একটা ঠিকে ঝি দুই বেলা কিছুক্ষণের জন্যে এসে কাজ সেরে চ'লে যেত। মুকুন্দবাবুদের খাবার আসত হোটেল থেকে।"

জয়ন্ত বললে, "রহস্যময় পরিবার! মুকুন্দবাবুর বাড়ি খানাতল্লাস ক'রে তাঁর আত্মীয়-বন্ধুর কোন চিঠি পান নি?"

—"পেয়েছি কেবল একখানা চিঠির একটা টুক্‌রো। তার কথা পরে বলছি।"

—"মুকুন্দবাবু ফেরারি আসামী নন তো?"

—"তার কোন প্রমাণ নেই।"

—"তাহ'লে মুকুন্দবাবু হয়তো কোন বিপদজনক শত্রুর ভয়ে কলকাতায় পালিয়ে এসে আত্মগোপন করেছিলেন।"

—"খুব সম্ভব তাই।"

—"মুকুন্দবাবুর ছেলেরা কি বলে?"

—"আরে, তাদেরও যে পাত্তা নেই! হত্যাকাণ্ডের পরে তাদেরও কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।"

জয়ন্ত সোজা হয়ে ব'সে বললে, "আপনি কি তাদেরই পিতৃহত্যার জন্যে দায়ী মনে করছেন?"

—"তা ছাড়া আর কি করি বল? তারা পালালো কেন? যে

বাড়িতে বাইরের কোন লোকের যাতায়াত নেই, সেখানে বাহির থেকে কেউ খুন করতে আসবে কেন ?"

—"আপনার এই যুক্তি ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয় ! হয়তো যে ভয়ে মুকুন্দবাবু আত্মগোপন করেছিলেন, সেই ভয়েই তাঁর পুত্রেরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।"

—"এটা তোমার অনুমান মাত্র।"

—"যাক্ সে কথা। এখন কি ভাবে মুকুন্দবাবু মারা পড়েছেন তাই বলুন।"

—"মুকুন্দবাবু রাত্রে খাটের উপরে যে শয়ন করেছিলেন বিছানা দেখেই আমরা সেটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তাঁর দেহ পাওয়া যায় খাট থেকে বেশ খানিকটা দূরে, একটা টেবিলের কাছে। খুনী কোন ধারালো ভারি অস্ত্র ব্যবহার করেছিল, কারণ তাঁর মুণ্ডটা দেহ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ঘরের ভিতরে আমরা কোন অস্ত্র বা পদচিহ্ন দেখতে পাই নি। ঘরের আসবাবের মধ্যে ছিল একখানা খাট, একটা আলমারি, একটা টেবিল, একখানা সাধারণ চেয়ার আর একখানা ইজি-চেয়ার। আলমারির ভিতরের সমস্ত জিনিস লণ্ডভণ্ড অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, টেবিলের দুটো দেরাজের অবস্থাও তাই। কোন জিনিস চুরি গিয়েছে কিনা বলতে পারি না, কারণ আলমারি আর দেরাজের ভিতরে কি কি ছিল, তা আমরা জানি না। তবে দেরাজের ভিতরে পাওয়া গিয়েছে দু'খানা একশো টাকার আর পঁচিশখানা দশ টাকার নোট। ঘরে আর কোন মূল্যবান জিনিস ছিল না।"

—"খুনী ঘরে ঢুকল কেমন ক'রে ?"

—"তাও জানি না। তবে মুকুন্দবাবুর শয়নগৃহের আর সদরের দরজা সকাল পর্যন্ত খোলাই ছিল।"

—"কি একটা চিঠির টুক্‌রোর কথা বলছিলেন ?"

"মৃত মুকুন্দবাবুর মুষ্টিবদ্ধ হাতের ভিতর থেকে এই কাগজের টুক্‌রো-টুকু পাওয়া গিয়েছে।"

জয়ন্ত সেটি গ্রহণ ক'রে পাঠ করলে।

জয়ন্তের দুই চোখে ফুটল উৎসাহের দীপ্তি। সে বললে, একখানা পত্রের ছিন্নাংশ। খুব সম্ভব হত্যাকারী যখন এই পত্রখা গত করেছিল, মুকুন্দবাবু সেই সময়ে তার হাত থেকে এখানা নিতে গিয়ে মারা পড়েছেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য হচ্ছে, ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের ১৩ তারিখে লিখে পাঠিয়ে দেওয়া সিঙ্গাপুর থেকে। সুন্দরবাবু, এইবারে তৃতীয় দ্রষ্টব্য কি, দেখবে

সুন্দরবাবু বললেন, "আরো কিছু দ্রষ্টব্য আছে নাকি ?"

জয়ন্ত পকেট থেকে আরো দু'খানা কাগজ বার ক'রে ছিন্ন পাশে টেবিলের উপর রেখে হাসতে হাসতে বললে, "এই ছেঁড়া চিঠির টুক্‌রো। আর দুখানা পত্রের প্রথমখানা এসেছে বীরে আর দ্বিতীয়খানা এসেছে একটি স্ত্রীলোকের হাতে। এখন পত্রেরই হাতের লেখা মিলিয়ে দেখুন দেখি।"

কাগজ তিনখানার দিকে তাকিয়ে সুন্দরবাবুর দৃষ্টি ক্রমেই হয়ে উঠতে লাগল।

মাণিক চমৎকৃত হয়ে বললে, "এই তিনখানা কাগজেই হাতের লেখা।"

জয়ন্ত বললে, "ঠিক তাই। বীরেন মুকুন্দবাবুকে খুন করে জানি না, তবে সেই-ই যে তাঁকে সিঙ্গাপুর থেকে চিঠি লিখেছি আর কোন সন্দেহ নেই।"

সুন্দরবাবু লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "হুম্‌। দেখে নে বারে বীরেনকে আমি দেখে নেব। সাধে কি তোমার কাছে আসি একসঙ্গে আমার দুটো মামলার ভার হাল্‌কা হয়ে গেল। আগে সন্ধ্যাতেই জালিয়াতির মামলার জন্যে বীরেনকে গ্রেপ্তার করি, বোঝা যাবে মুকুন্দবাবুর হত্যার সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে কতখানি মাণিক। আজ সন্ধ্যার সময়ে 'জাতীয় সেবক-সমিতি'র আসরে দেরও আমন্ত্রণ রইল।"

"এটা
না হস্ত-
ছিনিয়ে
পত্রখানা
হয়েছে
ন ?"

পত্রের
আপনার
র সঙ্গে,
তিনখানা

স্ফারিত

য একই

ছ কিনা
ল, তাতে

—এই-
জয়ন্ত ?
তা আজ
তারপর
জয়ন্ত,
তোমা-

সন্ধ্যার আগেই জয়ন্তের বাড়িতে হ'ল সুন্দরবাবুর আবির্ভ
জয়ন্ত মৃদু হেসে বললে, "যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত ?'
—"হুম্ !"
মাণিক বললে, "এক্ষেত্রে 'হুম্' মানে কি সুন্দরবাবু ? হুঁ !
—"হুম্ ! হ্যাঁ, তাই। সমস্ত প্রস্তুত। আনাচ-কানাচ
মেস-বাড়ির উপরে এখন দৃষ্টি রেখেছে দু-ডজন লালপাগড়ী
দেবার কোন ফাঁকই নেই। আরে, একি ? রাস্তার দিকের
গুলোয় কালো কালো পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছ কেন জয়ন্ত ?"
"শত্রুর চোখের আড়ালে থাকব ব'লে। আজ ধনুকের
ঢুকেছে, কাল বন্দুকের বুলেট ঢুকতে পারে।"
—"তা যা বলেছ। মারাত্মক শত্রুর পাল্লায় পড়েছি।
বেটারা কিনা আমাকে বিস্ফোরক দিয়ে পঞ্চভূতে বিলীন করবার
ছিল! আচ্ছা বাপধন, একটু সবুর কর! আজ একটা হেস্তনেস্ত
ছাড়ছি না।"
জয়ন্ত মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "সুন্দরবাবু, তারাপ
বীরেনের দল আজ যদি তাদের এই লোক-দেখানো সমিতির
খোলে ."
—"কেন খুলবে না ?"
—"আমরা যে সন্দেহ ক'রে ওখানে তদন্ত করতে গিয়েছি,
নিশ্চয়ই তাদের অজানা নেই।"
—"কিন্তু সে তো সন্দেহ মাত্র! বীরেন্দ্রলাল ঝানু ছেলে,
তার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণিত হয় নি। যদি আমরা অভিযো

'মেসের ঐ ঘর থেকে পত্রবাহী তীর ছোঁড়া হয়েছে', সে অম্লানবদনে বলতে পারে 'মিথ্যা কথা। ওখান থেকে কোন তীরই ছোঁড়া হয় নি।' আমাদের কথা যে সত্য, তার কোন চাক্ষুষ প্রমাণও আমরা দিতে পারব না। সে নিশ্চয়ই এ সন্দেহ করতে পারবে না যে, আমরা জানতে পেরেছি তারাপদই হচ্ছে বীরেন্দ্রলাল।"

জয়ন্ত মৃদুকণ্ঠে বললে, "শত্রুকে নিজের চেয়ে বোকা মনে করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বোকামি।"

সুন্দরবাবু কিঞ্চিৎ তপ্ত কণ্ঠে বললেন, "বেশ, দেখা যাক্। আপাততঃ এ-সব কথা থো কর ভায়া। তোমার শ্রীমান মধুসূদনকে স্মরণ কর, একটু চা এবং টা নিয়ে এলে ধন্য হই।"

জয়ন্ত ডাক দিলে, "মধু! অ মধুসূদন!"

পাশের ঘর থেকে পুরাতন ভৃত্য মধুর সাড়া এল, "আজ্ঞে!"

—"সুন্দরবাবুর তেষ্টা পেয়েছে।"

সুন্দরবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "খালি তেষ্টাই নয় মধু, বিলক্ষণ ক্ষুধারও উদ্রেক হয়েছে।"

সাড়া এল, "আজ্ঞে, বুঝেছি। একটু সবুর করুন।"

—"সবুর করছি মধু, সবুর করছি! সবুরে যে মেওয়া ফলে।"

চা এবং টা এল অনতিবিলম্বে। এবং তারই পালা শেষ করতে করতে পৃথিবীর উপরে ঘনিয়ে উঠল আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ কালো ছায়া।

সুন্দরবাবু 'ন্যাপ্‌কিন' দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে আসন ত্যাগ ক'রে একটা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর পর্দা একটু টেনে উঁকি মেরে সোল্লাসে বললেন, "জয়ন্ত হে, তোমার ধারণাই ভ্রান্ত!"

জয়ন্ত কেবল বললে, "তাই নাকি?"

—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! জাতীয় সেবক-সমিতির ঘরে আলো জ্বলেছে। একাধিক সভ্যের শুভাগমন হয়েছে!"

—"শুনে সুখী হলুম।"

সুন্দরবাবু আবার একবার উঁকি মেরে বললেন, "কেবল সভ্য নয়

হে, দুটি সভ্যাকেও দেখছি যে!"

—"বটে! হয়তো ওঁদেরই মধ্যে একটি শ্রীমতী আজ আমাদের এখানে এসে মধুকে ভোগা দিয়ে গিয়েছেন। মধু, অ শ্রীমধুসূদন!"

মধু এসে বললে, "আজ্ঞে!"

—"জানলায় গিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখে এস তো, মেসবাড়ির দোতালার ঘরে যে দুটি মেয়ে আছে, তাদের কারুকে তুমি চেন কিনা?"

মধু দেখে এসে বললে, "উঁহু, ঠাকরুণদের কারুকেই চিনি না তো!"

—"আচ্ছা, যাও।"

মধুর প্রস্থান। মিনিট-কয়েক কাটলো।

জয়ন্ত সুধোলে, "অতঃপর?"

সুন্দরবাবু বললেন, "সভ্যের পর সভ্য আসছে, আসছে, আসছে! ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছে বহু সিগারেটের ধোঁয়া! একজন লোক টেবিলের ধারে উঠে দাঁড়াল। বোধহয় সে বক্তৃতা দিতে চায়!"

—"তাই নাকি? তাহ'লে সকলেই বোধ হয় এসে পড়েছে! আমরাই বা আর এখানে ব'সে থাকি কেন?"

সুন্দরবাবু জানলার ধার ত্যাগ ক'রে ভারিক্কে গলায় বললেন, "তবে এইবারে শুরু হোক্ আমাদেরও অভিযান!"

মাণিক কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে মিলিটারি কায়দায় একটা সেলাম ঠুকে বললে, "যো হুকুম, জেনারেল!"

কয়েকজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে সমিতি-গৃহে সুন্দরবাবু প্রভৃতির প্রবেশ।

ঘরের ভিতরে ছিল এগারো জন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক। পুলিশ দেখে কেউ বিস্মিতও হ'ল না, ভয়ও পেলে না। যে যার আসনে স্থির ও শান্ত ভাবে ব'সে রইল।

সকলের মুখের উপরে একবার তীব্র দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সুন্দরবাবু হুম্‌কি দিয়ে বললেন, "এই! কার নাম বীরেন্দ্রলাল চৌধুরী?"

একজন বললে, "কারুর নাম নয়।"

—"মানে ?"

—"মানে, বীরেন্দ্রলাল চৌধুরী এখানে হাজির নেই।"

—"কোথায় সে ?"

—"কলকাতার বাইরে।"

—"কলকাতার বাইরে, কোথায় ?"

—"তা তিনিই জানেন।"

—"কলকাতার বাইরে সে গিয়েছে কেন ?"

—"তা তিনিই জানেন।"

—"কবে সে ফিরবে ?"

—"তা তিনিই জানেন।"

—"তুমি তো ভারি ধড়ীবাজ দেখছি হ্যা !"

—"আমি ধড়ীবাজ নই।"

—"তবে তুমি কি ?"

—"এই সমিতির সহকারী সম্পাদক।"

—"বীরেন এখানকার কি ?"

—"সম্পাদক।"

—"ও, তুমি তাহ'লে বীরেনের ডান হাত ?"

—"দেখতেই পাচ্ছেন আমি বাঁ কি ডান কোন হাতই নই, পুরো-পুরি একটা গোটা মানুষ।"

—"তুমি তো ভারি ফাজিল হে !"

—"আমি ফাজিল নই।"

—"হুম্ !"

ঘরের ভিতরে যে নারী দুটি ছিল তারা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসি ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগল।

জয়ন্ত চুপিচুপি বললে, "ব্যাপারটা ক্রমেই প্রহসন হয়ে উঠছে মাণিক ! এখান থেকে অদৃশ্য হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।"

মাণিক বললে, "তথাস্তু।"

বাড়িতে ফিরে এসে জয়ন্ত বললে, "আমি তো জানতুম সবই অষ্ট-রম্ভায় পরিণত হবে! পায়রারা যত সহজে ফাঁদে পা দেয়, কাকরা তা দেয় না। বীরেন হচ্ছে কাক-জাতীয় অপরাধী।"

মাণিক বললে, "আচ্ছা জয়, তুমি কি মনে কর বীরেনই হচ্ছে মুকুন্দ-বাবুর হত্যাকারী?"

—"অসম্ভব নয়। তবে মুকুন্দবাবুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নিশ্চয়ই বীরেনের কোন-না-কোন সম্পর্ক আছে।"

—"কি প্রমাণে এ কথা বলছ?"

—"বীরেনের হাতে লেখা চিঠিখানার কথাই ধর। তার উপরে হত্যাকারীর লোভ হ'ল কেন? নিশ্চয়ই সে ভেবেছিল চিঠিখানা ঘটনা-স্থল থেকে সরিয়ে না ফেললে হত্যাকারী ধরা পড়তে পারে। আর এ কথা ভাবতে পারে কে? নিশ্চয়ই এমন কোন লোক, যে নিজে হত্যা-কারী বা তার সাহায্যকারী। সুতরাং দুই দিক থেকেই দেখা যাচ্ছে, মুকুন্দবাবুর হত্যাকাণ্ডে বীরেন্দ্রলাল গ্রহণ করেছিল কোন বিশিষ্ট ভূমিকা। মাণিক, পুরো চিঠিখানা পেলে আমাদের সকল সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত। দুঃখের বিষয়, আমরা তা পাই নি।"

মাণিক বললে, "কিন্তু মুকুন্দবাবুর দুই পুত্রই পলাতক কেন?"

—"ভয়ে মাণিক, ভয়ে। পুলিশের ভয়ে নয়, যে ভয়ের জন্যে মুকুন্দ-বাবু আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁর পুত্ররাও পলায়ন করেছে সেই অজ্ঞাত ভয়ের তাড়নাতেই। তারা হত্যাকারী নয়।"

—"তুমি এতটা নিশ্চিত কেন?"

—"আমি নিশ্চিত নই, এটা আমার সহজ বুদ্ধির অনুমান মাত্র। প্রথমত, পিতৃহত্যা অস্বাভাবিক। বিশেষত, দুই ভাই একজোট হয়ে পিতৃহত্যা করবে, এটা আবার আরো অস্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, মনে ক'রে দেখ, মুকুন্দবাবুর দেরাজের ভিতরে পাওয়া গিয়েছে দুখানা একশো টাকার আর পঁচিশখানা দশ টাকার নোট। সনৎ আর অশোক

পিতৃহত্যা করলে অতগুলো টাকা ফেলে রেখে যেত না।”

—“যদি অন্য লোকই হত্যাকারী হয়, তবে সেও তো ঐ টাকাগুলো নিয়ে যায় নি?”

—“নিশ্চয়ই সে অধিকতর মূল্যবান দ্রব্যের লোভে মুকুন্দবাবুর বাড়িতে এসেছিল। আর এও হ'তে পারে, পিতা নিহত হয়েছেন জেনে পুত্ররা যখন সভয়ে পলায়ন করে, হত্যাকারীও তখন জানাজানি হবার আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি স'রে পড়তে বাধ্য হয়, নোটগুলো হস্তগত করবার অবকাশ পায়নি। যাক, আজ আর এ-সব নিয়ে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত ক'রে লাভ নেই, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বাঁশি বাজানো যাক্, তুমি তবলায় ঠেকা দাও।”

পরের দিন প্রভাতী ভ্রমণ সাঙ্গ ক'রে ফিরে এল জয়ন্ত ও মাণিক।

মাণিক ঢুকল বৈঠকখানায় খবরের কাগজ পড়তে, জয়ন্ত উপরে গেল জামা-কাপড় ছাড়তে।

একটু পরেই জয়ন্ত চেঁচিয়ে ডাক দিলে, “মাণিক! শীগ্‌গির উপরে এস।”

উপরে গিয়ে মাণিক দেখলে, একখানা কাগজ হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে জয়ন্ত।

—“ব্যাপার কি জয়?”

—“কাগজখানা প'ড়ে দেখ।”

কাগজের উপরে লেখা ছিল: “আজ রাত দশটার সময়ে আমরা তোমার প্রাণবধ করব। ভগবানও তোমাকে রক্ষা করতে পারবেন না।”

পাঁচ

পদচিহ্ন

জয়ন্ত বললে, "আশ্চর্য! চিঠিখানা আমার দোতালা ঘরের ভিতরে এল কেমন ক'রে?"

মাণিক বললে, "নিশ্চয়ই উড়ে আসেনি, কোন মানুষ ওখানা বহন ক'রে এনেছে।"

—"বলা বাহুল্য। কিন্তু মাণিক, আমরা যখন বাড়ি থেকে বেড়াতে বেরুই চিঠিখানা তখন যে ওখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল না, এ আমি হলপ্ ক'রে বলতে পারি।"

—"তাহ'লে আমরা বেরুবার পর চিঠিখানা এসেছে।"

জয়ন্ত হাঁকলে, "মধু!"

মধুর প্রবেশ।

—"আমরা বাইরে যাবার পর কেউ আমাকে ডাকতে এসেছিল?"

—"কৈ, না তো!"

—"কেউ তোমাকে কোন চিঠি দিয়ে যায় নি?"

—"না বাবু, কেউ না।"

—"তাহ'লে আমার দোতালা ঘরে এই চিঠিখানা রেখে গেল কে?"

জয়ন্তের হাতের পত্রের দিকে মধু হতভম্বের মত হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে বললে, "এ যে আজব কাণ্ড বাবু, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!"

—"দেখ মধু, ভালো ক'রে ভেবে দেখ।"

—"আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, আজ আর কেউ এ-বাড়িতে আসেনি। বাইরের কোন লোককে দরোয়ানই বা বাড়িতে ঢুকতে দেবে কেন?"

—"আচ্ছা, দরোয়ানকেও জিজ্ঞাসা ক'রে এস দেখি।"

মধু ঘরের বাইরে গেল। জয়ন্ত রাস্তার দিকের জানলাগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললে, "জানলার সব গরাদে ঠিক আছে। বন্দুকের গুলির মত পর্দা ফুঁড়েও চিঠিখানা ঘরে ঢুকতে পারে না।"

সে কার্পেটের উপরে চোখ বুলোতে বুলোতে দরজার কাছে গেল। তারপর হেঁট হয়ে কি দেখে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ল।

মধু দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

—"দরোয়ান কি বললে, মধু?"

—"বাইরের জনপ্রাণী বাড়ির ভিতরে আসেনি।"

—"আমরা বাইরে বেড়াতে গিয়ে একঘণ্টা বিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসেছি। এ সময়টায় তুমি কোথায় ছিলে?"

মধু বললে, "প্রথমে তেতালার ঘরগুলো ঝেড়ে-পুঁছে এই ঘরে আসি।"

—"তখন কি আমার বসবার সোফার উপরে এই চিঠিখানা দেখেছিলে?"

—"উঁহু, চিঠি-ফিটি কিছুই ওখানে ছিল না।"

—"তারপর।"

—"সিঁড়ির পাশের ঘরে ব'সে বামুন-ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করছিলুম।"

—"আর কোথাও যাওনি?"

—"না।"

—"সে সময়ে আর কোন বাইরের লোক দোতালায় এলে নিশ্চয়ই তুমি দেখতে পেতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, তুমি যাও। মাণিক, সিঁড়ির পাশের ঘর থেকে এ ঘরের দরজাটা দেখা যায় না বটে, কিন্তু এদিকে আসতে গেলে যে-কোন লোককে তো সিঁড়ির পাশের ঘরের সুমুখ দিয়ে আসতেই হবে। অথচ মধু বলছে বাইরের কারুকে সে দেখেনি।"

মাণিক বললে, "দরোয়ান কারুকে দেখেনি, মধুও কারুকে দেখেনি, কিন্তু কেউ যে এখানে এসেছে তার প্রমাণ এই চিঠি।"

—"একটা প্রমাণ নয় মাণিক, দ্বিতীয় প্রমাণেরও অভাব নেই।"

মাণিক সবিস্ময়ে বললে, "দ্বিতীয় প্রমাণ?"

—"হ্যাঁ। এগিয়ে দরজার কাছে এস। কার্পেট যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে রয়েছে সাদা মার্বেলের খোলা মেঝে। ঐখানে তাকিয়ে দেখ।"

মাণিক হেঁট হয়ে দেখে বললে, "তাইতো, একটা অস্পষ্ট কাদা-মাখা পায়ের ছাপ না?"

—"হ্যাঁ। কঠিন মার্বেলের উপরে আগন্তুকের পায়ের ছাপ পড়বার কারণ কি? প্রথমত, সে এসেছিল খালি পায়ে। দ্বিতীয়ত, তার পা কেবল ধুলোমাখাই নয়, জলমাখাও ছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এ হচ্ছে ভিজে পায়ের ধুলো, তাই অস্পষ্ট কাদার মত দেখাচ্ছে। কিন্তু মাণিক, এখানেও আর এক বাধা আছে।"

—"কি রকম?"

—"আমরা ধ'রে নিলুম যেন, নিঃশব্দে চলা-ফেরা করবার জন্যেই আগন্তুক পাদুকা ত্যাগ করেছিল, আর তাই তার পায়ে লেগেছিলো ধুলো। কিন্তু তার পায়ে জল লাগল কেন? কাল কি আজ বৃষ্টি হয়নি, আমার বাড়ির চারিদিক করছে শুক্‌নো খট্‌-খট্‌। তবু আগন্তুকের পায়ে জল লাগল কেন? এস, এ ধাঁধার উত্তর পাবার জন্যে আর একটু চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্‌।"

ঘরের বাইরেও ছিল মার্বেলে বাঁধানো মেঝে। একখানা আতশী কাচ নিয়ে জয়ন্ত মেঝের উপরে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর মেঝের উপরটা পরীক্ষা করতে করতে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হ'ল তার 'বাথ্‌-রুমে'র দরজা পর্যন্ত। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এতক্ষণে তবু একটা হদিস পেলুম!"

—"কিসের হদিস?"

"এখানেও অস্পষ্ট পায়ের কতগুলো চিহ্ন আছে, আর সেগুলো এসেছে আমার স্নানঘরের ভিতর থেকেই। এই দেখ, স্নানঘরের চৌকাঠের বাইরেই যে পদচিহ্নটা রয়েছে, সেটা কেবল স্পষ্টই নয়, দস্তুর-মত কর্দমাক্ত। নিশ্চয়ই এটা স্নানঘর থেকে আগন্তুকের প্রথম পদক্ষেপের চিহ্ন—তার পা যখন খুব বেশি ধূলিধূসরিত ছিল। তারপর দেখ, পায়ের দাগগুলো ক্রমেই বেশি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। সবশেষে আমার ঘরের ভিতরে যে পায়ের ছাপটা আছে, সেটা এত অস্পষ্ট যে ভালো ক'রে লক্ষ্য না করলে চোখে সহজে ধরাই পড়ে না।"

মাণিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "কিন্তু স্নানঘরের তো একটিমাত্র দরজা, আর তাও রয়েছে বাড়ির ভিতর দিকেই!"

জয়ন্ত বললে, "আগন্তুক যে বাড়ির ভিতর দিকের বারান্দা পার হয়েই এইদিকে এসেছে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।"

—"কিন্তু বারান্দায় তার পায়ের ছাপ পড়েনি।"

—"পড়বে কেন, বারান্দায় তো জল ছিল না। সে বারান্দা পার হয়ে এইদিক দিয়ে প্রথমেই যায় আমার স্নানঘরে। বেড়াতে যাবার আগে আমি স্নান করেছিলুম, কাজেই স্নানঘরের মেঝেটা ছিল জলে জলময়। আগন্তুকের পা তাইতেই ভিজে যায়।"

—"কিন্তু জয়ন্ত, মধু নিশ্চিত ভাবেই বলছে, বারান্দা দিয়ে কোন লোকই তোমার ঘরের দিকে আসেনি।"

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে মৃদুস্বরে যেন আপন মনেই বললে, "হুঁ, সেইটেই হচ্ছে সমস্যা। কেবল সে বারান্দা দিয়ে আসেনি, তাকে যেতেও হয়েছে ঐ বারান্দা দিয়েই। সে অশরীরী নয়। অথচ সে মধুর চোখে পড়েনি।"

—"আর আগন্তুক প্রথমে স্নানঘরেই বা গিয়েছিল কেন?"

—"ঠিক! মাণিক, তুমি বুদ্ধিমানের মত প্রশ্ন করেছ! এও আর এক সমস্যা! কিন্তু হয়তো এ সমস্যার সমাধান আমি করতে পারব।"

মাণিক ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "তাহ'লে তুমি কোন সূত্র পেয়েছ?"

—"সূত্র ? সেটা কেবল আমরা কেন, তোমারও চোখের সামনে তো প'ড়েই রয়েছে। এখন কিঞ্চিৎ কল্পনা-শক্তি প্রয়োগ ক'রে সূত্রটাকে যদি আরো কিছুদূর টেনে নিয়ে যেতে পারো, তা'হলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যাক্, আপাততঃ সুন্দরবাবুকে সংবর্ধনা করবার জন্যে প্রস্তুত হও—ঐ শোনো তাঁর কণ্ঠস্বর আর পদশব্দ !"

সুন্দরবাবু দেখা দিলেন, রহস্যময় আগন্তুকের আবির্ভাবের কথা শুনলেন, ভয়-দেখানো চিঠিখানা পড়লেন এবং পদচিহ্নগুলো পরিদর্শন করলেন। তারপর বললেন, "হুম্ ! সন্দেহ হচ্ছে, সন্দেহ হচ্ছে, আমার সন্দেহ হচ্ছে !"

মাণিক বলল, "বটে ?"

—"হ্যাঁ, জয়ন্তের চাকর মধুর আর রাঁধুনির উপরে আমার সন্দেহ হচ্ছে ! তারাই তো এ বাড়িতে খালি-পায়ে আনাগোনা করে। এই পদচিহ্নগুলোর সঙ্গে তাদের পা মেলে কিনা আমি দেখতে চাই।"

জয়ন্ত বললে, "পদচিহ্নগুলো পালিয়ে যাচ্ছে না, দরকার হ'লে পরে আপনার সন্দেহভঞ্জন করতে পারেন। আপাততঃ সবচেয়ে বড় প্রশ্নের জবাব দিন দেখি !"

—"সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আবার কি ?"

—"ধরলুম আমাকে ভয় দেখিয়ে ঐ চিঠিখানা লিখেছে বীরেন্দ্রলালই ! সে বলেছে আজই আমাকে নিশ্চয়ই যমের বাড়িতে পাঠাবে ! কাল নয়, পরশু নয়, আজই ! সে এতটা নিশ্চিত কেন ?"

সুন্দরবাবু তাচ্ছিল্য-ভরে বললেন, "যেতে দাও ভায়া, বীরেনের কথা যেতে দাও। আজ এই বাড়ি ঘিরে এমন পুলিশ পাহারা বসাব যে, একটা মশা কি মাছি পর্যন্ত তোমার ত্রিসীমানায় আসতে পারবে না।"

জয়ন্ত বললে, "পুলিশ-পাহারাই প্রাণরক্ষার প্রধান উপায় নয়। পুলিশ যেখানে গিস্-গিস্ করছে সেই থানার ভিতরে ব'সেই তো বিস্ফোরকের মহিমায় আপনি আর একটু হ'লেই স্থূল কলেবর ত্যাগ করতেন ! আমার মাথায় জেগেছে আর এক সন্দেহ ! এস মাণিক,

আমাকে সাহায্য করবে এস।"

জয়ন্ত ঘরের ভিতরে ঢুকল—পিছনে পিছনে মাণিক ও সুন্দরবাবু।

জয়ন্ত বললে, "মাণিক, এস আমরা ঘরের ভিতরটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজি। সুন্দরবাবুও সাহায্য করতে পারেন। দেখা যাক্, বিপদজনক কিছু পাওয়া যায় কিনা।"

প্রায় পনেরো মিনিট ধ'রে ঘরের চারিদিকে চলল খোঁজাখুঁজি। সোফা-কৌচ সরিয়ে, আলমারি টেনে, দেরাজ খুলে, এমন কি কার্পেট উল্টেও কিছুই আবিষ্কার করা গেল না। অবশেষে বইয়ের শেলফের একসার কেতাবের পিছনে হাত চালিয়ে জয়ন্ত একটা জিনিস বার করলে।

সুন্দরবাবু সচমকে বললেন, "কী ওটা?"

জয়ন্ত সহজ কণ্ঠে শান্ত ভাবে বললে, "মাত্র একটি ঘড়িবোমা। পাশ্চাত্য দেশে এইরকম ঘড়ি-বোমা ব্যবহার করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে এটা ফেটে যেত, আর আমাকে পথ থেকে সরিয়ে বীরেন্দ্রলালও আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচত। কিন্তু তখন আপনার পুলিশ-পাহারা আমার কি উপকারে লাগত সুন্দরবাবু?"

সুন্দরবাবু স্তম্ভিত। মাণিকের অবস্থাও তাই।

জয়ন্ত বললে, "আমি গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলুম, বীরেনের চর কেবল একখানা চিঠি বিলি করবার জন্যেই আমার বাড়িতে পদার্পণ করেনি! যদিও ঐ চিঠিখানা না লিখলে নিশ্চয়ই আমি কোন সন্দেহ করতে পারতুম না। এই অতি-ধূর্ততার জন্যেই অপরাধীরা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে। ভালো কথা সুন্দরবাবু! কাল সকালে সূর্যোদয়ের আগে আপনার কোন সুদক্ষ গুপ্তচর নিয়ে আমার এখানে আসতে পারবেন?"

—"কেন বল দেখি?"

—"আজ বোমা ফাটলো না দেখে ক্রুদ্ধ বীরেন্দ্রলাল আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে কাল সকালে আবার তার চরকে এখানে প্রেরণ করতে পারে।"

—"কিন্তু কেমন ক'রে জানলে সকালেই সে আসবে?"

—"সে যদি আসে তো সকালেই আসবে। লোকটা যে কে, আমি তা অনুমান করতে পেরেছি।"

সুন্দরবাবু সাগ্রহে ব'লে উঠলেন, "কে সে, কে সে?"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "ব্যস্ত হবেন না—অতি-ব্যস্ততা গোয়েন্দার শত্রু! যা বলবার কাল সকালেই বলব!"

ছয়

ডিউটি ইজ্ ডিউটি

পরদিনের সকাল। বেলা সাড়ে সাতটা হবে। তেতালার বারান্দার পর্দা নামিয়ে দিয়ে পর্দার ফাঁকে চোখ রেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে জয়ন্ত।

তার পিছনেই দণ্ডায়মান মাণিক, সুন্দরবাবু ও আর একটি লোক। তার নাম নবীন, পুলিশের চর।

প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর হঠাৎ জয়ন্তের দেহ সোজা হয়ে উঠল। পর্দার ফাঁকে তার দৃষ্টিও হয়ে উঠল অতিশয় জাগ্রত।

কেটে গেল মিনিট পাঁচ।

জয়ন্ত ফিরে মৃদুস্বরে ডাকলে, "নবীন, এগিয়ে এস।"

নবীন কাছে এসে দাঁড়াল।

—"নবীন, পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখ, একটা লোক দোতালা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে।"

নবীন পর্দার ফাঁকে চোখ চালিয়ে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"ওর পিছু নাও। আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে লোকটা কোথায় যায় দেখে এস।"

নবীনের দ্রুতপদে প্রস্থান।

সুন্দরবাবু সুধোলেন, "ব্যাপার কি জয়ন্ত?"

—"বীরেনের চর এসেছিল।"

—"সে কি, তাকে ছেড়ে দিলে কেন?"

—"আপাততঃ তাকে ছেড়ে দিয়ে পরে গ্রেপ্তার করলেও চলবে। আগে আমি দেখতে চাই, সে বীরেনের আড্ডায় যায় কিনা।"

—"লোকটা কে?"

—"সব পরে বলছি, আগে নিচে নেমে চলুন।"

সেদিনও দোতালায় সিঁড়ির পাশের ঘরে ব'সে চায়ের জল গরম করছিল মধু।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "মধু, এ ঘরে তুমি কতক্ষণ আছ?"

—"তা আধঘণ্টা হবে বাবু।"

—"এর মধ্যে কোন লোককে তুমি এখান দিয়ে যেতে দেখ নি?"

—"দেখেছি।"

—"কাকে?"

—"আপনাদের সঙ্গে যে বাবুটি উপরে ছিলেন, একমাত্র তাঁকে নেমে যেতে দেখেছি।"

—"বটে। আর কেউ নয় ?"

—"উঁহু, বাইরের আর কারুকে তো দেখিনি !"

জয়ন্ত মুখ টিপে হেসে বললে, "মধু, তুমি একটি আস্ত গাড়ল !"

মধু কাঁচুমাচু মুখে বললে, "কেন বাবু, কি অপরাধ আমি করেছি ?"

—"কিছু না। তবু তুমি একটি গাড়ল। আসুন সুন্দরবাবু !" জয়ন্ত নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই সে চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করলে। তারপর বললে, "না, বীরেন আজও পত্রে আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়নি। সে বুঝে নিয়েছে, শত্রুকে আগে থাকতে সাবধান ক'রে দিলে ফল ভালো হয় না। এইবারে দেখ মাণিক, মেস-বাড়ির জানলা থেকে বীরেন আমাদের সকলের অভ্যাসই লক্ষ্য ক'রে দেখেছে। সে জানে ভিতর-দিককার জানলার ধারে টেবিলের সামনে ঐ গদীমোড়া চেয়ারখানায় আমি ছাড়া আর কেউ বসে না। তেতালার বারান্দায় আমি যেখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, সেখান থেকে ঐ চেয়ারখানার খানিকটা দেখা যায়। আমি দেখেছি, বীরেনের চর ঐ চেয়ারখানার উপরে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন করছে! এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন সে ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ?"

মাণিক বললে, "ব্যাপারটা যে ক্রমেই আশ্চর্য হয়ে উঠছে। কে বীরেনের চর ? তুমি তাকে দেখলে, নবীন তাকে দেখলে, অথচ মধু তাকে দেখতে পেলে না !"

জয়ন্ত বললে, "না মাণিক, মধু নিশ্চয়ই তাকে দেখেছে, কাল দরোয়ানও তাকে দেখেছে !"

—"দেখেও তারা বলছে, দেখেনি। তবে কি তারা মিথ্যাকথা বলছে ?"

—"না।"

—"একি হেঁয়ালি !"

—"তাকে তারা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে নি !"

—"কেন ?"

—"কারণ সে রোজ সকালে এখানে আসে, আর নীরবে নিজের কাজ সেরে চ'লে যায়। যেমন গয়লা। রোজ সকালে সে এখানে আসে, কালও নিশ্চয় এসেছিল। কিন্তু মধু বা দরোয়ান তার কথা একবারও উল্লেখ করে নি।"

—"তুমি তাকেই সন্দেহ করছ?"

—"মোটেই নয়।"

—"তবে?"

—"আমার সন্দেহ ঝড়ু ধাঙড়কে। রোজ সকালে একমাত্র সেই-ই দোতালায় উঠে স্নানঘরের ভিতর দিয়ে পাইখানা পরিষ্কার করতে যায়। কাল যখন আমার ঘরের ভিতরে চিঠি আর ঘড়ী-বোমা পেলুম, তখন বেশ বোঝা গেল, শত্রুপক্ষের কেউ না কেউ এখানে এসেছিল। কিন্তু মধু বললে, সে কারুকে দেখেনি! এটা অসম্ভব। অথচ মধু হচ্ছে অনেক-কালের বিশ্বাসী চাকর, সে মিথ্যা বলবে না। ঘরের মেঝেতে আবিষ্কার করলুম আগন্তুকের ধুলোমাখা সিক্ত পদচিহ্ন, আর তা এসেছে স্নান-ঘরের ভিতর থেকেই—যেখানে রোজ সকালেই ঝড়ুর আবির্ভাব হয়। তখনই আন্দাজ করলুম মধু ঐ ঝড়ুকে সন্দেহযোগ্য বা উল্লেখযোগ্য জীব ব'লে মনে করে না। এখন দেখছ তো মাণিক, আমার আন্দাজ মিথ্যা নয়।"

সুন্দরবাবু বললেন, "তাহ'লে তুমি বলতে চাও, ঐ ঝড়ু-বেটা হচ্ছে বীরেনের দলের লোক?"

—"আগে ছিল না, এখন আমাকে পথ থেকে সরাবার জন্যে বীরেন ওকে দলে টেনেছে আর কি! টাকার লোভ দেখিয়ে একটা ধাঙড়কে ভোলাতে কতক্ষণ লাগে!"

—"হুম্, তোমার চেয়ারখানার কাছে দাঁড়িয়ে ঝড়ু আজ আবার কি করছিল, সেটাও এইবারে দেখতে হয় তো!" সুন্দরবাবু সাবধানে পায়ে পায়ে এগিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "উঁহু! ঘড়ি বোমা-টোমা কিছুই নজরে ঠেকছে না তো! একেবারে ফোক্কা!"

জয়ন্ত চেয়ারের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ল। তারপর এক-খানা আতশী কাচের ভিতর দিয়ে চেয়ারের গদী ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে বললে, "নতুন গদী, কিন্তু এর মাঝখানে রয়েছে একটা ছোট্ট ফুটো। আশ্চর্য!"

সে একটু ভেবে আবার বললে, "মাণিক, আমাকে একখানা পেন্সিল-কাটা ছুরি দাও তো!"

মাণিক ছুরি এনে দিলে। জয়ন্ত ফুটোর চারিপাশ থেকে গদীর চামড়ার খানিকটা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে কাটা অংশটা তুলে নিয়ে বললে, "এইবারে দেখুন সুন্দরবাবু!"

—"কি ওটা? গদীর ভিতরে সোজা ভাবে গাঁথা রয়েছে একটা চক্‌চকে ইস্পাতের শলাকা।"

—"হ্যাঁ, আমার মারণ-অস্ত্র! আজ এই গদীতে বসলে সেই বসাই হ'ত আমার শেষ-বসা! ও শলাকাটা যে বিষাক্ত, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই!"

সুন্দরবাবু শিউরে উঠে বললেন, "হুম্ রে বাবা, এবারে আমরা সত্যিই এক নরপিশাচের পাল্লায় পড়েছি!"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, সামনের ঐ মেসবাড়ির উপরে পাহারা বসানো দরকার।"

—"বলা বাহুল্য ভায়া, বলা বাহুল্য! ঐ বাড়িখানার উপরে পাহারা দিচ্ছে দুই দিক থেকে দু'জন লোক। মেসের মালিককে দস্তুরমত ধমক দিয়ে ব'লে এসেছি, যদি সে বাঁচতে চায়, বীরেনের আবির্ভাব হ'লেই যেন আমাকে খবর দিতে দেরি না করে!"

—"বীরেন নির্বোধ নয়, আপাততঃ এ পাড়া মাড়াবে ব'লে মনে হয় না। তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা এখানে থেকে আমাদের খবরাখবর নিয়ে যথাস্থানে গিয়ে দিয়ে আসছে, আর সে দূরে নিরাপদে ব'সে আমাদের চারিদিক ঘিরে জালের পর জাল ফেলছে।"

সুন্দরবাবু দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে বললেন, "একবার যদি শয়তানের

নতুন আড্ডার সন্ধান পাই।"

জয়ন্ত বললে, "নবীন ফিরে এলে হয়তো একটা কোন হদিস পাওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, ভালো কথা সুন্দরবাবু! আপনি বলেছিলেন, সিঙ্গাপুরে বীরেনের একখানা ডায়েরী পাওয়া গিয়েছে।"

—"হ্যাঁ, পাওয়া গেছে তো।"

—"সেখানা একবার দেখব।"

—"আর ধেৎ, নিতান্ত বাজে ডায়েরী, একটাও কাজের কথা নেই।"

জয়ন্ত হেসে বললে, "কি যে কাজের আর কি যে বাজে, তা বলা সহজ নয়। দেখলেন তো, ঝড়ুকে আমাদের মধু এতটা বাজে লোক ভেবেছিল যে, তার কথা মনের কোণেও ঠাঁই দেয়নি। এ-রকম ভ্রম যে স্বাভাবিক, যথাসময়ে তা ধরতে পেরেছিলুম ব'লেই এখনো আমি সশরীরে বাহাল-তবিয়তে বিদ্যমান আছি। সুতরাং ঐ নিতান্ত বাজে ডায়েরীখানা দয়া ক'রে একবার যদি আমার দৃষ্টিগোচর করেন তাহ'লে নিরতিশয় বাধিত হব।"

সুন্দরবাবু বললেন, "আচ্ছা, দেখা যাবে। এদিকে কথায় কথায় বেলা বেড়ে গেল, এখনো 'ব্রেক্‌ফাষ্টে'র দেখা নেই কেন? মধু কি ঠাউরেছে, আমরাও ঝড়ুর মতন বাজে লোক?"

মাণিক চেঁচিয়ে হাঁক দিলে, "ওহে মধু, সুন্দরবাবু বাজে লোক নন, জল্‌দি তাঁর জন্যে চা-টা নিয়ে এস।"

চায়ের পালা সাঙ্গ হবার আগেই নবীনের পুনরাবির্ভাব।

সুন্দরবাবু সুধোলেন, "কি খবর?"

নবীন বললে, "স্যর, আপনারা কি আমাকে একটা ধাঙড়ের পিছু নিতে বলেছিলেন? ধাঙড়টা এখান থেকে রাস্তায় গিয়ে এ-বাড়িতে ঢোকে, ও-বাড়িতে ঢোকে, তারপর আবার ময়লা নিয়ে বেরিয়ে আসে। এমনি সাত-আটখানা বাড়ির কাজ সেরে মাইলখানেক পথ পার হয়ে সে আবার আর একখানা বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল। প্রায় চল্লিশ মিনিট সেইখানে কাটিয়ে সে ফের বেরিয়ে এল। তারপর ফিরে গেল ধাঙড়দের

আস্তানায়।"

জয়ন্ত বললে, "শেষ যে বাড়িতে সে ঢুকেছিল তার ঠিকানা কি?"

—"চব্বিশ নম্বর শ্রীমন্ত পাল স্ট্রীট।"

—"সুন্দরবাবু, আমাদের দরকার ঐ বাড়িখানাই।—পালের গোদা বোধ হয় ঐখানে গিয়েই নতুন বাসা বেঁধেছে।"

—"ডিউটি ইজ্ ডিউটি। ভেবেছিলুম আরো দু-এক পেয়ালা চা আর আরো খান-দুয়েক ওমলেট ওড়াব, কিন্তু সে আশায় পড়ল ছাই! চটপট্ একখানা 'সার্চ-ওয়ারেন্ট' বার ক'রে বীরেনের নতুন বাসায় গিয়ে হাজির হতে হবে। ডিউটি ইজ্ ডিউটি!" বলতে বলতে সুন্দরবাবু চেয়ারের উপর থেকে অঙ্গভার উত্তোলন করলেন।

সাত

ললিতা দেবী

পরের দিন সকাল-বেলায় সুন্দরবাবু এসে হাজির; তাঁর দেহে ও মুখে হতাশার ভাব।

মাণিক বললে, "ব্যাপার কি সুন্দরবাবু, আপনাকে ভগ্নদূতের মত দেখাচ্ছে যে!"

—"আমি প্রায় ভগ্নদূতই বটে। বহন ক'রে এনেছি পরাজয়ের বার্তা।"

জয়ন্ত বললে, "আপনি কাল বৈকালে চব্বিশ নম্বর শ্রীমন্ত পাল স্ট্রীট সার্চ করতে গিয়েছিলেন না?"

—"হুম্।"

—"কি হ'ল?"

—"পর্বতের মূষিক-প্রসব।"

—"তার মানে?"

—"তার মানে হচ্ছে, ঐ রাস্তায় ঐ ঠিকানায় বীরেন্দ্রলাল ব'লে কেউ থাকে না।"

—"তবে কে থাকে?"

"ললিতা দেবী নামে একটি মহিলা, তাঁর স্বামী এখন আমেরিকায়।"

—"বাড়িতে আর কোন লোক নেই?"

—"আছে। পাচক, বেয়ারা, দাসী। ললিতা দেবীকে দেখে যা বুঝলুম, একেবারে 'আপ-টু-ডেট' মেয়ে। নিজের ভার নিজেই নিতে পারেন।"

—"বাড়িখানা সার্চ করেছিলেন তো?"

—"নিশ্চয়ই! সন্দেহজনক মানুষ বা জিনিস কিছুই পাই নি।"

—"ললিতা দেবীর বর্ণনা দিন।"

—"মাথায় বেশ লম্বা। ছিপছিপে, কিন্তু সুগঠিত দেহ। রং ধব্‌ধবে ফর্সা। বিলাতী কেতায় খাটো ক'রে ছাঁটা চুল কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়েছে। একেলে মেয়েদের মত রঙ-পাউডার মাখা মুখ। ভুরু দুটি খুব সূক্ষ্ম দেখাবার জন্যে বোধ হয় ক্ষুরের আশ্রয় নেওয়া হয়। ডাগর চোখে ফ্রেম-হীন চশমা, টিকালো নাক, পাতলা ঠোঁট, ডান গালের উপরে একটি বড় কালো আঁচিল আছে। সাজপোশাক অত্যন্ত সৌখিন। পায়ে স্লিপার। বয়স সাতাশ-আটাশ। ভারিক্কে চালচলন।"

জয়ন্ত হেসে বললে, "প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দার মত ললিতা দেবীর বিশেষত্ব আপনি বেশ লক্ষ্য করেছেন দেখছি।"

—"লক্ষ্য করব না? লক্ষ্য করাই যে আমাদের পেশা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত লক্ষ্য করাও ব্যর্থ হ'ল। ললিতা দেবী আমাদের কোন কাজে লাগবেন না।"

জয়ন্ত মৃদু কণ্ঠে বললে, "হয়তো লাগবেন না, হয়তো লাগবেন।"

—"এ কথা কেন বলছ?"

সে কথার জবাব না দিয়ে জয়ন্ত বললে, "আমার বাড়িতে ঝড়ুর

আসবার সময় উৎরে গিয়েছে। ঝড়ু আজ কাজে কামাই করলে কেন ?"

—"তবে কি সে বুঝতে পেরেছে, আমরা তার স্বরূপ ধ'রে ফেলেছি?"

—"তা ছাড়া আর কি ?"

—"কেমন ক'রে বুঝতে পারলে ?"

—"সুন্দরবাবু, আপনি কি ললিতা দেবীকে ঝড়ু সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?"

—"পাগল ! আমি ও-ধারও মাড়াই নি। ঝড়ুকে যে চিনি তার আঁচটুকু পর্যন্ত দিই নি।"

জয়ন্ত ভাবতে লাগল গম্ভীর মুখে। তারপর যেন নিজের মনেই বললে, "ঝড়ু কেমন ক'রে জানলে, পুলিশ তার পিছু নিয়েছে ?...... হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এটা সে জানতে পেরেছে, নইলে আজ এল না কেন ?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আপাততঃ ও-সমস্যা নিয়ে তুমিই থাকো, আমি এখন গা তুললুম।"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, আপনার হাতে কাগজ-মোড়া ওটা কি?"

—"বীরেনের ফোটো। কাগজে ছাপবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি।"

—"দেখি একবার।"

ফোটোখানা নিয়ে জয়ন্ত খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল। কেবল খালি চোখে দেখে খুশি হ'ল না, আতশী কাচেরও সাহায্য গ্রহণ করলে। তার দৃষ্টি কেবল তীক্ষ্ণ নয়, কঠিন হয়ে উঠল।

সুন্দরবাবু বললেন, "অতক্ষণ ধ'রে তুমি কি দেখছ হে ?"

—"কিছু না।" ফোটোখানা সে আবার ফিরিয়ে দিলে।

মধু প্রবেশ ক'রে বললে, "নবীনবাবু সুন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান।"

সুন্দরবাবু বললেন, "তাকে আসতে বল। জয়ন্ত, আমি এখনো হাল ছাড়িনি, নবীন এখনো ললিতা দেবীর বাড়ির উপরে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু সে পাহারা ছেড়ে এখানে এল কেন ?"

নবীনের আগমন।

—"কি ব্যাপার হে ?"

—"সেই ঝড়ু ধাঙড়টা আজ আবার চব্বিশ নম্বর শ্রীমন্ত পাল স্ট্রীটে গিয়েছিল। এক ঘণ্টা পরে বেরিয়ে এসে আবার নিজের ডেরায় ফিরে গিয়েছে।"

জয়ন্ত বললে, "শুনলেন তো সুন্দরবাবু? ঝড়ু এখানে এল না, কিন্তু ললিতা দেবীর বাড়িতে যেতে ভোলে নি। আর একঘণ্টা ধ'রে সেখানে সে কি করছিল ?"

সুন্দরবাবু বললেন, "ঝড়ু যে দু-দিন তোমার বাড়িতে সাংঘাতিক জিনিস রেখে গিয়েছে, এটা প্রমাণ করা কঠিন হবে না। ভাবছি আজই তাকে গ্রেপ্তার করব।"

—"তাই করুন।"

বৈকালে গোটাকয় জিনিস কেনবার জন্যে মোটরে চ'ড়ে জয়ন্ত ও মাণিক চলল হগ্ মার্কেটের দিকে। গাড়ি চালাচ্ছিল জয়ন্ত নিজে। মাণিক আসন গ্রহণ করেছে তার পাশেই।

কথা কইতে কইতে গাড়ি চালাচ্ছে জয়ন্ত। মাণিক কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা জয়ন্ত, মৃত মুকুন্দবাবুর হাতের মুঠোয় যে ছেঁড়া চিঠি পাওয়া গিয়েছে, তুমি তার ভিতর থেকে কোন তথ্য আবিষ্কার করতে পেরেছ কি ?"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "উঁহু! ছেঁড়া অংশের মধ্যে কথা ছিল এত অল্প যে, অর্থ করতে গেলেই সব খাপছাড়া ব'লে মনে হয়। কেবল তার একটি শব্দই বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।"

—"শব্দটি কি ?"

—"ময়ূর। কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে যেন, এই 'ময়ূর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কোন বিশেষ কারণেই।......আরে আরে, কি বিপদ!" সে চট্ ক'রে 'ব্রেক' ক'ষে থামিয়ে ফেললে গাড়ি।

একটি তরুণী মহিলা অন্যমনস্ক হয়ে পথ পার হ'তে গিয়ে গাড়ির সামনে এসে প'ড়েই নিজেকে সামলে নিতে গেলেন—কিন্তু পর-মুহূর্তেই

পা মচ্‌কে লুটিয়ে পড়লেন রাজপথের উপরে। চারিদিক থেকে লোক-জনরা হাঁ-হাঁ ক'রে উঠল, কিন্তু জয়ন্তের গাড়ি তখন নিশ্চল।

মহিলাটি তাড়াতাড়ি ওঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না—"উঃ!" ব'লে আর্তনাদ ক'রে আবার পথের উপরেই শুয়ে পড়লেন।

গাড়ি ছেড়ে টপাটপ্ লাফিয়ে পড়ল জয়ন্ত ও মাণিক। বিনা বাক্যব্যয়ে দুই বন্ধুই পাঁজাকোলা ক'রে মহিলাটির দেহ পথ থেকে তুলে স্থাপন করলে গাড়ির ভিতরে। তারপর নিজেরাও যথাস্থানে গিয়ে ব'সে আবার গাড়ি চালিয়ে দিলে। রাজপথে সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাকে যারা ভিড় সৃষ্টি ক'রে মজা দেখবার জন্যে, তারা দস্তুরমত নিরাশ হয়ে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইল ছুটন্ত মোটরখানার দিকে।

জয়ন্ত ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনাকে কোন্ ঠিকানায় পৌঁছে দেব?"

মহিলাটি আধ-শোয়া অবস্থায় যাতনা-বিকৃত মুখে দুই চক্ষু মুদে-ছিলেন। প্রশ্ন শুনে চোখ একটু খুলে ক্ষীণস্বরে বললেন, "বারো নম্বর মদনলাল স্ট্রীটে।"

মিনিট কয়েকের মধ্যেই গাড়ি যথাস্থানে গিয়ে হাজির। মাণিক গাড়ি থেকে নেমে বারো নম্বর বাড়ির কড়া নাড়তেই একজন দাসী এসে দরজা খুলে দিলে।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "আপনাকে বাড়ির ভিতর পর্যন্ত পৌঁছে দেব?"

মহিলা বললেন, "আমি নিজে হাঁটতে পারছি না। আমার স্বামী নিশ্চয়ই এখনো আপিস থেকে ফেরেন নি। আপনারা যখন এতটাই করলেন, তখন কি আমাকে দয়া ক'রে বাড়ির উপর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবেন না?"

—"বেশ।"

জয়ন্ত ও মাণিক আবার ধরাধরি ক'রে মহিলাটিকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল। একতালা, দোতালা, তেতালা। তরুণীর নির্দেশ-

মত তারা তাঁকে একখানি ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিলে।

মহিলাটি একখানি সোফার উপরে এলিয়ে প'ড়ে শ্রান্ত স্বরে বললেন, "আপনাদের ধন্যবাদ দেবার ভাষা নেই। কিন্তু আমার বড় ভয় করছে। আমার স্বামীর ফিরতে আর দেরি নেই। যতক্ষণ না তিনি আসেন, আপনারা এখানে অপেক্ষা করলে বড় ভালো হয়।"

জয়ন্ত নাচারের মত ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

মহিলাটি বললেন, "মোক্ষদা, এঁদের পশ্চিমের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে আয়।"

জয়ন্ত ও মাণিক দাসীর সঙ্গে সঙ্গে একখানা ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তারপর দাসী বেরিয়ে এল এবং পর-মুহূর্তেই ঘরের দরজাটা দড়াম্ ক'রে বন্ধ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ পুরুষ-কণ্ঠে কে হা হা হা হা ক'রে হেসে উঠে বললে, "জয়ন্ত, ভগবানের নাম স্মরণ কর, আজ তোর অন্তিম-কাল উপস্থিত!"

আট

তারের 'কয়েল'

জয়ন্ত চম্‌কে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "মাণিক, ভদ্রতা করতে গিয়ে ফাঁদে পা দিলুম নাকি?"

মাণিক নীরস কণ্ঠে বললে, "সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি! এটা কঠোর বিংশ শতাব্দী, 'শিভাল্‌রি'র যুগ আর নেই।"

—"তাই তো দেখছি হে! তাহ'লে কি ঐ মেয়েটার মোটরের সামনে এসে দাঁড়ানো, পা মুচকে পথের উপরে প'ড়ে যাওয়া, যন্ত্রণায় ছটফট করা, সবই মিথ্যা অভিনয়?"

মাণিক বললে, "হ্যাঁ, প্রথম শ্রেণীর অভিনয়— যা দেখে আমাদের মত

লোককেও বোকা বনতে হয়েছে।”

—“নিশ্চয় ঐ স্ত্রীলোকটা বীরেনদেরই সমিতির কেউ। বীরেন দেখছি নতুন পদ্ধতি ধরেছে। মেয়েদের লোকে সহজে সন্দেহ করে না ব'লে তাদেরই সে নিযুক্ত করেছে নিজের পাপকার্যে। এখন উপায়? দরজা ধ'রে টানাটানি ক'রে লাভ নেই, বাহির থেকে শিকল তুলে দেওয়ার শব্দ আমি শুনেছি।”

যেদিকে দরজা সেই দিকেই ছিল একটা জানালা। জয়ন্ত জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের শব্দ। একটা বুলেট এসে খটাং ক'রে লাগল জানলার লোহার গরাদের উপরে। গরাদেটা না থাকলে বুলেটটা যে জয়ন্তের বক্ষ ভেদ করত তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

ক্ষিপ্র হস্তে জানলাটা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে জয়ন্ত বললে, “দেখছি পয়লা নম্বরের নরহন্তার পাল্লায় এসে পড়েছি। নরহত্যা করতে একটুও ইতস্ততঃ করে না।”

বাহির থেকে কে চীৎকার ক'রে বললে, “জয়ন্ত, তিন-তিনবার চেষ্টার পর হাতের মুঠোয় তোকে পেয়েছি। এবারে তোর প্রাণপাখি মুক্তি পাবে, আর তোর মৃতদেহটা প'ড়ে থাকবে ঘরের মেঝের উপরে।”

জয়ন্ত ভিতর থেকে দরজার খিলটা লাগিয়ে দিলে।

—“দরজায় খিল তুলে দিচ্ছিস্? খিল তুলে দিয়ে বাঁচবি ভাবছিস্? দাঁড়া, আগে আমাদের দলবল এসে পড়ুক, তারপর তোর কি দশা করি দেখবি!”

জয়ন্ত সুধোলে, “কে তুমি?”

—“সে কথায় তোর কাজ কি?”

—“তুমি কি তারাপদ?”

—“ধর্ তাই!”

—“তাহ'লে তোমার আর একটা নাম আমি জানি।”

—“আমার আর কোন নাম নেই।”

—"আছে হে বাপু, আছে।"

—"শুনি, বল্ তো!"

—"বীরেন্দ্রলাল।"

সচকিত কণ্ঠে সে বললে, "কি বললি?"

—"বীরেন্দ্রলাল। জালিয়াত বীরেন্দ্রলাল, সে মুকুন্দবাবুকে হত্যা ক'রে এখনো ধরা পড়েনি।"

মিনিট খানেকের স্তব্ধতা। তারপর সগর্জনে শোনা গেল, "না, না, না! বীরেন্দ্রলালকে আমি চিনি না!"

—"তাহ'লে তুমি তারাপদ তো?"

—"হতেও পারি, না হ'তেও পারি!"

—"তুমি যদি তারাপদ না হও, তাহ'লে তুমি বীরেন্দ্রলাল না হয়ে যাও না।"

—"না, আমি বীরেন্দ্রলাল হ'তে চাই না।"

—"কেন, ফাঁসি যাবার ভয়ে?"

—"আমি যাব ফাঁসি!"

—"তোমার জন্যে ফাঁসির দড়ি তৈরী হয়েই আছে।"

—"বটে! সে দড়ি আমার গলায় পরাবে কে?"

—"আমি।"

—"তুই! তোর প্রাণবায়ু তো একটু পরেই শূন্যে মিলিয়ে যাবে রে!"

—"আমার প্রাণবায়ু যে আজ দেহের ভিতর থেকে বহির্গত হবে না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত আছি।"

—"আচ্ছা, দেখা যাবে।"

—"হ্যাঁ, দেখা যাবে। আমরাও নিরস্ত্র নই।"

—"আমাদের দলে কত লোক আছে জানিস?"

—"জানতে চাই না। ভেড়ারা দলে ভারি হ'লেও বাঘ কোনদিন ভয় পায় না।"

—"ভেড়া? আমরা ভেড়া?"

—"হুঁ। মেড়াকান্ত।"

দরজার বাহির থেকে আর সাড়া এল না।

বিপদের গুরুত্ব যত বাড়ে, জয়ন্তের ভাবভঙ্গি হয় ততই প্রশান্ত। তার মস্তিষ্ক তখন কাজ করে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এবং তার মুখে-চোখে ফুটে ওঠে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন। তখন সে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনেও গিয়ে দাঁড়াতে পারে একান্ত অকুতোভয়ে।

জয়ন্ত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ঘরের চারিদিকে একবার বুলিয়ে নিলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

ঘরের একদিকে একখানা তক্তাপোশ, তার উপরে মাদুর পাতা। এক-দিকে একটা কাঠের আলমারি আর একদিকে একটা লোহার সিন্দুক। জয়ন্ত হেঁট হয়ে একবার তক্তাপোশের তলায় দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে সেই অবস্থায় রইল প্রায় অর্ধ মিনিটকাল। তারপর যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন তার মুখের উপরে ফুটে উঠল নিশ্চিন্ত হাসির রেখা!

এমন সংকটকালেও বন্ধুর হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে মাণিক আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "অসময়ে হাসবার চেষ্টা কেন?"

—"বলছি। আপাততঃ দু'জনে মিলে ঐ লোহার সিন্দুকটা টেনে এনে দরজার গায়ে ঠেলে রাখি এস।"

সিন্দুকটা বেশ ভারি। কিন্তু প্রায় অতুলনীয় বলবান্ ব'লে জয়ন্তের ছিল বিশেষ খ্যাতি। তার সমকক্ষ না হোক্, দৈহিক শক্তিতে মাণিকও ছিল অসামান্য। সুতরাং সিন্দুকটাকে দরজার কাছে টেনে আনবার জন্যে তাদের খুব বেগ পেতে হ'ল না।

মেঝের উপরে ভারি সিন্দুক টানার শব্দ শুনে বাহির থেকে তারাপদ চেঁচিয়ে বললে, "ঘরের ভিতরে ও-সব হচ্ছে কি?"

জয়ন্ত বললে, "বিশেষ কিছুই নয়। লোহার সিন্দুকটা দরজার গায়ে ঠেসিয়ে রাখছি।"

—"বটে, বটে!"

—"হু, হুঁ! খিল ভাঙলেও দরজা খোলা সহজ হবে না। তার উপরে

সিন্দুকের আড়ালে আমরা দু'জনে হুমড়ি খেয়ে ব'সে থাকব দুটো 'অটোমেটিক রিভলভার' নিয়ে। ঘরের ভিতরে তোমরা একে একে প্রবেশ করবে একে একে শমন ভবনে গমন করবার জন্যে। বুঝলে মেড়াকান্ত ?"

কেউ আর উচ্চবাচ্য করলে না।

মিথ্যাকথা বললে জয়ন্ত। তাদের কাছে রিভলভার তো দূরের কথা, একখানা পেন্সিল-কাটা ছুরি পর্যন্ত ছিল না।

তারপর জয়ন্ত তক্তাপোশের তলায় ঢুকে যা বার ক'রে আনল তা হচ্ছে একরাশ ইলেকট্রিক তারের খুব মোটা একটা 'কয়েল' (coil)।

মাণিক বললে, "এ আবার কি ?"

—"দেখতেই তো পাচ্ছ বন্ধু! এ হচ্ছে আমাদের জন্যে ঈশ্বরদত্ত উপহার! আমরা তো সাধু-ঋষিদের আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করি নি, হয়তো এদের কারা কবে কোন ইলেকট্রিক জিনিসের দোকানে অসাধু উদ্দেশ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছিল, এই তারের কুণ্ডলীটি হচ্ছে তারই স্মৃতিচিহ্ন! কিন্তু ও-সব কথা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই, এটি যে যথাসময়ে আমাদের হস্তগত হ'ল, এই কথাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা!"

মাণিক দ্বিধাভরে বললে, "কিন্তু এ জিনিস নিয়ে এখন আমাদের কি উপকার হবে ?"

জয়ন্ত কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে বললে, "মাণিক, দিনে দিনে তুমিও যেন সুন্দরবাবুর মত ভোঁতা হয়ে যাচ্ছ। এই কুণ্ডলীতে যে তার আছে তা এত মজবুত যে অনায়াসে মানুষের ভারবহন করতে পারে। আমি সাবধানতার খাতিরে তিন বা চার গাছা তারকেই একসঙ্গে একগাছা অবলম্বন-রজ্জুর মতন ব্যবহার করতে চাই। তারপর যা করতে হবে, তোমাকে নিশ্চয় বলতে হবে না।"

এই সহজ কথাটা প্রথমে বুঝতে পারে নি ব'লে মাণিক লজ্জিত মুখে স্তব্ধ হয়ে রইল।

ওদিকে দরজার বাইরে শোনা গেল অনেকগুলো লোকের পায়ের

শব্দ। বীরেনের দলবল এসে পড়েছে।

ঘরের অন্য দিকে পাশাপাশি তিনটে জানলা। জয়ন্ত দ্রুতপদে মাঝের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, জানলার পরেই রয়েছে একটা গলি, তারপর একটা মাটকোঠা, তারপর একটা ছোট মাঠ। সেদিকটায় কোন মানুষ আছে ব'লে মনে হ'ল না।

জয়ন্ত ফিরে এসে বললে, "মাণিক, পালাবার পথ খোলা! জানলার একগাছা লোহার গরাদে খুলতে বেশি গায়ের জোর দরকার হবে না। এখন চট্‌পট্ এস দেখি, দু'জনে মিলে কুণ্ডলীর তার নিয়ে অবলম্বন-রজ্জু তৈরি ক'রে ফেলি।"

বাহির থেকে দ্বারে করাঘাত ক'রে তারাপদ বা বীরেন্দ্রলাল আবার বললে, "তোরা খিল খুল্‌বি, না আমরা দরজা ভাঙব?"

কুণ্ডলীর তার খুলতে খুলতে জয়ন্ত বললে, "তোমরাই দরজা ভাঙো। মনে রেখ, দু-দুটো অটোমেটিক রিভলভার তোমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।"

বাহিরে আবার স্তব্ধতা।

জয়ন্ত চুপি চুপি বললে, "মাণিক, ওরা হচ্ছে কাপুরুষ। সহজে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে ভরসা পাবে না। ততক্ষণে আমরা কাজ হাসিল করতে পারব।"

নয়

দ্বিতীয় হত্যা

টেলিফোনের কাছে গিয়ে সুন্দরবাবুকে ডাকতেই তিনি ব'লে উঠলেন, "এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে হে জয়ন্ত? তোমার বাড়িতে গিয়েও দেখা পাইনি, তারপর 'ফোন' ক'রেও সাড়া পাইনি।"

—"খালি আজ কেন সুন্দরবাবু, আর কোনদিনই হয়তো আমাদের

দেখা বা সাড়া পেতেন না। কারণ, এক মায়াবিনী আমাদের ধোঁকা দিয়ে শত্রু-শিবিরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করেছিল। আমাদের পরলোকে পাঠাবারও চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু দৈবক্রমে সে চেষ্টা সফল হয়নি। বিস্তৃত বিবরণ পরে বলব, কিন্তু আপনি এখানে এসেছিলেন কেন?"

—"আজ সকালে তোমাদের ওখান থেকে এসেই আবার এক রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের খবর পেলুম। মামলাটা অবশ্য আমার ঘাড়ে পড়েনি, কিন্তু মুকুন্দবাবুর হত্যার সঙ্গে যেন এ ব্যাপারটার সম্পর্ক আছে ব'লে সন্দেহ হচ্ছে।"

—"সন্দেহের কারণ?"

—"এবার যাকে হত্যা করা হয়েছে, সে হচ্ছে মুকুন্দবাবুর বড় ছেলে সনৎকুমার।"

জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, "মুকুন্দ-বাবুর ছোট ছেলে অশোককুমার কোথায়?"

—"তারা দুই ভাই একসঙ্গে একটা হোটেলে থাকত, কিন্তু সনৎ-কুমারের মৃত্যুর পর অশোকের আর কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না!"

—"এ-সব ব্যাপার নিয়ে ফোনে আলোচনা করার সুবিধা হয় না। আপনি অবিলম্বে আমার এখানে চ'লে আসুন।"

—"যাচ্ছি, এখনি যাচ্ছি!"

—"আর আসবার সময় বীরেনের ডায়েরিখানা আনতে ভুলবেন না।"

—"ডায়েরি, ডায়েরি, ডায়েরি! তোমাকে আচ্ছা ডায়েরি-রোগ পেয়ে বসেছে যা-হোক্! বেশ, ডায়েরিখানা নিয়ে যেতে ভুলব না। হুম্!"

মিনিট-পঁচিশের মধ্যেই সুন্দরবাবুর আবির্ভাব। ঘরে ঢুকেই তিনি ব'লে উঠলেন, "কোন্ মায়াবিনী তোমাদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল হে?"

জয়ন্ত বললে, "আমার কাহিনী খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে। আগে এই নতুন হত্যাকাণ্ডের কথা ভালো ক'রে শুনতে চাই।"

সুন্দরবাবু বললেন, "মুকুন্দবাবু খুনীর হাতে মারা পড়বার পর সনৎ আর অশোক দুই ভাই দক্ষিণ কলকাতার 'সুইট্ হোম' নামে এক

হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। দু'খানা ঘরে ছদ্মনামে তারা বাস করত।"

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু তারাই যে সনৎ আর অশোক, এটা কেমন ক'রে জানা গিয়েছে?"

—"সনতের মৃত্যুর পর ঘটনাস্থলেই তার ডায়েরি পাওয়া যায়। ডায়েরির শেষের দিকে সন্দেহজনক কতকগুলো কথা ছিল, তাও আমি টুকে এনেছি। শোনো।"

পকেট থেকে একখানা কাগজ বার ক'রে সুন্দরবাবু পাঠ করলেন:

'এই ময়ূরের জন্যই বাবাকে সিঙ্গাপুর থেকে পালিয়ে আসতে হয়। এই ময়ূরের জন্যই বাবাকে প্রাণ হারাতে হয়। এই ময়ূর নিয়ে আমরাও এখন অজ্ঞাতবাস করছি। আমাদের অদৃষ্টে কি আছে ভগবান্ ছাড়া আর কেউ জানে না। এই ময়ূরের সার্থকতা কি, মাঝে মাঝে সেই কথা মনে হয়। বাবার আদেশে প্রাণপণে একে রক্ষা করব বটে, কিন্তু এই অভিশপ্ত আর মারাত্মক ময়ূর নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার আর সীমা নেই।"

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "অবশেষে একটা মূল্যবান সূত্র পাওয়া গেল। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এই ময়ূরের লোভেই মুকুন্দবাবুর বাড়িতে হয়েছিল হত্যাকারীর আগমন। মুকুন্দবাবুর হাতের মুঠোয় যে চিঠির টুক্‌রো পাওয়া গিয়েছে, তাতেও ময়ূরের উল্লেখ আছে, এটা আপনি ভোলেন নি বোধ হয়?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার কথায় এখন মনে পড়ছে বটে! কিন্তু ময়ূর নিয়ে এত হানাহানি কেন বাবা? ময়ূরটা মণি-মুক্তা দিয়ে তৈরি নাকি?"

জয়ন্ত বললে, "সনতের ডায়েরির কথাগুলো পড়লে তা মনে হয় না। ময়ূরটার সার্থকতা সে বুঝতে পারেনি। ওটা মণি-মুক্তা দিয়ে তৈরি হ'লে নিশ্চয়ই সে জানতে পারত।"

মাণিক বললে, "বীরেন্দ্র যদি মুকুন্দবাবুর হত্যাকারী হয়, আর ময়ূরের লোভেই সে যদি খুন ক'রে থাকে, তাহ'লে ময়ূরটা যে মহামূল্যবান্ এটা তার নিশ্চয়ই জানা ছিল।"

—"তোমার অনুমান খুবই সঙ্গত। ময়ূরটা তুচ্ছ হ'লে মুকুন্দবাবুকে

সিঙ্গাপুর ত্যাগ ক'রেও প্রাণ হারাতে হ'ত না। সনতকেও অকালে মারা পড়তে হয়েছে ঐ ময়ূরের জন্যই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হত্যাকারী এবারে ময়ূরটা হস্তগত করতে পেরেছে কিনা?"

—"সে কথা জানা যায়নি। তবে হত্যাকাণ্ডের কথা বলছি শোনো। 'সুইট হোম'-এ আরো অনেক লোক বাস করত। কাল রাত আড়াইটের সময় হঠাৎ ভীষণ আর্তনাদ হয়—'খুন! খুন! বাঁচাও! রক্ষা কর!' সেই চিৎকারে সকলের ঘুম ভেঙে যায়। চিৎকারটা আসছিল সনতদের ঘরের ভিতর থেকে। সকলে ছুটে গিয়ে দেখে সনতের ঘরের দরজা বন্ধ, আর ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে বিষম হুটোপুটির শব্দ! তারপরই এক ভয়াবহ চিৎকার, তারপর সব চুপচাপ। সকলে মিলে দরজা ভেঙে

ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখে, মেঝের উপরে প'ড়ে রয়েছে সনতের রক্তাক্ত মৃতদেহ, কিন্তু ঘরের ভিতরে আর কেউ নেই। সেখান থেকে পাশের ঘরে যাবার একটা দরজা ছিল—অশোকের নিজের ঘরে। সে ঘরেও বাইরে বেরুবার জন্য আর একটা দরজা ছিল, আর সেটা ছিল খোলা। ঘরে অশোককে দেখতে না পেয়ে সকলে প্রথমে তাকেই সন্দেহ করে।

কিন্তু তারপর দেখা যায়, সনতের ঘরের একটা জানলার একটা গরাদে খোলা। ঘরের মেঝের রক্তের ওপরেও তিনজন অজ্ঞাত লোকের পায়ের ছাপ আছে, আর সেগুলোর সঙ্গে অশোকের জুতোর মাপ মেলে না। আমি মোটামুটি এইটুকুই জানি, মামলাটা আমার নয়, তাই এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না।”

জয়ন্ত বললে, “আমার বিশ্বাস, হত্যাকারীদের আবির্ভাবের পরেই অশোক সেই ময়ূরটা নিয়ে বাইরে পালিয়ে যেতে পেরেছে।”

সুন্দরবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে কিছুক্ষণ নীরবে ব'সে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, “দেখ জয়ন্ত, এখন আর একটা কথা স্মরণ হচ্ছে! কথাটা আগে আমি ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করিনি।”

—“কথাটা কি?”

—“বীরেনের ডায়েরির এক জায়গায় লেখা আছে : 'ময়ূর-সিংহাসনের ইতিহাস'। কিন্তু বাজে গালগল্প ভেবে তার দিকে আমি দৃষ্টি দিইনি।”

জয়ন্ত বিপুল আগ্রহে ব'লে উঠল, “ডায়েরিখানা এনেছেন তো?”

—“এনেছি। এই নাও।”

ঠিক সেই সময়ে মধু এসে বললে, “পুলিশ থেকে কারা এসে সুন্দর-বাবুকে খুঁজছে।”

জয়ন্ত বললে, “তাঁদের এইখানে নিয়ে এস মধু!”

একটু পরেই দু'জন পুলিশ কর্মচারীর সঙ্গে ছন্নছাড়ার মতন দেখতে একটি যুবক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে।

একজন কর্মচারী বললে, আপনার থানায় গিয়ে শুনলুম, আপনি এখানে এসেছেন।”

সুন্দরবাবু বললেন, “আপনাদের সঙ্গে উনি কে?”

—“এঁর নাম অশোককুমার মুখোপাধ্যায়।”

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, “নিহত মুকুন্দবাবুর ছোট ছেলে?”

—“হ্যাঁ।”

দশ

ময়ূর-সিংহাসনের ইতিহাস

জয়ন্ত কৌতূহলী নেত্রে অশোকের দিকে তাকিয়ে দেখলে। বয়সে সে অতি তরুণ, তার আকার মাঝারি, গড়ন ছিপ্‌ছিপে, রঙ শ্যামল। তার মুখশ্রী সুন্দর, কিন্তু সারা মুখে মাখানো ছিল এমন দারুণ ভয়ার্ত ভাব যে, তার মৌখিক সৌন্দর্যের দিকে মোটেই আকৃষ্ট হয় না দৃষ্টি।

সুন্দরবাবু বললেন, "অশোক, এখন তোমাকেই আমাদের দরকার। কাল রাত্রে তুমি হোটেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"কেন?"

—"ভয়ে। পালিয়ে না গেলে আমিও বাঁচতুম না।"

"আচ্ছা অশোক, তুমি ঐ চেয়ারখানায় বোসো। এখন শোনো। যে রাত্রে তোমার বাবা মারা পড়েন, সেবারেও তোমরা পালিয়ে গিয়েছিলে কেন?"

—"একই কারণে। ভয়ে।"

—"ভুল করেছিলে। পুলিশের আশ্রয় নিলে তোমার দাদার জীবন নষ্ট হ'ত না। যাক্ ও-কথা। এখন সব কথা খুলে আমাদের বল দেখি। তোমার বাবার মৃত্যু-দিন থেকে আরম্ভ কর।"

জয়ন্ত বললে, "অশোকবাবু, তার আগে আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। কোন ময়ূরের কথা আপনি জানেন কি?"

—"জানি। আমরা যখন সিঙ্গাপুরে থাকতুম, ওখানকার কোন পুরানো জিনিসের দোকান থেকে বাবা একটি ময়ূরের মূর্তি কিনে এনেছিলেন। গোটা নয়, আধখানা—কেবল ময়ূরের সামনের দিকটা। সেটা ভাঙা মূর্তি বললেও চলে।"

—"সেটা কি দিয়ে তৈরী ?"

—"আমি তা বলতে পারব না। কিন্তু মূর্তির সেই আধখানাই ছিল অত্যন্ত ভারি—ছয়-সাত সেরের চেয়েও বেশি হ'তে পারে। তার উপরে মাখানো ছিল কি এক জিনিসের কালো প্রলেপ। কেন জানি না, সেই ভাঙা ময়ূরের মূর্তিটাকে বাবা খুব দামী—এমন কি অমূল্য ব'লে মনে করতেন। সিঙ্গাপুরের কোন ভদ্রলোক মূর্তিটা অনেক টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার বাবা বেচতে রাজি হন নি। তারপর বাবার নামে সব বেনামা চিঠি আসতে লাগল। সে-সব চিঠির মর্ম কি জানি না, কিন্তু বাবা অতিশয় ভয় পেয়ে গেলেন। তারপর একরাত্রে বাড়িতে চোরের দল ঢুকে ময়ূরটা চুরি করবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়। বাবা তখন আমাদের দুই ভাইকে নিয়ে সিঙ্গাপুর ছেড়ে কলকাতায় চ'লে আসেন। কিছুদিন নির্বিঘ্নে কেটে যায়। তারপর বাবার মৃত্যুর কয়েক দিন আগে সিঙ্গাপুর থেকে আবার একখানা ভয়-দেখানো চিঠি আসে। বাবা তখন আমাদের ডেকে বললেন, "দেখ, এই ময়ূরটা আর আমার ঘরে রাখা নিরাপদ নয়, এটাকে তোমাদের ঘরেই লুকিয়ে রাখো। যদি আমার কোন বিপদ হয়, ময়ূরটা নিয়ে তখনি তোমরা পালিয়ে যেও। এ হচ্ছে বহুমূল্য ময়ূর, এর প্রসাদে ফকিরও হ'তে পারে আমীর। তারই দুইদিন পরে বাবা মারা পড়েন।"

সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন ক'রে ?"

—"ঠিক বলতে পারব না। বাবার আর্তনাদে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। দাদা তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়েই আবার ফিরে এসে সভয়ে বললেন, "কারা এসে বাবাকে খুন ক'রে সারা ঘর তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছে। ওরা এ ঘরে আসবার আগে শীগ্‌গির পালাই চল, নইলে আমরাও বাঁচব না।' হাতের কাছে যা পেলুম কোনরকমে তাই নিয়ে চুপিচুপি সিঁড়ি দিয়েই নেমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।"

—"আর সেই ময়ূরটা ?"

—"সেটা ছিল দাদার হাতে কাপড় দিয়ে মোড়া।"

—"তারপর ?"

—"তারপর আমরা 'সুইট-হোম'-এ এসে উঠি। ওখানে কয়েকদিন নিরাপদে কেটে যায়। তারপর কাল রাত্রে কারা দাদাকেও আক্রমণ করে। আমি ছিলুম পাশের ঘরে, ময়ূরটাও আমার ঘরেই ছিল। দাদার আর্তনাদ শুনেই আমি প্রাণভয়ে পাগলের মত হয়ে ময়ূরটাকে নিয়ে পালিয়ে আসি।"

—"কোথায় সেই ময়ূর ?"

—"শুনুন। কাল শেষ-রাতটা কোনরকমে কাটিয়ে আজ সারাদিন পথে পথে টো টো ক'রে ঘুরেছি। তারপর ক্ষুধায় আর পরিশ্রমে শরীর যখন নেতিয়ে পড়েছে, তখন হঠাৎ সন্দেহ হ'ল, দু'জন অচেনা লোক আমার পিছু নিয়েছে। আমি যে পথে যাই, তারাও সেই পথ ধরে। আমি আস্তে চললে তারাও আস্তে চলে, আমি তাড়াতাড়ি চললে তারাও চলে তাড়াতাড়ি। আমি যখন কালীঘাটের আদিগঙ্গার ধারে, তারা তখন খুব কাছে এসে পড়েছে। ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। তার-পরই দেখলুম, তাদের সঙ্গে আরো দুজন নতুন লোক এসে যোগ দিয়েছে। আমি আর পারলুম না, যে সাংঘাতিক ময়ূরটার জন্যে এত কাণ্ডকারখানা, সেটাকে রাস্তার উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগলুম, তারপর ছুটতে ছুটতে একেবারে থানায় এসে উঠলুম। আমার মুখে সব কথা শুনে এঁরা আমাকে এখানে এনে হাজির করেছেন। আর কিছু আমি জানি না, আর কিছু বলবার শক্তিও আমার নেই।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্। বাপ হারালে, ভাই হারালে, শেষটা ময়ূরও হারালে বাপু ?"

অশোক বললে, "ময়ূরটাকে ত্যাগ না করলে আমাকে প্রাণ হারাতে হ'ত।"

জয়ন্ত বললে, "আপাততঃ ও-প্রসঙ্গ থাক্। আমি এখন বীরেনের ডায়েরি থেকে ময়ূর-সিংহাসনের ইতিহাস পাঠ করব। আপনারাও শুনুন।"

ডায়েরির কয়েকখানা পাতা উল্টে সে পড়তে লাগল :

"নাদির শা যখন ভারতবর্ষ আক্রমণের জন্যে তোড়জোড় করছিলেন, দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শা তখন তাঁকে ক্ষমা করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে দূত পাঠিয়ে দেন।

উত্তরে নাদির শাহ ব'লে পাঠান, 'ক্ষমা ? আমার কাছে ক্ষমা নেই! আমি হচ্ছি ভগবানের চাবুক। পাপীকে শাস্তি দেবার জন্যে পৃথিবীতে এসেছি আমি!'

তা অধঃপতিত দিল্লী-সাম্রাজ্যকে রীতিমত শাস্তি দেবার জন্যে তিনি চেষ্টা করেছিলেন প্রাণপণেই। দিল্লী কেবল রক্ত-সমুদ্রের মধ্যে মগ্নপ্রায় হ'ল না, যুগে যুগে বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান, ঔরংজেব প্রভৃতি পৃথিবী-বিখ্যাত সম্রাটরা যে কুবের-বাঞ্ছিত বিপুল সম্পত্তি পুঞ্জীভূত ক'রে রেখেছিলেন, তার অধিকাংশই হ'ল পার্সী দস্যুর কবলগত। যাকে বলে একেবারে ধনে-প্রাণে মারা যাওয়া!

ঐতিহাসিকদের হিসাবে জানা যায়, নাদির শাহ ভারতবর্ষ থেকে লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন নগদ পনেরো ক্রোর টাকা এবং পঞ্চাশ ক্রোর টাকা মূল্যের জড়োয়ার জিনিস, দামী সাজ-পোশাক ও আসবাব প্রভৃতি।

তারই মধ্যে ছিল সম্রাট সাজাহানের সেই দু'টি বিশ্ববিখ্যাত ঐশ্বর্য কোহিনূর এবং ময়ূর-সিংহাসন।

ময়ূর-সিংহাসনের ময়ূরটি ছিল অতুলনীয় রত্নরাজির দ্বারা খচিত। সে-সব রত্নের মূল্য যে কত, তার সঠিক হিসাব বোধ হয় নেই। সে হচ্ছে ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দের কথা।

তারপর ১৭৪৭ খ্রীস্টাব্দে নাদির যখন তাঁর শিবির-প্রাসাদে বাস করছিলেন, তখন পারস্যের 'লাল-মাথা'-নামে খ্যাত সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে হত্যা করে। তারই ফলে নাদিরের আফগান সেনাপতি আহম্মদ শা আবদালির সৈন্যদের সঙ্গে 'লাল-মাথা'দের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

সেই গোলমালের সময়ে দুই দলই মৃত নাদিরের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করে—কতক যায় 'লাল-মাথা'দের হাতে এবং কতক হয় আফগানীদের হস্তগত। কোহিনূর হীরকটি যে আহম্মদ শা আবদালি পেয়েছিলেন, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কিন্তু ময়ূর-সিংহাসন সম্বন্ধে কেবল এই-টুকুই জানা যায় যে, লুণ্ঠনকারীদের পাল্লায় প'ড়ে ললিতকলার অমন দুর্লভ জিনিসটি একেবারে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল এবং এক-এক ব্যক্তি নিয়ে গিয়েছিল তার এক-এক অংশ।

জাভিদ খাঁ নামে একজন আফগান সেনানী সিংহাসন থেকে ময়ূরের দেহের উপরার্ধ বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিলেন এবং সেই অংশ নিয়ে তিনি আবদালির সঙ্গে কান্দাহারে গিয়ে উপস্থিত হন। ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে আবদালি যখন লাহোর অধিকার করেন, জাভিদ খাঁও তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। লাহোর থেকে আবদালি দিল্লীর দিকে যাত্রা করেন। তারপর মানপুরের যুদ্ধে তিনি মোগলদের কাছে পরাজিত হন এবং সেই যুদ্ধে জাভিদ খাঁ মারা পড়েন। বিজয়ী মোগল-পক্ষে অনেক রাজপুত সৈন্যও ছিল, পরাজিত আফগানদের শিবির-লুণ্ঠনের সময়ে জাভিদের ময়ূর তাদেরই একজনের হাতে পড়ে। সে ঐ ময়ূরের মর্যাদা বুঝতে না পেরে সামান্য টাকার বিনিময়ে বিক্রি ক'রে ফেলে। তারপর গত দুই শত বৎসর ধ'রে ময়ূরটি নানা হাতে ফিরে অবশেষে এমন একজন বুদ্ধিমান লোকের কাছে এসে পড়েছে, যার কাছে তার গুপ্তকথা অজানা নেই।

এই ময়ূর আমার চাই—ছলে বলে কৌশলে যেমন ক'রেই হোক্। এই রত্নখচিত ময়ূরটি কেবল অমূল্য ও অতুল্য নয়, জগদ্বিখ্যাত বাদশাহ সাজাহানের ময়ূর-হিংহাসনের প্রধান অংশ ব'লেও এর একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে এবং সে মর্যাদা রক্ষার জন্যে আধুনিক আমেরিকার খেয়ালী ধনকুবেররা কল্পনাতীত অর্থব্যয় করতে একটুও কুণ্ঠিত হবেন না। ময়ূরটি পেলেই আমি আমেরিকায় যাত্রা করব এবং তারপর? তার পরের রঙিন স্বপ্ন এখনি দেখবার চেষ্টা করব না—আগে তো ময়ূরটি হস্তগত করি।"

জয়ন্তের পাঠ শেষ হ'ল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সুন্দরবাবু বললেন, "মুকুন্দবাবুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যে বীরেন্দ্রলাল জড়িত আছে, এই ডায়েরিই হচ্ছে তার মস্ত প্রমাণ।"

জয়ন্ত ভর্ৎসনার স্বরে বললে, "আর এমন মস্ত প্রমাণও এতদিন আপনি কাজে লাগাতে পারেন নি।"

সুন্দরবাবু স্তব্ধ হয়ে রইলেন লজ্জিত মুখে।

অশোক বললে, "আমি কিন্তু ময়ূরের গায়ে কোন রত্নেরই চিহ্ন দেখি-নি। হয়তো এক সময়ে ওর উপরে মণি-মুক্তা বসানো ছিল, কিন্তু পরে সে সমস্তই খুলে নেওয়া হয়েছে।"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "নিশ্চয়ই ময়ূরটি এখনো মহামূল্যবান। নইলে বীরেনের মতন চতুর লোক তাকে হস্তগত করবার জন্যে এমন হত্যার পর হত্যা করত না! শেষ পর্যন্ত সেই-ই যে ময়ূরের অধিকারী হয়েছে তাতেও আর কোন সন্দেহ নেই।"

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, "কিন্তু বীরেন এখন কোথায়?"

জয়ন্ত বললে, "সে এখন আমেরিকায় পিটটান দেবার জন্যে আয়োজন করছে।"

—"কিন্তু কোথায় ব'সে আয়োজন করছে? আজ যেখানে গিয়ে তোমরা বিপদে পড়েছিলে, সেখানে গিয়ে একবার সন্ধান নিয়ে আসব নাকি?"

—"পাগল। গিয়ে দেখবেন পাখি নেই, খাঁচা খালি।"

—"হুম্। তাহ'লে তো দেখছি আমরা যে অতলে ছিলুম, সেই অতলেই আছি।"

জয়ন্ত হেসে উঠে বললে, "একেবারে হাল ছাড়বেন না সুন্দরবাবু। বীরেনের ফোটোখানা আপনার কাছে আছে তো?"

—"আছে বৈকি!"

—"তাহ'লে বীরেন তো আছে আপনার হাতের মুঠোর মধ্যেই!"

—"ঠাট্টা করা হচ্ছে? ছবি আর মানুষ এক?"

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "না সুন্দরবাবু, ঠাট্টা-তামাশা নয়। এখনি থানায় ফোন্ ক'রে সেপাইদের আসতে বলুন। আমি আপনাদের বীরেনের কাছে নিয়ে যাব—সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করব ময়ূর-সিংহাসনের ময়ূরও।"

এগারো

নোটে গাছটি মুড়ুলো

জয়ন্ত নিজে গাড়িতে উঠে চালকের আসনে চাকা ধ'রে বসল।

গাড়ি খানিক দূর অগ্রসর হবার পর সুন্দরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা জয়ন্ত, বীরেনের ঠিকানা তুমি কোথা থেকে পেলে?"

—"শুনলে আপনি অবাক হবেন।"

—"কেন?"

—"কারণ বীরেনের ঠিকানা জানতে পেরেছি আপনার কাছ থেকেই।"

—"ধেৎ, বাজে ধাপ্পা দিও না। বীরেনের ঠিকানা আমি জানি না।"

—"বেশ, তবে মুখে চাবি দিয়ে ব'সে থাকুন।"

একটু পরেই সুন্দরবাবু আবার মুখের চাবি না খুলে পারলেন না। বললেন, "তুমি আমাদের এখন বীরেনের বাসাতেই নিয়ে যাচ্ছ তো?"

—"আপাততঃ আমরা যাচ্ছি চব্বিশ নম্বর শ্রীমন্ত পাল স্ট্রীটে।"

—"সে তো ললিতা দেবীর বাড়ি।"

—"আগে ললিতা দেবীকেই আমাদের দরকার।"

—"তিনি কি বীরেনকে চেনেন?"

—"আমার তো তাই মনে হয়।"

—"তিনিও কি বীরেনের দলভুক্ত?"

—"শিশুর মত আপনার এত কৌতূহল কেন সুন্দরবাবু?"

আবার সুন্দরবাবুর মুখ বন্ধ। আরো মিনিট কয় পরেই গাড়ি এসে

থামল যথাস্থানে।

জয়ন্ত নেমে প'ড়ে সুন্দরবাবুর সহকারী পুলিশ-কর্মচারীকে ডেকে বললে, "বাড়ির চারিদিকেই যেন কড়া পাহারার ব্যবস্থা থাকে। মাণিক, তুমি দরজার কড়া নাড়ো।"

রাত তখন এগারোটা। বাড়ির ঘরে ঘরে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো।

কড়া নাড়ার শব্দ শুনে একজন লোক এসে দরজা খুলে দিয়ে বললে, "কাকে চাই?"

জয়ন্ত বললে, "ললিতা দেবীকে।"

—"এত রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া অসম্ভব।"

—"সবই সম্ভব বাপু, সবই সম্ভব। সুন্দরবাবু, একে পাহারাওয়ালার জিম্মায় দিন।"

একজন পাহারাওয়ালা এসে লোকটাকে টেনে নিয়ে গেল।

—"সুন্দরবাবু, আগে আগে চলুন। ললিতা দেবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিন।"

দোতালায় উঠেই দেখা গেল, একটা ঘরের দরজার কাছে একটি সুন্দরী মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন।

সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত, ইনিই হচ্ছেন ললিতা দেবী।"

তীক্ষ্ণ চোখে মহিলার মুখের পানে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, "নমস্কার ললিতা দেবী!"

—"নমস্কার। এত রাতে আপনারা আমার বাড়িতে কেন?"

—"গুটিকয় জিজ্ঞাসা আছে।"

—"বেশ, ঘরের ভিতরে এসে বসুন।"

ঘরের ভিতরে গিয়ে সকলে এক-একখানা আসন অধিকার করলে। ললিতা দেবী দাঁড়িয়েই রইলেন।

জয়ন্ত বললে, "ললিতা দেবী, বীরেন্দ্রলাল ব'লে কোন লোককে আপনি চেনেন কি?"

—"না।"

—"সুন্দরবাবু, সেই ফোটোখানা আমায় দিন তো! ……ললিতা দেবী, এই লোকটিকে আপনি কখনো দেখেছেন কি?"

—"না।"

—"বেশ ভালো ক'রে দেখুন। এর আর এক নাম হচ্ছে তারাপদ।"

—"আমি একে জীবনে দেখিনি।"

—"তাই তো, বড়ই দুঃখের কথা, বড়ই দুঃখের কথা! আচ্ছা ললিতা দেবী, ফোটোতে দেখা যাচ্ছে, লোকটির ডান গালের উপরে একটি বড় আঁচিল আছে। এ-রকম আঁচিল কখনো দেখেছেন কি?"

ললিতা দেবী অপ্রসন্ন মুখে বললেন, "আপনারা কি আমাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যে এখানে এসেছেন? তাহ'লে আমি চললুম।"

একলাফে প্রস্থানোদ্যত ললিতা দেবীর সামনে গিয়ে পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত বললে, "কোথা যান? দাঁড়ান! আরে, আবার কাপড়ের ভিতরে হাত দেয় যে!"

সে বজ্র-মুষ্টিতে ললিতার দুখানা হাতই চেপে ধ'রে কঠোর স্বরে বললে, "কাপড়ের ভিতরে কি লুকানো আছে? রিভলভার? সুন্দরবাবু, এর কাপড়ের ভিতরে হাত চালিয়ে দেখুন তো! ইতস্ততঃ করছেন কেন? আরে,

মশাই, এ স্ত্রীলোক নয়, পুরুষ। আমি ওর পা দেখেই বুঝতে পেরেছি। চেয়ে দেখুন, ওর দুই পায়ের প্রত্যেক আঙুলেই পুরুষের মত বড় বড় কড়া। ওর ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যম অঙুলির ডগার দিকেও তাকিয়ে দেখুন। ক্রমাগত সিগারেট টেনে ওর আঙুলের ডগা দুটো 'নিকোটিনে'র মহিমায় হল্‌দে হয়ে গিয়েছে। এর নাম ললিতা নয়, বীরেন্দ্রলাল।"

"হুম্!" বলে চিৎকার ক'রে সুন্দরবাবু সহসা-জাগ্রত ব্যাঘ্রের মত বীরেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তার কাপড়ের ভিতর থেকে সত্য-সত্যই পাওয়া গেল একটা রিভলভার। তখনি তার হাতে পরিয়ে দেওয়া হ'ল হাতকড়া।

সুন্দরবাবু মহানন্দে প্রায় নাচতে নাচতে বললেন:

"বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান,
এবারে বধিব ঘুঘু, তোমার পরাণ!"

জয়ন্ত বললে, "গোড়া থেকেই ললিতার উপরে আমার সন্দেহ হয়েছিল। ঝড়ুর মত ধাঙড়ের সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক? ঝড়ু আমার বাড়িতে কামাই করলেও তার বাসায় যায়, অনেকক্ষণ থাকে। এটা অস্বাভাবিক। তারপর সুন্দরবাবুর মুখে শুনলুম, ললিতার ডান গালে একটা বড় কালো আঁচিল আছে। তারপর সুন্দরবাবুর কাছেই বীরেনের ফোটো দেখলুম, তারও ডান গালে আছে একটা বড় আঁচিল। আমার সন্দেহ বেড়ে উঠল দস্তুরমত। কিন্তু এখন একেবারে সন্দেহভঞ্জন হয়ে গেল।"

সুন্দরবাবু তারিফ ক'রে বললেন, "হুম্, হুম্, হুম্! একেই বলে বুদ্ধির খেল্। ভেল্‌কি বলাও চলে।"

এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে এগিয়ে গিয়ে 'ড্রেসিং টেবিলের' উপর থেকে একটা 'ভ্যানিটি ব্যাগ' তুলে নিয়ে জয়ন্ত বললে, "নিশ্চয়ই এই 'ভ্যানিটি ব্যাগে'র মালিক তথাকথিত ললিতা দেবী? আরে একি দেখি 'ভ্যানিটি-ব্যাগে'র ভিতরে! এ যে মৃত মুকুন্দবাবুর হাতের মুঠোয় পাওয়া সেই ছেঁড়া চিঠির বৃহত্তর অংশটা! চিঠির ছোট অংশটা আমার কাছেই আছে।"

দুটো অংশ পাশাপাশি রেখে পুরো পত্রের মর্ম হ'ল এই :
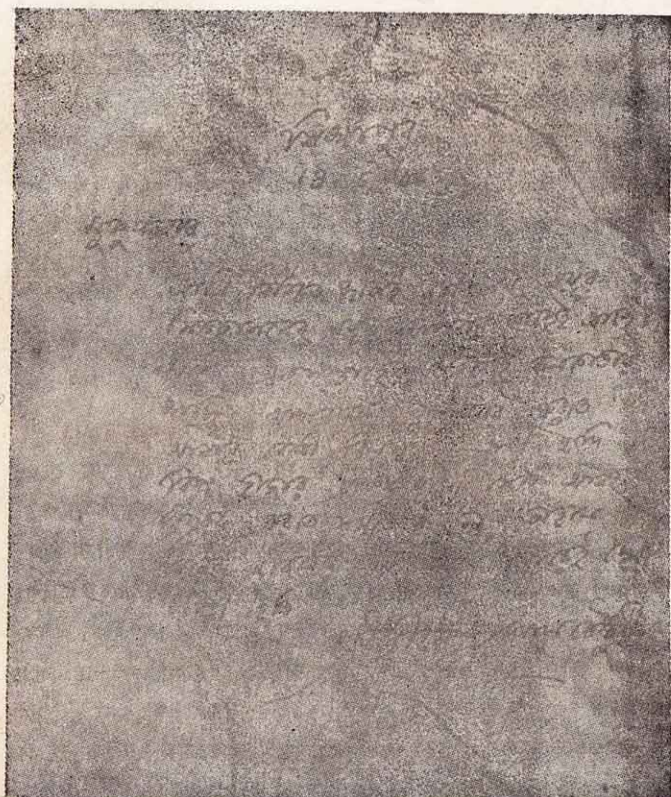
জয়ন্ত বললে, "বীরেন, তোমার বিরুদ্ধে এই সবচেয়ে বড় প্রমাণটা তুমি ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিলে, কিন্তু তোমার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। এখন এই পত্রের মধ্যেই আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড!"

দুই চক্ষে অগ্নিবৃষ্টি ক'রে বীরেন বললে, "প্রথম থেকেই বুঝেছি

তুমিই আমার প্রধান শত্রু! তাই বার বার তোমাকে পথ থেকে সরাবার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু বিধি বাম, উপায় কি?"

মাণিক বললে, "বাহবা কি বাহবা! বীরেনের কণ্ঠসাধনা ধন্য! এতক্ষণ দিব্যি মেয়ে-গলায় কথা কইছিল, কিন্তু এখন ওর মুখে শুনছি পুরুষের কণ্ঠস্বর!"

সুন্দরবাবু বললেন, "কিন্তু ময়ূর-সিংহাসনের ময়ূরটা কোথায়? ডানা মেলে উড়ে পালায় নি তো?"

জয়ন্ত বললে, "উড়ে পালাবার সময় পায় নি। খানাতল্লাস করলেই বেরিয়ে পড়বে!"

জয়ন্তের কথাই সত্য। ময়ূরের ভগ্নদেহটা তল্লাস ক'রে পাওয়া গেল। ঘোর কালো রঙের আধখানা ময়ূর।

জয়ন্ত সাগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পকেট থেকে একখানা ছুরি বার ক'রে ময়ূরের দেহের একটা জায়গা সন্তর্পণে ধীরে ধীরে চাঁচ্‌তে লাগল। কালো প্রলেপটা বিশেষ কঠিন নয়। ইঞ্চিখানেক প্রলেপ সরিয়েই দেখা গেল, দামী দামী পাথর-বসানো অপূর্ব ও বিচিত্র জড়োয়ার কাজ!

সকলেই চমৎকৃত!

জয়ন্ত বললে, "কৌতূহলী লুব্ধ দৃষ্টি থেকে নিরাপদে রাখবার জন্যে কবে কে যে ময়ূরটির উপরে কালো প্রলেপ ব্যবহার করেছে, তা আর জানবার উপায় নেই। কিন্তু অশোকবাবু, আপনি ভাগ্যবান্! বাদশাহ সাজাহানের এই ময়ূরটি সত্যসত্যই অতুল্য আর অমূল্য!"

●

মৃত্যু মল্লার

প্রথম

পৈশাচিক কাণ্ড

সকালবেলা। জান্‌লা-পথ দিয়ে ঘরের মেঝের উপরে এসে পড়েছে কাঁচা রোদের দুটি সোনার রেখা।

প্রতি দিনের মতন সেদিনও মাণিক খুব মন দিয়ে পড়ছিল খবরের কাগজখানা। সকালবেলার খবরের কাগজ পড়বার ভার থাকে মাণিকের উপরেই। উল্লেখযোগ্য কোন খবর থাকলেই সে জয়ন্তকে শোনাবার জন্যে পাঠ করত উচ্চ-কণ্ঠে।

জয়ন্ত টেবিলের সামনে চুপ ক'রে ব'সে ছিল। মধু এসে তাকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বার ক'রে পড়তে পড়তে জয়ন্ত হঠাৎ ক্রুদ্ধ-স্বরে চিৎকার ক'রে উঠল।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে মাণিক সবিস্ময়ে বললে, "কি হ'ল গো বন্ধু? অকস্মাৎ সক্রোধে গর্জন কেন?"

জয়ন্ত চিঠিখানা কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে বললে, "দেশে উচ্চ-শ্রেণীর অপরাধীর অভাব হয়েছে একথা মানি বটে, কিন্তু তা ব'লে আমার এমন অধঃপতন হয়নি, ভালো মামলার অভাবে টাকার লোভে হারানো কুকুরের উদ্দেশে ছুটোছুটি করব!"

মাণিক সবিস্ময়ে বললে, "তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না জয়। হারানো কুকুর আবার কি?"

—"এক সুবর্ণগর্দভের—অর্থাৎ মস্ত ধনীর একটা আদরের কুকুর পথে হারিয়ে গিয়েছে। থানায় খবর দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, যে এই সারমেয়-অবতারটিকে পুনর্বার আবিষ্কার করতে পারবে, তাকে পাঁচ

হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সুন্দরবাবু চিঠি লিখে আমাকে এই মামলার ভার গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি এই অমূল্য উপদেশটিও দিয়েছেন যে, আপাততআমাদের হাতে যখন ভালো মামলা নেই তখন এই সুযোগটি যেন আমরা ত্যাগ না করি, সুন্দরবাবুর যতই বয়স হচ্ছে তাঁর বুদ্ধি যেন ততই ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। তিনি কি জানেন না, ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের অর্থের অভাব নেই, গোয়েন্দাগিরি করি আমরা নিতান্ত সখের খাতিরেই, অর্থের লোভে কোন দিনই আমরা কোন সারমেয়-অবতারের পশ্চাতে ধাবমান হ'ব না।"

মাণিক খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠে বললে, "সুন্দরবাবু ঠিক সুন্দর-বাবুর মতই কথা বলেছেন, ও নিয়ে তোমার মাথা গরম করবার দরকার নেই। ও-কথা ভুলে চুপ্ করে ঐ চেয়ারের উপরে গিয়ে বোসো।

আজকের কাগজে একটি শোনবার মতন খবর আছে। আমি পড়ি, তুমি শোনো।"

জয়ন্ত একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে প'ড়ে খুশি হয়ে বললে, "তাই নাকি, তাই নাকি? তাহলে সুবর্ণগর্দভ আর তার পলাতক কুকুরের কথা চুলোয় যাক্, আমি একান্ত মনে তোমারই পাঠ শ্রবণ করব।"

মাণিক খবরের কাগজখানা চোখের সামনে তুলে ধ'রে পড়তে লাগল:

"ভীষণ ঘটনা! অলৌকিক কাণ্ড!"

বাংলাদেশের সীমারেখায় যেখানে সাঁওতাল পরগণা আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানে মদনপুর নামে একখানা বড় গ্রাম বা ছোট শহর আছে। সম্প্রতি সেখানে এমন-সব রোমাঞ্চকর ও রহস্যময় ঘটনা ঘটিতেছে যাহার কোনো হদিস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রথম ঘটনাটি ঘটিয়াছে দিন-পঁচিশ আগে।

বুদ্ধু এক গরিব গৃহস্থ। সে স্থানীয় এক কারখানায় কাজ করিত। তাহার অভ্যাস ছিল গ্রীষ্মকালের রাত্রে খোলা হাওয়ার উঠানে খাটিয়া পাতিয়া শয়ন করা। ঘটনার দিনেও সে বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করিয়া, রাত্রের আহারের পর অভ্যাসমত উঠানে গিয়া শয়ন করিয়াছিল।

হঠাৎ মধ্য-রাত্রে বিষম এক শব্দ শুনিয়া বাড়ির অন্যান্য লোকজনদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। তারপরই শোনা যায় বুদ্ধুর বিকট আর্তনাদ ও একটা প্রচণ্ড ঝটাপটির শব্দ।

সকলে বাহিরে উঠানের উপরে ছুটিয়া আসে। কিন্তু সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি, কাজেই কেহ বিশেষ কিছুই দেখিতে পায় নাই। কেবল সকলে শুনিতে পাইয়াছিল একটা বন্য ও হিংস্র পশুর মত কণ্ঠে অবরুদ্ধ গর্জন!

সকলে যখন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তখন বুদ্ধুর এক ভাই তাড়াতাড়ি একটি লণ্ঠনের আলো জ্বালাইয়া উঠানের উপরে ছুটিয়া আসে।

কিন্তু তখন ঝটাপটির শব্দ এবং সেই বন্য গর্জন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

লণ্ঠনের আলোকে কেবল দেখা গেল যে বুদ্ধুর মুণ্ডহীন দেহ মাটির উপরে পড়িয়া রহিয়াছে। এবং সেখানে বাহিরের অন্য কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নাই।

অনেক অন্বেষণ করিয়াও বাড়ির ভিতরে বা বাহিরে বুদ্ধুর ছিন্ন মুণ্ড আর পাওয়া যায় নাই।

এটা ব্যাঘ্র বা অন্য-কোন বন্য পশুর অপকীর্তি বলিয়া মনে করিবার উপায় নাই। কারণ প্রথমত, হত্যাকারী বাড়ির সদর দরজা গায়ের জোরে ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল—সাধারণত ব্যাঘ্র বা অন্য কোন বন্য পশু যাহা করে না।

দ্বিতীয়, বুদ্ধুর রক্তে সিক্ত মাটির উপরে পাওয়া গিয়াছে মানুষের হস্তের ছাপ ও পদচিহ্ন!

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটিয়াছে ঐ গ্রামেরই কোন মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়িতে। বাড়িখানি দ্বিতল। বাড়ির মালিক ছিলেন উপরতলায় নিজেরই শয়ন-কক্ষে। সেও ছিল কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি এবং ঘরের আলোক ছিল নির্বাপিত।

ভয়াবহ আর্ত ধ্বনিতে মালিকের স্ত্রী জাগিয়া উঠিয়া ত্রস্তকণ্ঠে শুনিতে পান, ঘরের মেঝের উপরে কারা যেন ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছে। সেই সঙ্গে আরও শোনা যায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে হিংস্র গর্জন!

মালিকের স্ত্রী স্বামীকে জাগাইবার জন্য তাঁহার পার্শ্বে শয্যায় হাত দিয়া দেখেন, তাঁহার স্বামী বিছানার উপরে নাই! তখন তিনিও ব্যাকুল স্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠেন এবং বাড়ির অন্যান্য লোকজনরাও ছুটিয়া আসিয়া বাহির হইতে দরজায় করাঘাত করিতে থাকে।

তারপরেই দেখা যায়, অপচ্ছায়ার মত একটা মনুষ্য-মূর্তি ঘরের জানলার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎগতিতে বাহিরে গিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

দ্বিতীয় ঘটনা-ক্ষেত্রেও পাওয়া গিয়াছে কেবল মালিকের মুণ্ডহীন দেহ এবং রক্তধারার মধ্যে মানুষের হস্ত ও পদের চিহ্ন!

ঘরের প্রত্যেক জানলায় ছিল লোহার গরাদে। কিন্তু একটা জানলার

দুইটি লোহার গরাদে বাহির হইতে কে বা কাহারা একেবারে দুমড়াইয়া খুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। সেই গরাদে-দু'টিকে পরে বাড়ির বাহিরে রাস্তার উপরে পাওয়া যায়। ব্যাপার দেখিয়া পুলিশের লোকেরা পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছে, কারণ এইভাবে দুই-দুইটি লোহার গরাদে উৎপাটন করা যে সে শক্তির কাজ নয়।

তৃতীয় ঘটনা ঘটিয়াছে আরো পাঁচ-ছয় দিন পরে। সুখাই এক মনিহারী দোকানের মালিক। রাত্রে দোকান বন্ধ করিয়া সে ভিতরেই শয়ন করিত।

একদিন সকালে দেখা যায়, সুখাইয়ের দোকান খোলা পড়িয়া রহিয়াছে, দোকান-ঘরের মেঝের উপর দিয়া রক্তের স্রোত বহিতেছে এবং সুখাইয়ের কোনই খোঁজ নাই।

এখানেও চাপরক্তের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে হাতের ও পায়ের ছাপ। পুলিশ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছে, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ঘটনাক্ষেত্রে প্রাপ্ত হাতের ও পায়ের চিহ্নগুলো একই ব্যক্তির।

প্রথম দুই ঘটনাক্ষেত্রে হত্যাকারী কেবল ছিন্নমুণ্ড লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু তৃতীয়বারে সে লইয়া গিয়াছে একটা গোটা মানুষকেই!

মদনপুর এবং তার আশেপাশের গ্রামগুলির মধ্যে ভীষণ বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছে। এই তিন-তিনটি নরহত্যার অর্থ কি? হত্যাকারী কোথাও মূল্যবান কোন দ্রব্য স্পর্শ করে নাই এবং নিহত কোন ব্যক্তিই ধনবান নয়। পুলিশ তদন্তে হত ব্যক্তিদের কোন শত্রুরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে সে কেন হত্যা করে, এবং হত্যার পর কেনই বা মৃতের ছিন্ন মুণ্ড বা দেহ লইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়?

তদন্তে আর একটি আশ্চর্য তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। মুণ্ডহীন মৃত-দেহ দুটোর কণ্ঠদেশে অস্ত্রাঘাতের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নাই—পাওয়া গিয়াছে কেবল ধারালো দাঁতের দাগ। দেখিলেই বোঝা যায়, কোন হিংস্র জন্তু তীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা মুণ্ড দুটিকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে! এটাও এক অদ্ভুত রহস্য। ঘটনাস্থলে পাওয়া যায় কেবল

মানুষের হস্ত-পদের চিহ্ন, কিন্তু মানুষ কি কখনো অস্ত্রের সাহায্য না লইয়া এমনভাবে মুণ্ডকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে? এও যদি মানা যায় তাহা হইলেও বলিতে হয়, এ-ভাবে দেহকে মুণ্ডহীন করিতে গেলে মানুষের পক্ষে দরকার হয় যথেষ্ট সময়। কিন্তু প্রথম দুই ঘটনা-ক্ষেত্রে হত্যাকারী সে সময় পায় নাই। পুলিশ তদন্ত করিয়া জানিয়াছে, দুইবারই হত্যাকারী আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইয়াছে মাত্র মিনিট তিন-চারের মধ্যে।

হত্যাকারী যে দানবের মতন মহা বলবান, সে-বিষয়েও সন্দেহ নাই। গায়ের জোরে সে সদর দরজা ভাঙিয়াছে, দুটো মোটা লোহার গরাদে দুমড়াইয়া খুলিয়া ফেলিয়াছে।

কে এই ভয়াবহ হত্যাকারী? স্থানীয় বাসিন্দাদের দৃঢ়বিশ্বাস, হত্যা-কারী মানুষ নয় এবং ঘটনাগুলো হইতেছে ভৌতিক ব্যাপার। কারুর কারুর মতে, মদনপুরে পিশাচের আবির্ভাব হইয়াছে, কারণ পিশাচরাই নররক্ত শোষণ করিতে ভালোবাসে।

স্থানীয় লোকেরা এত ভয় পাইয়াছে যে, সন্ধ্যার পর কেউ আর বাড়ির বাহিরে পা বাড়াইতে ভরসা করে না। বাড়ির ভিতরে থাকিয়াও নিরাপদ হইবার উপায় নাই, কারণ এই হিংস্র হত্যাকারী দ্বার বা জানলার বাধাও মানে না। প্রত্যেক বাড়ির লোকজনরা তাই একসঙ্গে এক ঘরে বসিয়া প্রায় জাগিয়া জাগিয়াই সারা রাত কাটাইয়া দিতেছে। মদনপুরের জনহীন-পথঘাট নিদ্রিত হইলেও রাত্রে গৃহস্থরা হইয়া থাকে অতি-জাগ্রত।"

মাণিকের পাঠ সাঙ্গ হ'ল। জয়ন্ত চুপ করে ব'সে রইল খানিকক্ষণ। তারপর মৃদুস্বরে কেবল বললে, "আশ্চর্য ব্যাপার বটে!"

মাণিক বললে, "কেবল আশ্চর্য কেন, অলৌকিক ব্যাপারও বলতে পারো।"

—"না। পৃথিবীতে যা ঘটে তাকে আমি অলৌকিক বা অপার্থিব ব্যাপার বলে মনে করি না। ঐ ঘটনাগুলো শুনলে মনের ভিতরে

অনেকগুলো প্রশ্ন জাগে। কিন্তু আমার বিশ্বাস উচিতমত তদন্ত করলে প্রত্যেক প্রশ্নেরই স্বাভাবিক আর সঙ্গত উত্তর পাওয়া যেতে পারে।"

—"পুলিশ কিন্তু তদন্ত করেও সদুত্তর দিতে পারেনি।"

—"পুলিশকে তুমি কি চেনোনা মাণিক? তার উপরে এক্ষেত্রে আবার তদন্ত করছে মফঃস্বলের পুলিশ!"

—"আমার কিন্তু এখনি মদনপুরে ছুটে যেতে ইচ্ছা করছে।"

—"আমারও। কিন্তু কেমন ক'রে যাব? রহস্য ভেদ করবার জন্যে কেউ তো আমাদের আহ্বান করে নি।"

—"নাই-বা করলে! আমরা তো অনায়াসেই মদনপুরে বেড়াতে যেতে পারি?"

..."হুঁ, তা পারি বটে! তা'হলে যাবার চেষ্টা করব নাকি?"

ঠিক এই সময়ে সুন্দরবাবুর প্রবেশ।

মাণিক বললে, "সুন্দরবাবু, দিন-কয়েকের জন্যে ছুটি নিয়ে আমাদের সঙ্গে মদনপুরে বেড়াতে যাবেন?"

—"হুম্, রাখো তোমার মদনপুর! এদিকে আমার প্রাণ যায়! ঝুন্ঝুন্ওয়ালা মাড়োয়ারী ক্রমাগত 'ফোন্' ক'রে আমাকে আর হাঁপ ছাড়তে দিচ্ছে না।"

—"ঝুন্ঝুন্ওয়ালা?"

—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ঐ যার একটা কুকুর হারিয়েছে। কুকুরের শোকে মানুষ যে এমন ক্ষেপে যায় তা আমি জানতুম না। জয়ন্ত, তুমি আমার চিঠি পেয়েছ তো?"

—"চুলোয় যাক্ আপনার চিঠি, ঝুন্ঝুন্ওয়ালা মাড়োয়ারী আর তার পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার! ও-ব্যাপারে আমি নেই। তার চেয়ে ব'সে পড়ুন! এই খবরের কাগজখানা পড়ুন।"

খবরের কাগজখানা পড়তে পড়তে সুন্দরবাবুর দুই চক্ষু ক্রমেই ছানাবড়ার মতন হয়ে উঠল। পড়া শেষ হ'লে পর ঘাড় নেড়ে তিনি বললেন, "ঠিক, ঠিক। আমারও সেই বিশ্বাস।"

—"অর্থাৎ ?"

—"মদনপুরে পিশাচের আবির্ভাব হয়েছে। এ-সব পৈশাচিক কাণ্ড।"

—"এই পিশাচকে বন্দী করতে চান ?"

—"পাগল ! তুমি কি বলতে চাও জয়ন্ত, আমার এই কাঁচা মাথাটা আমি যেচে গিয়ে পিশাচের হাতে উপহার দান করব ?"

—"আমরা আছি, আপনার ভয় কি ?"

—"হুম্, ভরসাই বা কি বাবা ? পিশাচ কি তোমাদেরও মাথার দিকে দৃষ্টিপাত করবে না ?"

—"দৃষ্টিপাত করবার আগেই তার হাতে-পায়ে পড়বে বেড়ী। বাজে কথা রাখুন সুন্দরবাবু, ছুটি নিয়ে চলুন মদনপুরের দিকে। আমরা আপনাকে ছাড়ব না !"

দ্বিতীয়

খুন এবং চুরি

মদনপুরের জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। সুতরাং গ্রাম না বলে একে একটি ছোট শহর বলা যেতে পারে। এর মধ্যে ছোট এবং বড় বাড়ির সংখ্যাও কম নয়। খান-চারেক প্রকাণ্ড অট্টালিকাও আছে। সব-চেয়ে বড় অট্টালিকাখানি হচ্ছে স্থানীয় জমিদারদের। জমিদাররা জাতে বাঙ্গালী নন্ বটে, কিন্তু তাঁদের সাজগোজ, কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহার সবই খাঁটি বাঙালীর মতই। জমিদার-বাড়ির যিনি কর্তা তাঁর নাম প্রতাপ-নারায়ণ সিংহ। গেল বছর সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

মদনপুরের পূর্ব দিকে আছে একটি প্রান্তর—এত বড় প্রান্তর যে, দেখলে মনে হয় তার বিস্তার দিকচক্রবালরেখা পর্যন্ত। তারই পূর্ব-

দক্ষিণ কোণের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিশাল এক অরণ্য এবং তারই মাঝে মাঝে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড় পাহাড়।

মদনপুরের খুব কাছেই প্রান্তরের উপর দিয়ে দুই তীরে শুভ্র বালুকা-শয্যা বিছিয়ে, রোদের আলোতে চিক্‌মিকে হীরার হার বুন্‌তে বুন্‌তে ঝির্ ঝির্ বয়ে যাচ্ছে একটি ছোট নদী। কিন্তু বর্ষাকালে এ নদী আর ছোট্ট থাকে না, তখন দুই ধারের বালুকা-শয্যা একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তার গতিও হয় অত্যন্ত তুরন্ত ও দুরন্ত।

মদনপুর থেকে প্রায় মাইল-খানেক তফাতে নদীর ধারে প্রান্তরের উপরে ছিল একখানি সরকারি ডাক-বাংলো। সুন্দরবাবু ও মাণিককে নিয়ে তারই ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করলে জয়ন্ত।

মদনপুরে গিয়ে তারা পৌঁছেছিল খুব ভোর বেলায়। খানিক বিশ্রাম করে জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু যে সব আশ্চর্য ঘটনা আমরা খবরের কাগজে পড়েছি, সেগুলো ঘটেছে বেশ কিছুদিন আগে। সুতরাং আপাতত ঘটনাস্থলে গিয়ে কোনই লাভ নেই। কিন্তু এখন আমাদের কি করা উচিত বলুন দেখি?"

সুন্দরবাবু বললেন, "এখন আমাদের উচিত এখানকার থানায় যাওয়া। খবরের কাগজে যা প্রকাশ পায়নি, পুলিশের মুখ থেকেই আমরা তা জানতে পারব।"

জয়ন্ত বললে, "ঠিক বলেছেন। চলুন তবে থানার দিকেই।"

থানায় গিয়ে দেখা গেল, ইন্সপেক্টার জিতেনবাবু টেবিলের সামনে বসে একমনে একখানা মস্ত বাঁধানো খাতার উপরে করছেন লেখনী চালনা।

আগন্তুকদের দেখে খাতা থেকে মুখ তুলে তিনি ভ্রূ সঙ্কুচিত করে বললেন, "কে মশাই আপনারা? এখানে কি দরকার?"

সুন্দরবাবু দুই-পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, "আমরা কলকাতার লোক, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এসেছি।"

জিতেনবাবু আবার খাতার দিকে মুখ নামিয়ে বললেন, "এখন আমি অত্যন্ত ব্যস্ত। কারুর সঙ্গে আলাপ করবার সময় আমার নেই।" ব'লেই তিনি আবার খাতার উপরে লেখনী চালান করতে উদ্যত হলেন।

সুন্দরবাবু একগাল হেসে অমায়িকভাবে বললেন, "কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সময় আমাদের আছে। অধীনদের সঙ্গে দু-চারটে কথাবার্তা কইলে বড়ই অন্যায় হবে কি?"

জিতেনবাবু আবার মুখ তুলে বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "কে মশাই আপনারা?"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! আমরা? পরিচয় দিলে কি চিনতে পারবেন? আমাকে সবাই সুন্দরবাবু বলে ডাকে, আমি হচ্ছি কলকাতা-পুলিশের একজন সামান্য ডিটেকটিভ্ ইন্সপেক্টার। আর এঁরা হচ্ছেন দু'টি নবীন সৌখিন গোয়েন্দা। এঁর নাম জয়ন্তবাবু আর ওঁর নাম মাণিকবাবু। আর কিছু পরিচয় জানতে চান কি?"

দেখতে দেখতে জিতেনবাবুর মুখের ভাব গেল বদ্‌লে। লেখনী ত্যাগ করে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাত জোড় করে তিনি বললেন, "আপনাদের সকলেরই নাম আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত। দয়া করে আমার অসভ্যতাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। দেখুন, পুলিশে চাকৃরি করি, দিন-রাত যত বাজে লোক এসে করে জ্বালাতন। কাজেই মাঝে মাঝে আত্মরক্ষার জন্যেই লোকের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে হয়। সুন্দর-বাবু, জয়ন্তবাবু, মাণিকবাবু, অনুগ্রহ করে আপনারা আসন গ্রহণ করুন," বলে তিনি নিজেই এগিয়ে এসে তিনজনের কাছে তিনখানা চেয়ার টেনে এনে স্থাপন করলেন।

সুন্দরবাবু, জয়ন্ত ও মাণিক আসন গ্রহণ করলে পর জিতেনবাবু হাসতে হাসতে আবার বললেন, "আপনারা যে কেন এখানে এসেছেন, আমি তা অনুমান করতে পারছি।"

সুন্দরবাবু বললেন, "পারছেন নাকি?"

—"নিশ্চয়। মদনপুরে যে আশ্চর্য ঘটনাগুলো ঘটেছে, খবরের কাগজে

তাই পাঠ করেই আপনারা যে কৌতূহলী হয়ে এখানে ছুটে এসেছেন, সে-বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই।"

সুন্দরবাবু বললেন, "যখন বুঝিতেই পেরেছেন তখন আমাদের আর-কোনো গৌরচন্দ্রিকা করবার দরকার নেই। কিন্তু জানেন মশাই, আমার কৌতূহল মোটেই প্রবল নয়, আমি এই পৈশাচিক কাণ্ডের ভিতরে আবির্ভূত হবার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম না। জয়ন্ত আর মাণিকই আমাকে জোর ক'রে এখানে টেনে এনেছে। এই দুই ডান্‌পিঠে ছোক্‌রার জন্যে শেষটা আমাকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে দেখছি!"

জিতেনবাবু বললেন, "জয়ন্তবাবু! মাণিকবাবু! আপনারা দয়া ক'রে এখানে এসেছেন ব'লে আমি অতিশয় আনন্দিত হয়েছি! আপনাদের কীর্তির কথা কে না জানে? এই রকম এক অদ্ভুত আর জটিল মামলায় আমি যদি আপনাদের সাহায্য পাই, তাহ'লে নিজেকে কৃতার্থ ব'লে মনে করব। আমি তো মশাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছি, প্রাণপণে তদন্ত ক'রেও কোনই খেই পাচ্ছি না। সমস্তই ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে!"

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, "সুন্দরবাবু জানেন, এর আগেও আমরা ভৌতিক ব্যাপারের মধ্যে গিয়ে পড়বার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু ভূত সেখানে আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির কাছেই রীতিমত ঢিট্ হয়ে গিয়েছিল!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! তুমি বুঝি সেই 'মানুষ-পিশাচ' মামলাটার কথা বলছ?"*

—"হ্যাঁ।"

—"কিন্তু সে-কথা এখন থাক্। জিতেনবাবু, এখানকার মামলার বিবরণ খবরের কাগজে যেটুকু পড়েছি, ইতিমধ্যে আপনি তার চেয়ে বেশী-কিছু অগ্রসর হতে পেরেছেন কি?"

জিতেনবাবু হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "মোটেই

*"মানুষ-পিশাচ" উপন্যাস দ্রষ্টব্য।

নয় মশাই, মোটেই নয়। এ মামলার ভিতরে ঢোকবার শক্তি কোন মানুষের আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। এ-এক অসম্ভব মামলা।"

জয়ন্ত অল্পক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "জিতেনবাবু, খবরের কাগজের 'রিপোর্টে' যে-টুকু পড়েছি, তার বেশি আর কিছুই আমি জানি না। হত্যাকারী প্রথম তুই ঘটনাক্ষেত্রে মানুষের মুণ্ড নিয়ে পালিয়েছিল, কিন্তু তৃতীয় ঘটনাক্ষেত্রে সে হত ব্যক্তির সমস্ত দেহটাকেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। এর কারণ কি আপনি বলতে পারেন?"

জিতেনবাবু নাচারের মতন বললেন, "আমি কিছুই বলতে পারি না। আমি এখন অকূল সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, বুঝেছেন মশাই?"

জয়ন্ত বললে, "আমার কি মনে হয় জানেন, প্রথম তুই ঘটনাক্ষেত্রেই আক্রান্ত তুই ব্যক্তির আর্তনাদ শুনে বাড়ির লোকজনেরা সবাই ছুটে এসেছিল। হত্যাকারী তাই সময়ের অভাবেই হত ব্যক্তিদের গোটা দেহ নিয়ে পালাতে পারেনি, তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়েছিল তাদের মুণ্ড কেটে নিয়েই। কিন্তু তৃতীয় ঘটনাক্ষেত্রে সুখাই ছিল একলা তার দোকান-ঘরে শুয়ে। হত্যাকারীকে কেউ সেখানে বাধা দিতে আসেনি, তাই সে সুখাইয়ের গোটা দেহটাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছিল ঘটনাক্ষেত্র থেকে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "এর দ্বারা এমন কী প্রমাণিত হয় জয়ন্ত?"

—"কী প্রমাণিত হয় জানেন? হত্যাকারী ভূত-প্রেত কিছুই নয়, সে হচ্ছে আমাদের মতন মানুষ।"

সুন্দরবাবু বললেন, "তোমার যুক্তির কোনই অর্থ বুঝতে পারছি না।"

—"অর্থ খুবই সহজ। আপনারা এই ঘটনাগুলোকে ভৌতিক কাণ্ড ব'লে মনে করেছেন, কিন্তু এর মধ্যে অলৌকিকত্ব কিছুই নেই। প্রথম তুই ঘটনাক্ষেত্রে হত্যাকারী তাড়াতাড়ি কেবল মুণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল কেন? সে পালিয়ে গিয়েছিল মানুষদের ভয়েই—কারণ আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজনরা সবাই জেগে উঠেছিল। কিন্তু তৃতীয় ঘটনাক্ষেত্রে দোকান ঘরে সুখাই ছিল একলা।

হত্যাকারী তাই কোন বাধা না পেয়ে সুখাইকে হত্যা করে তার গোটা দেহটাকেও ঘটনাক্ষেত্রে রেখে যায়নি।”

—‘হুম! এ থেকে কি বুঝতে হবে?”

—“বুঝতে হবে যে, এই হত্যাকারী অমানুষ বা অলৌকিক নয়। মানুষের আক্রমণকে সে ভয় করে। মানুষ যেখানে বাধা দিতে পারে, সেখানে সে পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ হতে চায়। সুতরাং আপনারা জেনে রাখুন, এই মামলার ভিতরে পৈশাচিক বা ভৌতিক কোন ব্যাপারই নেই।”

জিতেনবাবু বললেন, “কিন্তু এভাবে দেহ চুরি ক'রে হত্যাকারীর কি লাভ হবে?”

—“সেটা আমিও অনুমান করতে পারছি না। এ এক আশ্চর্য হত্যাকারী। এ খুন করবার পর মূল্যবান কিছুই চুরি করে না, চুরি করতে চায় কেবল লাশটাকেই।”

মাণিক বললে, “এমন উদ্দেশ্যহীন হত্যা দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে, হত্যাকারী বোধ হয় উন্মাদগ্রস্ত।”

জয়ন্ত সায় দিয়ে বললে, “আমারও মনে এইরকম একটা সন্দেহ জেগেছে। আচ্ছা জিতেনবাবু, হত্যাকারীর হাত-পায়ের ছাপের মাপ আপনি নিয়েছেন তো?”

—“নিয়েছি বৈকি! কিন্তু তার পদচিহ্নের ভিতরে একটু নূতনত্ব আছে।”

—“সে আবার কি?”

—“তার পায়ের গড়ন বিকৃত। খুব সম্ভব সে ভালো ক'রে হাঁটতে পারে না।”

—“এটা একটা মূল্যবান তথ্য। ঘটনাস্থলের বাইরে আর কোথাও কি আপনি অপরাধীর পদচিহ্ন আবিষ্কার করতে পেরেছেন?”

—“না।”

—“মদনপুর ছোট শহর। এখানে কি আপনি এমন কোন লোকের

খোঁজ নিয়েছেন, যে খুঁড়িয়ে হাঁটে বা যার পায়ের গড়ন বিকৃত?"

—"অনেক খুঁজেছি মশাই, অনেক খুঁজেছি। মদনপুরের ভিতরে যত খোঁড়া আর যত বিকৃত চরণের অধিকারী আছে, সকলকেই পরীক্ষা করে দেখেছি। এমন কি এ-অঞ্চলে অন্যান্য গ্রামেও খোঁজ নিতে ছাড়িনি। কিন্তু তাদের কারুর সঙ্গে হত্যাকারীর পায়ের ছাপ মেলে না।"

ঠিক এই সময়ে একটি ভদ্রলোক বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর চোখ মুখ উদ্‌ভ্রান্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত। রুদ্ধশ্বাসে তিনি চিৎকার করে বললেন, "মশাই, আমাদের সর্বনাশ হয়েছে!"

জিতেনবাবু বললেন, "ব্যাপার কি?"

—"গেল রাতে প্রতাপনারায়ণবাবু আর তাঁর স্ত্রীকে কারা খুন করে গিয়েছে।"

জিতেনবাবু তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে সবিস্ময়ে বললেন, "জমিদার প্রতাপনারায়ণবাবু?"

—"হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। কেবল খুন নয়, খুনীরা লোহার সিন্দুক খুলে পঞ্চাশ হাজার টাকার গয়না আর নগদ বিশ হাজার টাকাও নিয়ে গিয়েছে!"

—"অ্যাঃ, এবারে আবার খুন আর চুরি একসঙ্গে! লাশ পাওয়া গেছে তো?"

—"না, ঘরময় বইছে রক্তের ঢেউ, প্রতাপনারায়ণবাবু আর তাঁর স্ত্রীর দেহ অদৃশ্য! পাওয়া গিয়েছে কেবল জমিদারবাবুর হাতের একটা কাটা আঙুল!"

নই

জিতেনবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে। রায় বাহাদুর প্রতাপনারায়ণ সিংহ বড় যে-সে লোক নন। এ অঞ্চলে তাঁর মতন ধনী আর প্রতিপত্তিশালী জমিদার আর দ্বিতীয় নেই। সাধারণ সৎকাজে তিনি টাকাও দান করেছেন যথেষ্ট। সকলেই তাঁকে ভালবাসে আর শ্রদ্ধা করে। সাক্ষাৎ শয়তান ছাড়া আর কেউ তাঁকে আর তাঁর স্ত্রীকে খুন করতে পারে না। তাঁর মস্ত অট্টালিকায় পাহারা দেয় অনেক দ্বারবান। এমন জায়গায় ডবল খুন হ'ল কেমন ক'রে, কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না। আশ্চর্য।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কেবল কি খুন মশাই? আবার ডবল লাশ চুরি! এ যে অসম্ভব কাণ্ড ব'লে মনে হচ্ছে।"

যিনি থানায় খবর দিতে এসেছিলেন জিতেনবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে?"

—"জমিদারবাবুর ম্যানেজার।"

—"নাম?"

—"শ্রীসতীশচন্দ্র বসু।"

—"দেশ?"

—"হুগলী।"

—"কতদিন এখানে কাজ করছেন?"

—"দশ বছর।"

—"শুনেছি প্রতাপনারায়ণবাবু অপুত্রক। তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে?"

—"তাঁর একমাত্র বিবাহিত কন্যা। মেয়ে আর জামাই জমিদার

বাড়িতেই থাকেন।"

—"জামাইয়ের নাম কি ?"

—"সূর্যশঙ্করবাবু।"

—"তিনিও কি বড় ঘরের ছেলে ?"

—"বংশগৌরব থাকলেও সূর্যবাবুর নিজস্ব আয় কিছুই নেই।"

—"আচ্ছা সতীশবাবু, রাত্রে যদি খুন হয়ে থাকে, থানায় খবর দিতে এত দেরি হ'ল কেন ?"

—"খুনের কথা প্রকাশ পেয়েছে এই খানিকক্ষণ আগেই। জমিদারবাবু আর তাঁর স্ত্রী একটু বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমোতেন। তার উপরে বাবুর শরীরটা কাল খুবই খারাপ ছিল। তাই বেলা এগারোটা পর্যন্ত তাঁর খোঁজ নেয় নি।"

—"খুনের কথা প্রথমে কে জানতে পারে ?"

—"বাবুর পুরনো চাকর বিশু।"

—"বাড়িতে এত লোকজন, রাত্রে কেউ সন্দেহজনক কোন শব্দই শুনতে পায় নি ?"

—"না। বাবু থাকতেন বাড়ির এক প্রান্তে। তিনি নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন ব'লে তাঁর শোবার ঘরের কাছাকাছি কোন ঘরেই কেউ বাস করত না। ধরতে গেলে বাবুর মহলটা ছিল বাড়ি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন।"

—"জমিদারবাবু কোন্ তালায় থাকতেন ?"

—"দোতালায়।"

—"খুনীরা নিশ্চয় দলে ভারি ছিল, নইলে তারা দোতালা থেকে দু-দুটো মৃতদেহ নিয়ে পালাতে পারত না। কিন্তু তারা কেমন ক'রে ঘরের ভিতর ঢুকেছিল, সেটা কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন ?"

—"জমিদার-বাড়ির দোতালায় কোন ঘরের জানালাতেই গরাদে নেই। বাগান থেকে মই বেয়ে যদি কেউ দোতালার বারান্দায় ওঠে, তাহ'লে সে অনায়াসেই যে কোন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে।"

—"হঠাৎ মইয়ের কথা তুললেন কেন ?"

—"বাবুর মহলের দিকে বাগানে একখানা রক্তমাখা মই পাওয়া গিয়েছে।"

—"রক্তমাখা ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"মইখানা কার ?"

—"বাগানের মালীদের।"

—"মইখানা কোথায় থাকত ?"

—"মালীদের ঘরের পাশে।"

—"সতীশবাবু, আপনি বললেন জমিদারবাবুর শোবার ঘরের মেঝে হয়েছে রক্তময়। সেখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন কি ?"

—"কি বিষয়, বলুন।"

—"রক্তের ভিতরে অনেকগুলো হাত আর পায়ের ছাপ ?"

—"হাত আর পায়ের ছাপ ? না মশাই, ওসব কিছুই আমরা দেখ্তে পাইনি। চারিদিকে খালি দেখছি রক্ত, জমাট রক্ত। খালি কি মেঝেয় ? ঘরের দেওয়ালের গায়েও রক্ত আর রক্তের ধারা। সেই ভীষণ রক্তাক্ত ঘরের কথা ভাবতেও আমার বুক ধুক্পুক্ ক'রে উঠছে। এমন দৃশ্য জীবনে আর কখনো দেখিনি—এমন দৃশ্য জীবনে আর কখনো দেখতেও চাই না।"

—"ঘটনাস্থল থেকে মূল্যবান কিছু চুরি গিয়েছে ?"

—"বিশেষ কিছু নয়।"

—"বিশেষ কিছু নয় মানে ?"

—"জমিদারবাবুর ঘরে মূল্যবান দ্রব্য আর নগদ টাকাকড়িও ছিল যথেষ্ট। হত্যাকারী ইচ্ছা করলে খুব সহজেই সে-সব নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে কিছুই স্পর্শ করেনি। তবে জমিদার গৃহিণীর দেহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গায়ের অলঙ্কারগুলিও অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু সেগুলির উপরে হত্যাকারীর বিশেষ লোভ থাকবার কথা নয়।"

—"কেন ?"

—"জমিদার-গৃহিণী ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ। মূল্যবান

অলঙ্কার পরতে তিনি মোটেই ভালোবাসতেন না। সধবা ব'লে বাধ্য হয়ে আটপৌরে যে দু-চারখানি গহনা পরতেন, তার দাম বোধহয় তিন-চারশো টাকার বেশি নয়। হত্যাকারী নিশ্চয়ই সেই তুচ্ছ গহনার লোভে এমন ডবল খুন করতে আসেনি।"

সতীশবাবুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থেকে জিতেনবাবু বললেন, "আপনাকে বেশ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব'লেই মনে হচ্ছে। এর মধ্যেই এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে আপনি বিলক্ষণ মস্তিষ্ক চালনা করেছেন দেখছি। হ্যাঁ, আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন। অর্থলোভে এই হত্যাকাণ্ড হয় নি। এখানে এর আগে আরো যে তিনটি হত্যাকাণ্ড হয়েছে, তার মধ্যেও হত্যাকারীর অর্থলোভের পরিচয় পাওয়া যায়নি। এই অদ্ভুত হত্যাকারী চায় কেবল মানুষের দেহ।"

জিতেনবাবু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপাতত আমার কোন জিজ্ঞাস্য নেই। এইবার ঘটনাস্থলের দিকেই যাত্রা করা যাক্। সুন্দরবাবু, আপনারাও কি আমার সঙ্গী হবেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! আদেশ পেলেই সঙ্গী হ'তে পারি।"

জিতেনবাবু বললেন, "বিলক্ষণ! এ আমার আদেশ নয়, বিনীত অনুরোধ। আপনি হচ্ছেন কলকাতা-পুলিশের ডিটেকটিভ্। আর জয়ন্তবাবুদের শক্তির কথা দেশের কে না জানে? আপনাদের সাহায্য লাভ করা বড় কম কথা নয়। জানেন তো, 'দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'—এবারেও যদি হারি তাহলে শ্রেষ্ঠদেরই সঙ্গে হারব, উপরওয়ালারা আর হুম্‌কি দিতে পারবেন না।"

পুলিশের থানা থেকে জমিদার-বাড়ি বেশি দূরে নয়। দশ মিনিটের মধ্যে সকলেই যথাস্থানে গিয়ে হাজির হলেন।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দেখলেই মনে হয় যেন রাজার প্রাসাদ। আর সেই অট্টালিকার চারিধার ঘিরে রয়েছে অনেক বিঘে জমি জুড়ে মস্ত এক বাগান। সেই বাগানে খালি ফুলের গাছ নয়, বহু সুবৃহৎ বনস্পতির

মত বৃক্ষেরও অভাব নেই। এক একটি গাছ দেখলেই বোঝা যায় তাদের বয়স অন্তত শতাধিক বৎসরের কম নয়। এবং উদ্যানের কোন কোন স্থানে আশ্রয় নিয়েছে রীতিমত জঙ্গল ও ঝোপ্‌ঝাপ্‌।

জয়ন্ত সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে, "দেখছি প্রতাপ-নারায়ণবাবু তাঁর বাগানের সবটাকেই নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারেন নি। বাগানের ফটকে বন্দুক ঘাড়ে করে দ্বারবান পাহারা দিচ্ছে আর এর চারিধারে রয়েছে মাত্র হাত-দশেক উঁচু পাঁচিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে দ্বারবানদের চোখে ধুলো দিয়ে যে-কোন মূর্তিমান বিপদ ঐ পাঁচিল ডিঙিয়ে এখানকার যে-কোন ঝোপ্‌ঝাপের ভিতর গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে। এমন জায়গায় অনেক দ্বারবান নিযুক্ত করলেও কেউ কোন দিন নিরাপদ হতে পারবে না।"

জমিদার-বাড়ির কাছে গিয়ে দেখা গেল, বাগানের সেই অংশটা বেশ সযত্নে রাখা হয়েছে, সেখানে জঙ্গল বা ঝোপ্‌ঝাপের অত্যাচার নেই। একটি সরোবরে পরিষ্কার নীল জল থই থই করছে, চারিদিকেই রয়েছে দেশী ও বিলেতী ফুল-গাছের নানারকম বর্ণ-বৈচিত্র্য।

অট্টালিকার একটি প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়ে সতীশবাবু বললেন, "এই হচ্ছে আমাদের বাবুর মহল। একেবারে শেষের দিকে বারান্দার ঐখানটায় আছে বাবুর ঘর। খুন হয়েছে ঐ ঘরেই। আর ঐ দেখুন, সেই মইখানা প'ড়ে রয়েছে।"

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "ঐ মইখানার উপরে আজ আপনারা কেউ হাত দিয়েছেন কি?"

সতীশবাবু বললে, "না মশাই, আমি সবাইকেই ঐ মইয়ের উপরে হাত দিতে মানা করেছি।"

—"কেন?"

—"আমি নিতান্ত বোকা লোক নই মশাই। আমার ঘরে রাশি রাশি ইংরেজি ডিটেকটিভ গল্পের বই আছে। আমি বেশ জানি, যেখানে খুন হয়, পুলিশ না আসা পর্যন্ত সেখানকার কোন জিনিসেই হস্তক্ষেপ

করতে নেই।"

জয়ন্ত ধীরে ধীরে সেই মইয়ের কাছে গিয়ে মাটির উপরে ব'সে পড়ল। তারপর পকেট থেকে একখানা আতশী কাচ বার ক'রে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সেই মইখানা পরীক্ষা করতে লাগল। মিনিট-দুয়েক পরে আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "জিতেনবাবু, এই মইয়ের কাছে একজন চৌকিদারকে দাঁড় করিয়ে রেখে যান।"

—"কেন বলুন দেখি!"

—"এই রক্তমাখা মইয়ের উপরে অনেকগুলো হাতের আঙুলের ছাপ আছে। এই ছাপগুলো পরে আমাদের কাজে লাগবে।"

সেখান থেকে সবাই বাড়ির ভিতরে ঢুকে দোতালার সেই ঘটনাস্থলে এসে হাজির হ'ল।

সতীশবাবু যা বলেছেন, মিথ্যা নয়। ঘরের ভিতরটা দেখলে যে-কোন লোকের চোখ আর মন স্তম্ভিত না হয়ে পারে না। রক্ত, রক্ত, রক্ত—চারিদিকে কেবল রক্তধারার বীভৎস উচ্ছ্বাস! পালঙ্কের বিছানার উপরে রক্ত, চারিধারে দেওয়ালের গায়ে রক্ত, আর ঘরের সমস্ত মেঝে জুড়ে জমে আছে রোমাঞ্চকর রক্তের ধারা!

জিতেনবাবু বললেন, "গেল তিনবার তিনটে খুন হয়েছে। তিন জায়গাতেই দেখেছি রক্তের উপরে অনেকগুলো ক'রে হাত আর পায়ের ছাপ। কিন্তু এখানে রক্তের উপরে কোন ছাপই দেখতে পাচ্ছি না। খুনীরা যেন সন্তর্পণে কাজ করেছে, রক্তের ভিতরে নিজেদের হাত-পায়ের কোন ছাপই পড়তে দেয়নি। এ-রহস্য বুঝতে পারছি না।"

জয়ন্ত তখন মেঝের উপরে তাকিয়ে ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। হঠাৎ সে ব'সে প'ড়ে সেই রক্তময় মেঝের উপর থেকে কি-একটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

জিতেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ওটা কি দেখছেন জয়ন্তবাবু?"

—"হাড়ের ছোট্ট একটি টুক্‌রো!"

—"হাড়ের ছোট্ট একটি টুক্‌রো? কিন্তু ঘরের ঐ কোণে একটা গোটা

আঙুলই প'ড়ে রয়েছে, সেটা দেখতে পেয়েছেন কি ?"

—"নিশ্চয়ই দেখেছি। কিন্তু এখানে একটা হাড়ের টুক্‌রোই নেই—

চেয়ে দেখুন, রক্তের ভিতরে আরো অনেকগুলো হাড়ের টুক্‌রো রয়েছে।"

—"এথেকে আপনি কি অনুমান করছেন জয়ন্তবাবু ?"

—"অনুমান ? না, অনুমান নয়। এত-বেশি হাড়ের টুক্‌রো দেখে আমি বেশ বুঝতে পারছি, খুনীরা এখানে ব'সে এক বীভৎস কাজ করেছে।"

—"বীভৎস কাজ ? সে আবার কি ?"

—"খুনীরা কোন ধারাল অস্ত্র দিয়ে মৃত ব্যক্তিদের দেহদুটোকে করেছে খণ্ড বিখণ্ড !"

জিতেনবাবু সচকিত কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু আগেকার তিন ঘটনা-ক্ষেত্রেই খুনী কোন-রকম অস্ত্র ব্যবহার করেনি। এখানে তার ব্যতিক্রম

হ'ল কেন ?"

জয়ন্ত রহস্যময় হাসি হেসে বললে, "এ-প্রশ্নের উত্তর পরে পাবেন। আপাতত এ-ঘরের ভিতরে আমাদের আর দেখবার কিছুই নেই। এই-বার হচ্ছে আমাদের শোনবার পালা। এখন বাড়ির লোকজনরা কালকের রাত্রের কথা কি বলেন শোনা যাক্। একে একে ডাকুন সবাইকে।"

ঠিক সেই সময়ে একজন চৌকিদার দরজার বাইরে ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুক্‌লে জিতেনবাবুকে।

জিতেনবাবু তাকে দেখেই ক্রুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠলেন, "তুমি এখানে কেন ? তোমাকে না আমি মইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে বলে-ছিলুম ?"

—"হাঁ হুজুর। কিন্তু একজন লোক গিয়ে বললে আপনি নাকি আমাকে ডেকেছেন।"

—"আমি তোমাকে ডেকেছি ? কে বললে তোমাকে এই কথা ?"

—"আমি তাকে চিনি না হুজুর।"

—"না, আমি তোমাকে ডাকিনি। যাও, সেই মইয়ের কাছে গিয়ে পাহারা দাও, সেখানে আর কারুকে যেতে দিও না।"

জয়ন্ত শুষ্ককণ্ঠে মৃদু হাসি হেসে বললে, "আর পাহারা দেবার দরকার নেই জিতেনবাবু! আমি বেশ বুঝতে পারছি, মই যেখানে ছিল, সেখানে গেলে আর সে মই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমি ভুল করেছি। মইয়ের উপরে যে হাতের আঙুলের ছাপ ছিল, এ-কথা প্রকাশ্যে আমার পক্ষে বলা উচিত হয়নি।"

জিতেনবাবু ভ্রু সঙ্কুচিত ক'রে বললেন, "আপনার কথার অর্থ কি ?"

—"অর্থ কি আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাগানে গিয়ে আপনি সেই মই-খানাকে আর খুঁজে পাবেন না।"

সকলে দ্রুতপদে দোতালা থেকে নেমে আবার সেইখানে গিয়ে হাজির হ'ল, যেখানে প'ড়ে ছিল সেই মইখানা।

দেখা গেল, চোকিদার সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে হতভম্বের মতন। মই

অদৃশ্য হয়েছে সেখান থেকে।

জিতেনবাবু খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর থেমে থেমে বললেন, "কি আশ্চর্য! বইখানা এখান থেকে সরালে কে?"

জয়ন্ত বললে, "হত্যাকারী। কিংবা হত্যাকারীরা।"

—"তাহলে আমরা আসবার পরও হত্যাকারী এখানে হাজির ছিল?"

—"কেবল হাজির ছিল না, সে আমাদের কথাবার্তা সব শুনেছে, আমাদের কার্যকলাপ সব লক্ষ্য করেছে। তারপর করেছে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

—"তাহ'লে হত্যাকারী এখনো এখানে হাজির আছে?"

—"না থাকতেও পারে। কার্যোদ্ধারের পর বুদ্ধিমানরা বিপদজনক স্থানে অপেক্ষা করে না।"

জিতেনবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, "না মশাই, না! আমার বিশ্বাস অন্যরকম। প্রতাপবাবুর জামাই সূর্যবাবু কোথায়?"

একটি লোক বললে, "বাড়ির ভিতরে!"

—"তাঁকে এখানে ডেকে আনো।"

লোকটি চ'লে গেল। জয়ন্ত বললে, "জিতেনবাবু, হঠাৎ সূর্যবাবুকে ডাকলেন কেন?"

—"প্রতাপবাবুর অবর্তমানে সূর্যবাবুই তো বাড়ির কর্তা। আমি আগে তাঁকেই গোটাকয়েক প্রশ্ন করতে চাই।"

যে লোকটি সূর্যবাবুকে ডাকতে গিয়েছিল, অল্পক্ষণ পরে সে ফিরে এসে বললে, "সূর্যবাবু বাড়ির ভিতরে নেই।"

—"সে কি?"

—"একটু আগেই তিনি খিড়কীর দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছেন।"

জিতেনবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "সূর্যবাবুর শ্বশুর-শাশুড়ী খুন হয়েছেন। পুলিশ এসেছে বাড়িতে তদন্ত করতে। আর সূর্যবাবু সব জেনে-শুনেও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন! এর অর্থ কি? এর অর্থ কি?"

চতুর্থ

সূর্যবাবু কোথায় ?

জয়ন্ত বললে, "জিতেনবাবু, আপনি সুন্দরবাবুকে নিয়ে তদন্তে নিযুক্ত থাকুন, মাণিককে নিয়ে আমি একটু এদিকে ওদিকে ঘুরে আসি।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! হঠাৎ তোমার এদিকে-ওদিকে ঘোরবার শখ হ'ল কেন বল দেখি ?"

জয়ন্ত ঠোঁট টিপে হেসে বললে, "এখানকার রহস্যময় ব্যাপার দেখে আমি দস্তুরমত হতভম্ব হয়ে গিয়েছি। খানিকটা সুশীতল বায়ু সেবন না করলে মস্তিষ্ক আমার প্রকৃতিস্থ হবে না।"

জিতেনবাবু বললেন, "অন্য তদন্তের আগে আমি চাই সূর্যবাবুকে।"

—"কেন ?"

—"তাঁর উপরে আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

—"কি-রকম সন্দেহ ?"

—"আমার বোধ হচ্ছে পুলিশের প্রশ্ন এড়াবার জন্যেই সূর্যবাবু এখান থেকে স'রে পড়েছেন।"

—"তিনি পুলিশের প্রশ্ন এড়াতে চাইবেন কেন ?"

—"কে বলতে পারে, এই খুনের সঙ্গে তিনি কোন-না-কোন দিক দিয়ে জড়িত নেই ?"

—"আপনার সন্দেহ সত্য হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে। আপাতত এ-সব নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার শক্তি নেই। এস মাণিক।"

মাথা নিচু ক'রে যেন কি ভাবতে ভাবতে জয়ন্ত অগ্রসর হ'ল। মাণিক চলল পিছনে পিছনে।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে মাণিক বললে, বন্ধু, "হঠাৎ তুমি মিথ্যাকথা

বললে কেন ?”

—“কি মিথ্যাকথা ?”

—“ঐ যে বললে, এখানকার ব্যাপার দেখে তুমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছ। এত সহজে তুমি হতভম্ব হবে ? এমন অসম্ভব কথা আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই।”

জয়ন্ত হেসে ফেলে বললে, “শাবাশ ভায়া, তুমি ঠিক ধরেছ। তাই তো কথায় বলে—‘শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর !”

—“তোমাকে আমি চিনব না তো চিনবে কে ?”

—“এও ঠিক। দেখ মাণিক, মইয়ের উপরে রক্তমাখা আঙ্গুলের ছাপ আছে—প্রকাশ্যে এই কথা বলেছিলুম ব'লেই মইখানা এখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে। আবার মনের কথা প্রকাশ ক'রে দ্বিতীয়বার আমি বিপদে পড়তে চাই না।”

—“বিপদ ! কি বিপদ ?”

—“হত্যাকারীর চর এখনো হয়তো এখানে হাজির আছে।”

—“তাতে হয়েছে কি ?”

—“মই কোন্ দিকে গিয়েছে আমি জানতে পেরেছি।”

—“কেমন করে ?”

—“মাটির দিকে চেয়ে দেখ।”

নিচের দিকে তাকিয়ে মাণিক বললে, “মাটির উপরে দেখছি তো পাশাপাশি ছুটো সরল রেখার দাগ।”

—“হ্যাঁ ! খুনীদের কেউ মইখানাকে মাটির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছে।”

—“মই তো উঁচু ক'রে তুলে নিয়ে যেতেই পারত, মাটির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার কারণ কি ?”

—“সে হেঁট হয়ে মইখানাকে নিয়ে গিয়েছে।”

—“কেন ?”

—“চারিদিকে সতর্ক পাহারা, সকলের চোখকে যে ফাঁকি দিতে

চেয়েছিল।"

—"ত্বটো সরল রেখা ধ'রে তারা মাটির উপর দিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগল। তারপর পাওয়া গেল খানিকটা ঘাসজমি—সরল রেখাত্বটো অদৃশ্য। কিন্তু সেখানেও মই টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন আবিষ্কার করলে জয়ন্তের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। জমির অনেক ঘাস হয়েছে ছিন্নভিন্ন—তার দ্বারাও বোঝা যায়, মই টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এইখান দিয়েই। ঘাসজমির পর আবার কাঁচা মাটি। সেখানেও মইয়ের দাগ।"

জয়ন্ত বললে, "মাণিক, সমস্ত দেখে বেশ বুঝতে পারছি, খুনীরা অত্যন্ত চতুর। রক্তাক্ত ঘটনাস্থলে তারা একখানা হাত বা পায়ের চিহ্ন রেখে যায়নি। আমরা যদি চট্‌পট্ না আসতুম, তাহ'লে মাটির উপরে নিশ্চয়ই মইয়ের এই চিহ্ন থাকত না।"

—"অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, খুনীরা মই টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্নও বিলুপ্ত ক'রে দিত?"

—"নিশ্চয়।"

তারা বাগানের প্রান্তে এসে হাজির হ'ল। সেখানে প্রাচীরের গায়ে রয়েছে একটা ছোট দরজা।

জয়ন্ত বললে, "দরজার খিল খোলা। মই নিশ্চয়ই এই দরজা দিয়েই বাইরে গিয়েছে।"

দরজার পাল্লা খুলে তারা বাগানের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে খানিকটা খোলা জমির পর দেখা যাচ্ছে একটা বিস্তীর্ণ জলাভূমি। তার ওপারে রয়েছে সবুজ বন।

জয়ন্ত বললে, "এখানে মাটির উপরে আর মইয়ের চিহ্ন নেই। তারা নিজেদের নিরাপদ ভেবে এখানে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মইখানাকে নিয়েছিল কাঁধের উপরে। এগিয়ে চল মাণিক, এগিয়ে চল, জলাভূমির প্রান্তে মাটি হবে স্যাঁৎসেঁতে। দেখা যাক্, তার উপরে কোন পায়ের চিহ্ন আবিষ্কার করা যায় কিনা!"

চলতে চলতে মাণিক বললে, "জয়ন্ত, একটা কথা আমার মনে হচ্ছে।"

—"কি ?"

—"সূর্যবাবু এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সত্যসত্যই জড়িত কি না ?"

—"কেন তুমি এমন সন্দেহ করছ ?"

—"প্রতাপনারায়ণের আর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনিই সম্পত্তির অধিকারী হবেন।"

—"বেশ। তারপর ?"

—"বাড়িতে পুলিশ আসছে শুনেই তিনি সরে পড়েছেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাপী মন।"

—"একেবারে 'নিশ্চয়ই' ব'লে ফেললে ?"

—"কেন বলব না ?"

—"সূর্যবাবু জানতেন, প্রতাপনারায়ণের একমাত্র উত্তরাধিকারী হবেন তিনিই। স্বাভাবিকভাবে যে সম্পত্তি তাঁর হস্তগত হবে, তার জন্যে তিনি এমন একটা বীভৎস, বিয়োগান্ত নাটকে দুরাত্মার ভূমিকায় অভিনয় করবেন কেন ?"

—"তবে কেন তিনি পুলিশ দেখে পালিয়েছেন ?"

—"মাণিক, এত সহজে তুমি মানুষের বিচার কোরো না। তবে এইটুকু বলতে পারি, হয়তো তোমার সন্দেহ মিথ্যা নয়। সূর্যবাবু হয়তো পুলিশ দেখেই পালিয়ে নিজের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত নিয়েছেন। আবার এটাও হতে পারে, সূর্যবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না অন্য কোন কারণে ?"

—"এমন কি অন্য কারণ থাকতে পারে ?"

—"জানি না। আপাতত ও-সব কথা নিয়ে আলোচনা করবারও দরকার নেই। এই আমরা জলাভূমির কাছে এসে পড়েছি। দেখ মাণিক, যা ভেবেছি তাই ! স্যাঁতসেঁতে মাটির উপরে রয়েছে মানুষের পদচিহ্নের পর পদচিহ্ন !"

জয়ন্ত তৎক্ষণাৎ সেইখানে ব'সে পড়ল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এদিক-ওদিক গিয়ে সেখানকার ভিজে মাটি খানিকক্ষণ পরীক্ষা ক'রে বললে, "এখানে দেখতে পাচ্ছি চারজন লোকের পায়ের দাগ !"

আরো কিছু এগিয়ে জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "মাণিক, মাণিক, এ কি ব্যাপার?"

মাণিক শিউরে উঠে বললে, "এ যে রক্ত! চারিদিকে বইছে রক্তের ঢেউ?"

"হ্যাঁ, টাট্‌কা রক্ত! মাটি এখনো রক্ত শুষে নেয়নি। আর ঐ দেখ, একটা ভারি জিনিসকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন! আর ও চিহ্নও রক্তাক্ত! নিশ্চয় একটু আগেই এখানে কোন হত্যাকাণ্ড হয়েছে! তারপর হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির দেহকে জলাভূমির দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে!"

জয়ন্ত সেই রক্তাক্ত চিহ্নের অনুসরণ ক'রে একেবারে জলাভূমির ধারে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ জামা খুলে মালকোঁচা মেরে কাপড় প'রে জলাভূমির ভিতরে গিয়ে পড়ল।

প্রায় এক কোমর জল। খানিকক্ষণ হেঁট হয়ে জলের তলায় হাত চালাতে চালাতে জয়ন্ত ব'লে উঠল, "পেয়েছি, পেয়েছি!"

—"কি পেয়েছ, জয়?"

জলের ভিতর থেকে জয়ন্ত টেনে তুললে একটা লাশ! যুবকের মৃতদেহ!

মাণিক অভিভূত কণ্ঠে বললে, "ও আবার কি!"

মৃতদেহটাকে কাঁধে ক'রে তীরের দিকে আসতে আসতে জয়ন্ত বললে, "মাণিক, দৌড়ে যাও! শীগ্‌গির জিতেনবাবুর সঙ্গে আর সকলকে ডেকে আনো! আমি এইখানেই অপেক্ষা করছি!"

পঞ্চম

আবার হত্যারহস্য

ইন্‌স্পেক্টার জিতেনবাবু, সুন্দরবাবু ও মৃত জমিদারের ম্যানেজার সতীশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মাণিক ফিরে এল।

জলা থেকে তুলে আনা মৃতদেহটাকে মাটির উপরে শুইয়ে রেখে গম্ভীর ও চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়েছিল জয়ন্ত।

সতীশবাবু আর্তস্বরে ব'লে উঠলেন, "কি সর্বনাশ! এ যে প্রতাপ-নারায়ণবাবুর জামাই সূর্যশঙ্করবাবুর দেহ!"

জয়ন্ত বললে, "আমার মনেও মাঝে মাঝে সেই সন্দেহই জাগছিল। তাহ'লে দেখছি আমার সন্দেহ মিথ্যা নয়!"

—"কিন্তু সূর্যবাবুকে খুন করলে কে?"

—"যারা জমিদারবাবু আর তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছে, যারা আজ রক্তাক্ত মইখানাকে সরিয়েছে, তারাই।"

—"কিন্তু কে তারা?"

—"কেমন করে বলব? আপনি যে তিমিরে, আমিও সেই তিমিরে। তবে মনে হচ্ছে আর বেশিদিন তিমির-রাজ্যে বাস করতে হবে না।"

জিতেনবাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, "জয়ন্তবাবু, তা'হলে আপনি কোন হদিস পেয়েছেন?"

—"উঁহু, বিশেষ কিছুই নয়। সতীশবাবু, আপনাকে দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

সতীশবাবু দুঃখিতভাবে বললেন, "কি আর জিজ্ঞাসা করবেন মশাই, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

—"সূর্যশঙ্করের কোন আত্মীয় আছেন?"

—"আছেন। তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই চন্দ্রশঙ্কর। তিনি ছাড়া সূর্যবাবুর আর কোন আত্মীয় বেঁচে নেই।"

—"তিনি কোথায় থাকেন?"

—"কলকাতায়।"

—"তাঁকে এই বিপদের খবর দিতে হবে তো?"

—"নিশ্চয়ই!"

—"তা'হলে তাঁকে আসার জন্যে আজকেই তার ক'রে দিন।"

—"তাঁকেও কি আপনার দরকার আছে?"

—"আছে বৈকি! সূর্যশঙ্করের পরিচিত লোকদের কথা আপনাদের চেয়ে তিনিই ভালো ক'রে বলতে পারবেন। আমার দৃঢ় ধারণা, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছে সূর্যবাবুরই কোন পরিচিত ব্যক্তি।"

জিতেনবাবু বললেন, "আপনার এমন ধারণার কারণ বুঝতে পারলাম না।"

—"আপাততঃ ওটা আর বোঝবার চেষ্টাও করবেন না। চন্দ্রবাবুর কাছ থেকে সূর্যবাবুর বন্ধুদের তালিকা না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সেই তালিকা দেখেই আমি আমার কর্তব্য স্থির করব। সতীশবাবু, সূর্য-বাবুর মৃত্যু হয়েছে, এখন প্রতাপনারায়ণের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে?"

—"তাঁর একমাত্র সন্তান করুণা দেবী।"

—"সূর্যবাবুরও সন্তান হয় নি?"

—"না।"

জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল।

সুন্দরবাবু এতক্ষণ পরে বললেন, "হুম্! কিছু বোঝা যাচ্ছে না! কিছু বোঝা যাচ্ছে না! মদনপুরে হত্যার পর হত্যা হচ্ছে। হত্যাকারী কোথাও দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে নরমুণ্ড নিয়ে সরে পড়ছে, কোথাও নিয়ে যাচ্ছে গোটা লাশটাকেই, আবার কোথাও তারা ঘটনাস্থলে বসেই খুনের পর লাশ কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে সঙ্গে নিয়ে যায়, আবার কোথাও বা তারা লাশ ফেলে দেয় জলের ভিতরে। কোথাও বা ঘটনা-

স্থলে রক্তধারার মধ্যে তাদের হাতের বা পায়ের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না, আবার কোথাও বা পাওয়া যায় হাতের আর বিকৃত পায়ের চিহ্ন। হত্যাকারী কোথাও খুব সাবধান, আবার কোথাও অত্যন্ত অসাবধান।"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, আপনার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দেখে খুশি হলুম। আমিও এখানকার হত্যাকাণ্ডগুলোর ভিতরে এই সব বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছি। কেবল লক্ষ্য নয়, একটা বড় সত্যও আবিষ্কার করেছি।"

সুন্দরবাবু বললেন, "বল কি? বড় সত্য! ছোট নয়, মেজ নয়—একেবারে বড় সত্য? ভায়া, তোমার-আবিষ্কার কাহিনী শ্রবণ করবার জন্যে আমার যে আগ্রহ হচ্ছে!"

—"আপনার ঐ অসাময়িক আগ্রহকে তাড়াতাড়ি দমন করে ফেলুন, সুন্দরবাবু! যথাসময়েই সত্য হবে স্বপ্রকাশ।"

সুন্দরবাবু অভিমান-ভরে বললেন, "ঐ তো তোমার চিরকেলে দোষ, জয়ন্ত! তুমি সর্বদাই আমাদের অন্ধকারে ফেলে রাখতে চাও! আমরা কি প্যাঁচা? আমরা কি ভালোবাসি অন্ধকারকেই? আচ্ছা লোক যা হোক!"

মাণিক চিমটি কাটবার সুযোগ পেয়েই বললে, "মোটেই তা নয় সুন্দরবাবু! নরহস্তীকে পেচক ব'লে সন্দেহ করবে, জয়ন্তের চোখ এখনো এত বেশি খারাপ হয় নি।"

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু পাকিয়ে বললেন, "আমার দেহ নিয়ে ব্যঙ্গ করবার অধিকার তোমার নেই মাণিক!"

মাণিক কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু জয়ন্ত তাকে বাধা দিয়ে ভর্ৎসনার স্বরে বললে, "মাণিক চুপ কর। তোমার কি স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান নেই! আমাদের চারিদিকেই ট্রাজেডি'র দৃশ্য, আমাদের সামনেই প'ড়ে রয়েছে এক বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃতদেহ, এখন কি চটুল কথা-কাটাকাটি করবার সময়? ছিঃ!"

মাণিক অনুতপ্ত, মৃদুকণ্ঠে বললে, "ভাই, আমি ভুলে গিয়েছিলুম। আমাকে ক্ষমা কর।"

মাণিকের কাঁধের উপরে একখানি হাত রেখে জয়ন্ত স্নিগ্ধ স্বরে বললে, "ভাই মাণিক, অন্যায় স্বীকার ক'রে যে ক্ষমা চাইতে পারে, সেই-ই দেয় যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচয়। তুমি হ'চ্ছ খাঁটি মানুষ, তা কি আমি জানি না?"

মাণিক বললে, "সুন্দরবাবু, আপনিও আমাকে ক্ষমা করুন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "আরে যাও হে যাও! কে তোমাকে ক্ষমা করতে চায়? তুমি কি 'ক্রিমিন্যাল'? আমি কি জানি না তুমি আমাকে ভালোবাসো? তবে মাঝে মাঝে তুমি আমাকে নিয়ে কিছু মজা করতে চাও, আর সে মজায় মজতে রাজি না হয়ে আমার মেজাজ যায় বিগ্‌ড়ে, এই যা মুশকিল! হুম!"

জিতেনবাবু যেন আপন মনেই বিড়-বিড় করে বললেন, "ঘাড়ে আবার একটা নতুন খুনের মামলা চাপল। ছয়-ছয়টা খুনের মামলা! এতগুলো মামলার ভার সইতে পারে, আমার ঘাড় এমন শক্ত নয় এখন আমার কর্তব্য কি, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না!"

জয়ন্ত বললে, "শুনুন জিতেনবাবু! এখন আপনার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, জলাভূমির স্যাঁৎসেতে মাটির উপরে যে পায়ের ছাপগুলো আছে তার ছাঁচ্ তুলে নেওয়া। লক্ষ্য করলে দেখবেন, সেগুলো যাদের পদ-চিহ্ন, তাদের কারুরই পা বিকৃত নয়।"

জিতেনবাবু বললেন, "আরে মশাই, পদচিহ্নের ছাঁচ আর কত তুলব? খুনির টিকি দেখবার জো নেই, ছাঁচ্ নিয়ে কি ধুয়ে খাব?"

—"ব্যস্ত হবেন না মশাই, ব্যস্ত হবেন না। আপনার মুখে মামলার সব কথা শুনে, আর এখানকার পায়ের দাগগুলো দেখে আমি একটা সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। সে সব নিয়ে পরে আলোচনা করলেও চলবে। আপাততঃ শুনুন আর একটা কথা।"

—"বলুন।"

—"আজ রাত্রে আমাদের লুকিয়ে এই জমিদার বাড়িতেই বাস করতে হবে।"

জিতেনবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "কেন?"

—"প্রশ্ন করবেন না, উত্তর দেওয়ার সময় এখনো হয়নি। খালি আজ নয়, হয়তো এখনও উপর-উপরি কয়েক রাত ধরেই আমাদের এখানে পাহারা দিতে হবে। খুনীকে ধরবার এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই।"

সুন্দরবাবু বললেন, "তুমি কি বলছ হে জয়ন্ত ? খুনী আবার এখানে কি করতে আসবে ?"

—"তার আসল উদ্দেশ্য এখনো পূর্ণ হয় নি।"

—"কি উদ্দেশ্য ?"

—"আবার প্রশ্ন করছেন ? শুনুন জিতেনবাবু, আমাদের পাহারা দিতে হবে কিন্তু খুব গোপনে—যেন কাকপক্ষীটি টের না পায় !"

"তাও কি সম্ভব ? এটা হচ্ছে মস্ত জমিদার-বাড়ি, চারিদিকে গিজ্-গিজ্ করছে লোকজন। এখানে কার মুখে চাপা দেবেন ?"

—"আপনি কি ভাবছেন, রাত্রে আমরা এখানে আসব জয়ঢাক বাজাতে বাজাতে শোভাযাত্রা করে ? মোটেই নয়। আমরা আসব অন্ধকারে গা-ঢেকে, চোরের মত।"

—"চোরের মত ?"

—"ঠিক তাই। আমরা জমিদার-বাড়ির বাগানে ঢুকব পাঁচিল টপ্‌কে। তারপর অদৃশ্য হব যে কোন ঝোপঝাপে ঢুকে।"

—"বিস্ময়কর প্রস্তাব।"

—"রোমাঞ্চকর সম্ভাবনার আগে বিস্ময়কর প্রস্তাবই করতে হয়। মশাই, আমার কার্যপদ্ধতি হচ্ছে স্বতন্ত্র। আপনারা পুলিশের লোক, বাঁধা-ধরা পথে চলেন মেসিনের মত, বাঁধা লাইনের বাইরে একটি পা ফেলবেন না। কিন্তু আমি মেসিন হ'তে রাজি নই, কারণ আমার আছে নিজস্ব কল্পনাশক্তি। এক-এক মামলায় আমি এক-এক রকম পদ্ধতিতে কাজ করি, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করি নতুন নতুন। এমন কি দরকার হ'লে বেআইনী কাজও করি, আপনারা যা পারবেন না।"

"ঘাট মানছি। আপনার কথা আর কার্যপদ্ধতি দুই-ই আমার কাছে দুর্বোধ্য।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, আমার কাছেও। এতদিন ধ'রে জয়ন্তকে দেখছি, তবু ওকে বুঝতে পারি না। ও হচ্ছে মূর্তিমান হেঁয়ালি।"

জয়ন্ত বললে, "জিতেনবাবু, আপনাকে আর এক কাজ করতে হবে।"

—"বে-আইনী কাজ নয় ?"

"না। আজকেই জাল ফেলে জলাভূমিটা পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা করুন।"

—"কেন ?"

—"আমার সন্দেহ হচ্ছে, হত্যাকারীরা প্রতাপনারায়ণবাবু আর তাঁর স্ত্রীর খণ্ডবিখণ্ড দেহ হয়তো ওর মধ্যেই ফেলে দিয়ে গিয়েছে।"

—"আপনার সন্দেহ হয়তো মিথ্যা নয়। বেশ, আজকেই এর ব্যবস্থা করব।"

সপ্তম

নিশাচরদের আবির্ভাব

সেই রাত্রি।

আকাশে ছিল এক-ফালি চাঁদ, কিন্তু রাত্রি গভীর হবার আগেই হ'ল অদৃশ্য। চারিদিকে ঝরতে লাগল নিবিড় অন্ধকারের ঝরনা। দেখা যায় না কোলের মানুষ, দেখা যায় না অন্য কিছু।

অবশ্য একটা দৃশ্য কিছু কিছু দেখা যায়। কালির পটে আরো ঘন কালি দিয়ে আঁকা বড় বড় গাছগুলোর ঝাপসা পত্রছত্র। থেকে থেকে প্রবল বাতাসের তাড়নায় সেখানে জাগছিল আর্ত মর্মর-স্বর।

চারিদিকে নিঝুম। ঘুমিয়ে পড়েছে পৃথিবী। ওরই মধ্যে নীরবতাকে শব্দিত করে মাঝে মাঝে সাড়া দিয়েছে পেচকের কণ্ঠ, মাঝে মাঝে ভেসে এসেছে শৃগাল-সভার কোলাহল।

মাণিক নিম্নকণ্ঠে বিরক্ত স্বরে বললে, "আরে মোলো, মশাগুলো ঘুমোতেও জানে না, তাদের রক্তপিপাসারও অন্ত নেই। গেলুম যে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "বেটারা মানুষের রক্ত খেতে আসে আবার গান গাইতে গাইতে! হুম্, ভগবান এমন সৃষ্টিছাড়া জীব কেন যে সৃষ্টি করেছেন, তার অর্থ কিছুই বোঝা যায় না।"

জিতেনবাবু বললেন, "বিশেষজ্ঞের মুখে শুনেছি, উদ্ভিদের ভিতরেই মশাদের যথেষ্ট খোরাক আছে, তাদের রক্তপান করবার দরকার নেই। তবু অকারণেই তারা রক্তপানের জন্যে লালায়িত হয়। এমন হিংসুক প্রাণী দুনিয়ায় আর নেই—গান্ধীজীকেও তারা রেহাই দেবে না।"

জয়ন্ত বললে, "আপনারা মশা নিয়ে গবেষণা বন্ধ করুন। আমি যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।"

সবাই চুপ।

তারা বসেছিল বেশ-একটা বড় ঝোপের মধ্যে। ঝোপের দুই পাশেই খানিকটা করে খোলা জমি।

মাটির উপরে সর্বত্রই ছড়ানো ছিল শুকনো ঝরা পাতা, কিছু দূরে মড়্ মড়্ ক'রে শব্দ হচ্ছে, যেন কে বা কারা মাড়িয়ে মাড়িয়ে আসছে শুক্‌নো পাতা।

সকলে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই একদিকের খোলা জমির উপরে দেখা গেল কয়েকটা অস্পষ্ট চলন্ত ছায়া। পরে পরে দশটা ছায়া। তারা এত নীরব যে, ঐ শুক্‌নো পাতাগুলো না থাকলে তাদের অস্তিত্ব কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করত না।

যে দিকে জমিদার-বাড়ি আছে সেই দিকে তারা চলে গেল একে একে।

জিতেনবাবু চুপি চুপি বললেন, "ধন্য জয়ন্তবাবু, আপনার কি সঠিক আন্দাজ! ওরা যে আবার জমিদার-বাড়ি আক্রমণ করতে আসবে, আমি তো এটা কল্পনাও করতে পারি নি।"

—"তার মানে আপনার কল্পনাশক্তি নেই।"

—"স্বীকার করছি। কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য কি?"

—"হত্যা।"

—"আবার হত্যা! কাকে?"

—"পরে বলব। এখন কথার সময় নয়। আসুন, আমরা ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি।"

—"তারপর?"

—"লোকগুলো এইবারে জমিদার-বাড়ির ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার আগেই ওদের গ্রেপ্তার করতে হবে। ঐদিকে এগিয়ে চলুন। বাজান আপনার বাঁশী!"

জিতেনবাবুর বাঁশী তীক্ষ্ণস্বরে বেজে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল বাগানের চারিধার! নানা ঝোপঝাপ, আনাচ-কানাচ থেকে আত্মপ্রকাশ করলো দলে দলে সশস্ত্র পুলিশের লোক—দিকে দিকে উঠলো দ্রুত পদশব্দ!

জয়ন্ত বললে, "টর্চ্‌গুলো জ্বেলে ছুটুন সবাই!"

রাত্রের অন্ধকারে গা-ঢেকে যারা এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছে, এই অভাবিত ও আকস্মিক আক্রমণের জন্য তারা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। অত্যন্ত হতভম্ব হয়ে কোনরকম বাধা দেবার চেষ্টা না করেই তারা বিশৃঙ্খলভাবে এদিক-ওদিক দিয়ে পলায়নের চেষ্টা করলে—

কিন্তু পালাতে পারলে না, পুলিশের বেড়াজালে তাদের বন্দী হ'তে হ'ল।

জয়ন্ত তাদের উপরে টর্চের আলো ফেলে বললে, "দেখছি এরা নয় জন। কিন্তু আমরা এদিকে আসতে দেখেছি দশটা ছায়ামূর্তিকে। আর একজন কোথায় গেল?"

হঠাৎ খানিক তফাৎ থেকে শোনা গেল রিভলভারের শব্দ এবং মানুষের আর্তনাদ।

জয়ন্ত বেগে সেই দিকে দৌড়ে গেল, তার পিছনে পিছনে সুন্দরবাবু,

জিতেনবাবু এবং মাণিকও।

বেশিদূর যেতে হ'ল না। একটা লোক ডান হাত দিয়ে বাঁ কাঁধ চেপে ধ'রে মাটির উপরে বসে আছে। সে চৌকিদার।

জিতেনবাবু বললেন, "ব্যাপার কি ?"

চৌকিদার যাতনাবিকৃত স্বরে বললে, "একজন আসামী এই দিক দিয়ে পালাচ্ছিল। আমি তাকে ধরবার চেষ্টা করি। সে আমাকে গুলি ছুঁড়ে জখম করে পালিয়ে গিয়েছে হুজুর !"

—"কোন্ দিকে গিয়েছে সে ?"

জয়ন্ত বললে, "এখন আর ও-প্রশ্ন করে লাভ নেই। পলাতককে আজ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। চলুন, আমরা ফিরে যাই।"

গোলমাল শুনে সতীশবাবুও নিচে নেমে এসেছেন। তিনি বললেন, "আজ আবার একি কাণ্ড !"

জয়ন্ত বললে, "এই অযাচিত অতিথিরা আজ আবার আপনাদের ধন্য করতে এসেছিলেন। ভাল ক'রে দেখুন দেখি, এই মহাত্মাদের কারুকে চিনতে পারেন কিনা ?"

সকলের মুখের উপরে চোখ বুলিয়ে সতীশবাবু বললেন, "এদের ত দেখছি গুণ্ডার মতন চেহারা। না মশাই, এদের কারুকে জন্মে আমি দেখি নি। এরা এ অঞ্চলের লোকই নয়।"

জয়ন্ত তাদের দিকে ফিরে বললে, "ওগো বাছারা, তোমাদের যে বন্ধুটি লম্বা দিয়েছেন তাঁর নামটি বলবে কি ?"

কেউ জবাব দিলে না।

—হ্যাঁ, বাপু বাছা বললে তোমরা যে জবাব দেবে না তা আমি জানি। যাক্, তোমাদের মুখ খোলবার উপায় পুলিশের হাতে আছে, আমাকে ভাবতে হবে না। আচ্ছা সতীশবাবু, "কাল 'আপ্' বা 'ডাউনে'র প্রথম ট্রেন এখানকার স্টেশনে কখন আসবে ?"

—"সকাল সাতটার সময়ে।"

—"উত্তম। এখন রাত সাড়ে তিনটে। ভোর হ'তে আর বেশি দেরি

নেই। সতীশবাবু, মোটর প্রস্তুত রাখুন। সকাল সাড়ে ছয়টার ভিতরে আমার সঙ্গে আপনাকে স্টেশনে গিয়ে পৌঁছতে হবে।"

—"আমাকেও! কেন?"

—"আপনি আসল অপরাধীকে সনাক্ত করবেন।"

অষ্টম

ছদ্মবেশীর পরিচয়

মদনপুর স্টেশন। সকাল সাতটার গাড়ি এখনো আসেনি।

একখানা মোটর স্টেশনের সামনে এসে থামল। গাড়ির ভিতর থেকে আগে নামল জয়ন্ত ও মাণিক, তারপর সতীশবাবু ও জিতেনবাবু। সুন্দরবাবু আসতে রাজী হন নি, কাল রাত জেগে তাঁর শরীর কাবু হয়ে পড়েছে। শয্যা আশ্রয় করার আগেই তিনি 'নোটিস' দিয়ে রেখেছেন, আজ বেলা তুটো না বাজলে কেউ যেন তাঁর নাসিকাগর্জন স্তব্ধ করার চেষ্টা না করে।

স্টেশনে ঢুকে জয়ন্ত একবার চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন ক'রে বললে, "দেখুন তো সতীশবাবু, এখানে আপনার পরিচিত কোন লোককে দেখতে পান কিনা?"

ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত ক'রে সতীশবাবু বললেন, "হ্যাঁ, জন তুয়েক চেনা লোককে দেখছি।"

—"কে কে?"

—"ঐ যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি পায়চারি করছেন। ওঁর নাম সুরেনবাবু —এখানে ডাক্তারি করেন।"

—"আর একজন কে?"

—"আমাদের প্রজা অছিমুদ্দী। পোট্‌লার পাশে উবু হয়ে ব'সে

আছে, দেখতে পাচ্ছেন ?"

কিন্তু অছিমুদ্দীকে দেখবার জন্য জয়ন্তের আর কোনই আগ্রহ হ'ল না। সতীশবাবুর হাত ধ'রে পায়ে পায়ে এগিয়ে জয়ন্ত 'ওয়েটিং রুমে'র সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ইজিচেয়ারের উপরে ব'সে একটি ভদ্রলোক কি একখানা বই পড়ছিলেন।

—"সতীশবাবু, ওঁকে চেনেন ?"

—"উঁহু। জীবনে এই প্রথম দেখলুম।"

—"বয়সে যুবক, মুখে একরাশ দাড়ি। অথচ আজকালকার যুবকরা বিশেষ ক'রে 'বয়কট্' করতে চায় ঐ দাড়িকেই। ভদ্রলোকের দাড়িটিও উল্লেখযোগ্য।"

—"কেন ?"

—"অত্যন্ত রুক্ষ আর অস্বাভাবিক। তারপর দেখুন ওঁর সাজ-পোশাক। সৌখিন, দামী জামা, কাপড়, জুতো। কিন্তু জামার একটা হাতা ছিঁড়ে গিয়েছে। কাপড় আর জুতো কর্দমাক্ত। এর কারণ কি ?"

সতীশবাবু বললেন, "কারণ উনিই জানেন, আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।"

ভদ্রলোক হঠাৎ বই থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন জয়ন্তের দিকে। তারপর এমনভাবে বইখানা উপরে তুলে ধরলেন যে, তাঁর মুখ হয়ে গেল অদৃশ্য।

জয়ন্ত বললে, "হুঁ, ভদ্রলোক চান না যে আমরা ওঁর মুখদর্শন করি। বড়ই সন্দেহজনক, বড়ই সন্দেহজনক। আর একটু নিকটস্থ হয়ে দেখতে হ'ল।"

জয়ন্ত আস্তে আস্তে 'ওয়েটিং রুমে'র ভিতর গিয়ে দাঁড়াল ; বললে, "মশাইয়ের হাতে ঘড়ি আছে দেখছি। সাতটা বাজতে আর কত দেরি?"

—"পনেরো মিনিট।"

"ওঃ, তা'হলে গাড়ি আসতে এখনো দেরি আছে। তবে এইখানেই

ব'সে একটু বিশ্রাম করা যাক্।" তারপর একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে প'ড়ে জয়ন্ত বললে, "মশায়ের যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?"

—"নরকধামে।"

—"রাগ করলেন ? না ঠাট্টা করছেন ?"

ভদ্রলোক নিরুত্তর। বই থেকে চোখ পর্যন্ত তুললেন না।

জয়ন্ত সহজ ভাবেই বললে, "নরকধামে যেতে গেলে কি ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয় ?"

—"মানে ?"

—"আপনার মুখে পরচুলের দাড়ি কেন ?"

—"আপনি তো দেখছি বড়ই অসভ্য ?" ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

জয়ন্তও উঠে দাঁড়াল। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে ক্ষিপ্র হস্তে ভদ্র-লোকের দাড়ি ধ'রে মারলে এক টান—খ'সে পড়ল পরচুলের দাড়ি।

সতীশবাবু বিপুল বিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, "একি দেখছি? চন্দ্রশঙ্করবাবু!"

চন্দ্রশঙ্কর তাড়াতাড়ি প্রস্থান করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু জয়ন্ত এক লাফ মেরে তার উপরে গিয়ে পড়ল এবং নিজের বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে তাকে সজোরে জড়িয়ে ধ'রে বললে, "মাণিক, খুঁজে দেখ, এর কাছে বোধ হয় রিভলভার আছে।"

চন্দ্রশঙ্করের জামার তলায় সত্যসত্যই পাওয়া গেল একটা রিভলভার।

জয়ন্ত বললে, "ইন্‌স্পেক্টারবাবু, চন্দ্রশঙ্করবাবুকে আমি আপনার হাতে সমর্পণ করলুম।"

চন্দ্রশঙ্কর গর্জন ক'রে বললে, "কি অপরাধে?"

—"প্রতাপনারায়ণবাবু, তাঁর স্ত্রী আর আপনার ভ্রাতা সূর্যশঙ্করকে হত্যা করার জন্যে।"

—"আপনারা কি বিনা প্রমাণেই আমাকে গ্রেপ্তার করতে চান? আপনারা কি পাগল?"

—"প্রমাণের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না চন্দ্রশঙ্কর! তোমার দলবল ধরা পড়েছে। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তাদের কেউ না কেউ 'রাজার সাক্ষী' হবে নিশ্চয়ই। জলার নরম মাটিতে অনেকগুলো পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। খুব সম্ভব তার ভিতরে তোমার পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। তারপর প্রশ্ন হচ্ছে, তোমার থাকবার কথা কলকাতায়, কিন্তু এই খুনো-খুনীর সময়ে তুমি এখানে কেন? তোমার মুখে পরচুলের দাড়ি কেন? তোমার কাছে রিভলভার কেন? আর ঐ রিভলভারই প্রমাণ ক'রে দেবে, কাল রাত্রে তুমি দলবল নিয়ে জমিদার-বাড়ি আক্রমণ করতে গিয়েছিলে।"

—"কি রকম?"

—"পালাবার সময়ে তুমি একজন চৌকিদারকে গুলী ছুঁড়ে আহত করেছ। কোন্ রিভলভার থেকে গুলি বেরিয়েছে, সেটা প্রমাণ করা একটুও কঠিন নয়।"

সতীশবাবু এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এইবারে কতকটা

আত্মস্থ হয়ে বললেন, "চন্দ্রশঙ্করবাবু, মানুষ চেনা এতই কঠিন? আপনাকে অত্যন্ত নিরীহ বলেই জানতুম। কিন্তু কি লোভে আপনি এমন মহাপাপে লিপ্ত হয়েছেন?"

জয়ন্ত বললে, "প্রতাপনারায়ণের সম্পত্তির লোভে।"

—"কিন্তু করুণা দেবী বর্তমান থাকতে সে সম্পত্তির উপরে তো আর কারুরই অধিকার নেই!"

—"আমরা কাল ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হ'লে করুণা দেবীও আজ ইহলোকে বর্তমান থাকতেন না।"

—"কি বললেন?"

—"চন্দ্রশঙ্কর কাল জমিদার-বাড়িতে গিয়েছিল করুণা দেবীকেও ইহলোক থেকে সরিয়ে দিতে।"

দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ক'রে চন্দ্রশঙ্কর বললে, "মিথ্যাকথা!"

—"আচ্ছা, সত্য-মিথ্যা নিয়ে এখন আর মস্তক ঘর্মাক্ত করবার দরকার নেই। চলুন জিতেনবাবু আমরা আসামীকে নিয়ে এইবারে থানার দিকে যাত্রা করি।"

জিতেনবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "জয়ন্তবাবু আজ আমাদের তাক্ লাগিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু মামলাটার অনেক জায়গাই এখনো পরিষ্কার হ'ল না।"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "আপাততঃ অগ্রসর হোন তো! তারপর গাড়িতে যেতে যেতে অপরিষ্কার জায়গাগুলো একেবারে পরিষ্কার খট্‌খটে করে দেবার চেষ্টা করব।"

নবম

অপরিষ্কারকে পরিষ্কার

চলন্ত মোটরে ব'সে জয়ন্ত বলতে লাগল :

"জিতেনবাবু, প্রতাপনারায়ণ নিহত হবার আগে এ-অঞ্চলে যে তিনটে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, সেগুলোর জন্যে দায়ী কে এখনো আমি সেটা জানতে পারিনি বটে, কিন্তু জমিদার-বাড়ির খুনের মামলার সঙ্গে তার যে কোন সম্পর্ক নেই এটা আমি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলুম।"

সুন্দরবাবুর দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনিও লক্ষ্য করেছিলেন, আগেকার তিনটে হত্যাকাণ্ডের সময়ে খুনী ছিল অত্যন্ত অসাবধান, ঘটনাক্ষেত্রে নিজের হাত আর পায়ের অনেক ছাপ রেখে গিয়েছিল। কিন্তু জমিদার-বাড়ির হত্যাকাণ্ডের অপরাধীরা নিজেদের কোন চিহ্নই রেখে যায়নি। এমন কি আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পরে রক্তমাখা মইখানা পর্যন্ত সরিয়ে ফেলেছিল।

এই দু'রকম কার্যপদ্ধতির ভিতরে বিভিন্ন প্রকৃতির পরিচয় খুব স্পষ্ট। এক জায়গায় দেখা যায়, ঘটনাস্থলে নিজের হাত-পায়ের ছাপ পড়ল কি পড়ল না, হত্যাকারীরা সেটা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে নি। এথেকে আরো একটা কথা প্রমাণিত হয়। খুব সম্ভব খুনী মোটেই বুদ্ধিমান নয়।

কিন্তু জমিদার-বাড়ির হত্যাকাণ্ডে অপরাধীরা রীতিমত মস্তিষ্ক-চালনা করেছে। ঘটনাক্ষেত্রে তারা নিজেদের সমস্ত চিহ্নই বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে গিয়েছে। মাটির উপর দিয়ে মই টেনে-নিয়ে-যাওয়ার যে চিহ্ন অবলম্বন ক'রে আমি জলাভূমিতে গিয়ে হাজির হয়ে সূর্যবাবুর দেহ আবিষ্কার করি, তাও তারা নিশ্চয়ই বিলুপ্ত ক'রে দিত, কিন্তু আমরা

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি জমিদার-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলুম বলে সে সময় তারা পায়নি।

এখন বুঝে দেখুন, একই হত্যাকারীর পক্ষে দুই জায়গায় দুই পদ্ধতিতে কাজ করা স্বাভাবিক কিনা? আপনারও উচিত ছিল, এটা আগেই বুঝে দেখা। অপরাধতত্ত্বের প্রত্যেক বিশেষজ্ঞই জানেন, একই অপরাধী কখনো দুই পদ্ধতিতে কাজ করে না। পাশ্চাত্য দেশের গোয়েন্দারা কত বার যে কেবল হত্যা-পদ্ধতি দেখেই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছেন, একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন।

জমিদার-বাড়ির খুনের সঙ্গে যে আগেকার ঘটনাগুলোর কোন সম্পর্ক নেই, এ-বিষয়ে যখন নিশ্চিত হলুম, তখন চেষ্টা করলুম মামলাটাকে নতুন দিক দিয়ে দেখতে।

প্রথমেই একটা সন্দেহ হ'ল। জমিদার-বাড়ির অতি-চতুর হত্যাকারী হয়ত মদনপুরের অন্যান্য রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের আড়ালে আত্মগোপন করবার ফিকিরে আছে। মোটামুটিভাবে দেখলে মনে হয়, এখানকার সব হত্যাকাণ্ডই এক রকম। হত্যার কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। হত ব্যক্তির মূল্যবান দ্রব্য হারায় না। হত্যার পর মৃতদেহ হয় অদৃশ্য।

ক্রমে আমার এই সন্দেহই দৃঢ় হয়ে উঠল। জমিদার-বাড়ির হত্যাকারী নিশ্চয়ই আগেকার খুন তিনটের সুযোগ নিয়ে পুলিশকে বিপথে চালাবার চেষ্টা করেছে। আর কেবল সেইদিকেই দৃষ্টি রেখে জমিদার-বাবু আর তাঁর স্ত্রীর দেহ ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে ফেলেছে। নইলে খুনের পর এ-রকম লাশ চুরির কোন মানে হয় না।

কিন্তু কে এই নতুন হত্যাকারী? তার আসল উদ্দেশ্য কি? এ দুটো প্রশ্নের কোন উত্তরই খুঁজে পাচ্ছিলুম না। হঠাৎ দৈব হ'ল আমার সহায়। জলাভূমির ভিতরে পাওয়া গেল সুর্যবাবুর দেহ।

সুর্যবাবুকে হত্যা করা হ'ল কেন? মাথা ঘামিয়ে একটা কারণ পেলুম এই:

আমরা যখন তদন্তে নিযুক্ত, সুর্যবাবু তখন বাড়িতেই ছিলেন। পুলিশ

এসে যে তাঁকেই খুঁজবে এটা নিশ্চয়ই তাঁর অজানা ছিল না। সে সময়ে তাঁর পক্ষে বাড়ি থেকে অদৃশ্য হওয়া অত্যন্ত সন্দেহজনক। তবু তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ির পিছন দিয়ে খিড়কীর দরজা খুলে ঠিক যেন পালিয়ে গেলেন কেন?

খুব সম্ভব আমরা যখন প্রাথমিক তদন্তে ব্যস্ত, সূর্যবাবু তখন দোতালার কোন ঘরের জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখান থেকে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, বাগানের ভিতর দিয়ে কারা চুপিচুপি একখানা মই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আরো দেখলেন, তাদের সঙ্গে আছে তাঁরই বৈমাত্রেয় ভাই চন্দ্রশঙ্কর—যার থাকবার কথা কলকাতায়!

বিপুল বিস্ময়ে দ্রুতপদে নিচে নেমে খিড়কীর দরজা খুলে সূর্যবাবু ছুটলেন তাদের পিছনে পিছনে।

তারপর বোধহয় ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম:

চন্দ্রের কাছে গিয়ে সূর্য করলেন কৈফিয়ৎ দাবি। চন্দ্র করলে সূর্যকে খুন।

অবশ্য তখন পর্যন্ত চন্দ্রনামধারী কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব আমি জানতুম না। আমার ধারণার ভিতরে ছিল অজ্ঞাতনামা হত্যাকারীরা।

পরে সতীশবাবুর মুখে শুনলুম চন্দ্রের কথা। আমাদের গোয়েন্দার মন, ধাঁ করে পেলে একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

সূর্য ও তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন প্রতাপনারায়ণের উত্তরাধিকারী। সূর্যবাবুর অবর্তমানে তাঁর সন্তানহীনা স্ত্রী পাবেন সমস্ত সম্পত্তি। তিনি পোষ্যপুত্র নিতে পারেন। নইলে তাঁর মৃত্যু হ'লে সম্পত্তি যাবে চন্দ্রের হাতে, কারণ সূর্যবাবুর আর কোন আত্মীয় নেই।

চন্দ্রের মাথায় এমন কোন শয়তানী বুদ্ধি থাকা সম্ভবপর কিনা ভাবতে লাগলুম। অন্ততঃ এটা সত্য হ'লে এই অদ্ভুত হত্যার একটা উদ্দেশ্য পাওয়া যায়।

চন্দ্র কি আগে থাকতেই স্থির ক'রে রেখেছিল যে, প্রতাপনারায়ণ ও স্ত্রীকে হত্যা করবার পরে সূর্যবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে ইহলোক থেকে

সরিয়ে দেবে? সূর্যবাবুকে হঠাৎ জলাভূমিতে পেয়ে সে তাঁকে হত্যা করেছে, তারপর সে কি আক্রমণ করবে করুণা দেবীকেও?

ব্যাপারটা প্রথমে খুব সহজ ও স্বাভাবিক ব'লে মনে হ'ল না—যদিও আমি জানি প্রথম শ্রেণীর দুরাত্মার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

আমার ধারণা সত্য হ'লে অতঃপর চন্দ্র কি করতে পারে, সেটাও আন্দাজ করবার চেষ্টা করলুম। সে নিশ্চয় সময় ও সুযোগ নষ্ট করবে না। মদনপুরে বার বার রহস্যময় ও উদ্দেশ্যহীন হত্যাকাণ্ড হচ্ছে, ক্ষেত্র প্রস্তুত। করুণা দেবীও যদি এই সময়ে নিহত হন এবং তাঁর দেহ খুঁজে না পাওয়া যায়, পুলিশের দৃষ্টি তা'হলে চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হবে না নিশ্চয়ই।

আমি ছুঁড়লুম আঁধারে ঢিল। রাত্রের অন্ধকারে চন্দ্রের উদয় দেখবার আশায় সদলবলে নিলুম বাগানের ঝোপের ভিতরে আশ্রয়। তার পরের কথা আপনারা সব জানেন।"

জিতেনবাবু চমৎকৃত হয়ে বললেন, "ধন্যবাদ জয়ন্তবাবু, বিচিত্র আপনার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা!"

সতীশবাবু বললেন, "আমি বলি, বিচিত্র ওঁর মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতা! কি বলেন মাণিকবাবু।"

মাণিক বললে, "আমি কিছুই বলি না। সোনা যে সোনা কে না তা জানে? জয়ন্ত হচ্ছে জয়ন্তই, ওকে আর নতুন সুখ্যাতি করব কি?" হাত-কড়ি প'রে চন্দ্রশঙ্কর এতক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিল। সে বললে, "একটা অসম্ভব রূপকথা শুনলুম। জয়ন্তবাবুর নামে মানহানির আর ক্ষতিপূরণের মামলা আনব।"

জয়ন্ত হেসে বললে, "উত্তম!" গাড়ি থানার সামনে এসে থামল।

একজন পুলিশ কর্মচারী সেখানে দাঁড়িয়েছিল। সে বললে, "স্যার, জলাভূমির ভিতর থেকে প্রতাপনারায়ণবাবু আর তাঁর স্ত্রীর খণ্ডবিখণ্ড দেহ পাওয়া গিয়েছে।"

দশম

কিল মারবার গোঁসাই

ছ'দিন পরের সকাল। ডাকবাংলোর বারান্দায় ব'সে জয়ন্ত, মাণিক ও সুন্দরবাবু। সামনের টেবিলে সাজানো খাবার ও পানীয়—টোস্ট, ডিম আর চা।

ছুই গ্রাসে ছুটো ডিম উদর-দেশে প্রেরণ ক'রে সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্!"

মাণিক বললে, "মানে?"

—"আমার পক্ষে ছুটো ডিম তো ছুই টিপ নস্তের সামিল। আরো গোটা-চারেক হ'লে অন্তত মন্দের ভালো হয়।"

—"কাল থেকে চায়ের সঙ্গে আপনাকে ছুটো গোটা মুর্গির রোস্ট দিতে বলব।"

—"ওটা হবে অধিকন্তু। আমি কি অতটা বাড়াবাড়ি করতে বলছি ভায়া?"

জয়ন্ত নিজের ডিমের থালাখানা সুন্দরবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, "আজ আমার ক্ষিধে নেই, আরো ছুটো ডিম আপনিই গ্রহণ করুন।"

মাণিক বললে, "আমার কিন্তু ক্ষিধে আছে। আমি জয়ন্তের মত উদার হ'তে পারব না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কে তোমার কাছে ভিক্ষে চায়?"

—"এই তো আপনি বললেন আরো চারটে ডিম ভক্ষণ করতে চান। নিশ্চয়ই আমাদের থালার দিকেই আপনার দৃষ্টি ছিল।"

—"না, কখ্খনো নয়! অন্ততঃ তোমার থালার খাবার আমার পক্ষে গোমাংস!"

—"তাহ'লে আপনি স্বীকার করছেন যে, জয়ন্তের থালার দিকে আপনার দৃষ্টি ছিল?"

মাণিকের কথা যেন শুনতে পান নি এমনি ভাব দেখিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত, আর আমার এখানে থাকবার সাধ নেই।"

—"কেন?"

—"তুমি জমিদার-বাড়ির মামলার কিনারা করেছ বটে, কিন্তু যে-জন্যে আমরা এখানে এসেছি সেই আসল মামলার তো কিছুই হ'ল না! আর কতদিন এখানে ব'সে ব'সে আজে বাজে লোকের মুখনাড়া সহ্য করব?"

—"ব্যস্ত হবেন না সুন্দরবাবু, 'শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্'।"

ঠিক এই সময়ে সেখানে এসে দাঁড়ালেন জিতেনবাবু। তাঁর মুখ-চোখ উত্তেজিত।

—"কি খবর?"

—"আবার নতুন কাণ্ড!"

— "অর্থাৎ?"

—"মদনপুরের হত্যাকারী আবার দেখা দিয়েছে!"

—"আবার খুন? লাশ উধাও?"

—"না, অতটা নয়।"

—"তবে?"

—"এবারে সে খুন করতে পারে নি।"

—"তবে সে কি করেছে?"

—"খুনের চেষ্টা।"

—"ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলুন।"

আসন গ্রহণ ক'রে জিতেনবাবু বললেন, "শুনুন। হরিহরবাবু এখানকার একজন অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ। কাল রাত্রে হত্যাকারী তাঁরই বাড়িতে গিয়ে হানা দিয়েছিল।"

—"সে যে হত্যাকারী, তার প্রমাণ কি?"

—"হরিহরবাবুর কথা শুনলে এবিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না।"

—"হরিহরবাবু কি বলেছেন?"

—"গোড়া থেকে শুনুন। জানেন তো, উপর উপরি এইসব কাণ্ডের জন্যে আজকাল মদনপুরের গৃহস্থরা রাত্রেও সজাগ হয়ে থাকে? রাত্রে কোথাও খুট ক'রে একটা শব্দ হ'লেই তারা চম্‌কে না উঠে পারে না।"

"কাল রাত প্রায় তিনটার সময়ে হঠাৎ কি-একটা উচ্চশব্দে হরিহর-বাবুর ঘুম ভাঙে। তিনি সাহসী লোক, শিকারের সখ তাঁর ষোল আনা, প্রায়ই শিকার করতে যান, বাড়িতে বন্দুকও আছে। তাড়াতাড়ি বন্দুক নিয়ে তিনি দোতালার বারান্দায় এসে দাঁড়ান।"

"চাঁদ তখন অস্তে গিয়েছিল। কিন্তু বারান্দায় জ্বলছিল একটা হারিকেন লণ্ঠন। বারান্দায় এসেই হরিহরবাবুর মনে হ'ল সিঁড়ির উপরে যেন কার পায়ের শব্দ হচ্ছে। যেন কেউ সন্তর্পণে উপরে উঠছে! শব্দ এত মৃদু যে, অন্য কেউ হলে হয়তো শুনতেই পেত না। কিন্তু হরিহরের কান হচ্ছে শিক্ষিত শিকারীর কান।"

"বারান্দার ধারে গিয়ে হরিহরবাবু সিঁড়ির দিকে করলেন দৃষ্টিপাত। লণ্ঠনের আলো সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছয় নি বটে, কিন্তু তারই আলোর আভায় সেখানকার অন্ধকার ঘন হতে পারে নি।"

"ভালো করে না হোক, আবছায়ার মত দেখা গেল, একটা মূর্তি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে ধীরে ধীরে। মনে হ'ল মানুষেরই মূর্তি, কিন্তু সে সোজা হয়ে উপরে উঠছিল না, উঠছিল হাত ও পায়ের সাহায্যে সিঁড়ির উপরে লম্বমান হয়ে! চতুষ্পদ জন্তুরা ঠিক সেইভাবে সোপান অতিক্রম করে। কিন্তু মূর্তিটা যদি মানুষ না হয়, তবে সেটা কি জন্তু তাও বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু জন্তুটা যে খুব বড়, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

"হরিহরবাবুর মনে সন্দেহ হ'ল, মূর্তিটা মানুষেরও নয়, জন্তুরও নয়—সে কোন ভৌতিক দুঃস্বপ্নের অস্পষ্ট ছায়া। তিনি সাহসী হ'লেও তাঁর বুকের ভিতরে জাগল কেমন এক অপার্থিব আতঙ্ক! তবু প্রায় আচ্ছন্ন অবস্থাতেই কোন রকমে তিনি বন্দুক তুললেন এবং ঘোড়া টিপে দিলেন।"

"বন্দুকের প্রচণ্ড চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই মূর্তিটাও গর্জন ক'রে উঠল। সে গর্জন নাকি অত্যন্ত ভয়াবহ—শুনলে বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায় বরফের মত! এবং সে-রকম গর্জন নাকি কোন মানুষেরই কণ্ঠ থেকে বেরুতে পারে না, তা হচ্ছে একেবারেই অমানুষিক।"

"মূর্তিটা বিদ্যুৎবেগে সিঁড়ির নিচের দিকে সুদীর্ঘ একটা লম্ফ ত্যাগ করলে—ধুপ ক'রে একটা শব্দ হ'ল, তারপর সব চুপচাপ।"

"রাত্রে হরিহরবাবু আর নিচে নামতে ভরসা করেন নি, তবে এটুকু বুঝতে পারলেন, লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছে।"

"আজ খুব ভোরে উঠে নিচে নেমে তিনি দেখেছেন, তাঁর বাড়ির সদর দরজা খোলা—কার প্রচণ্ড ধাক্কায় তার খিল গিয়েছে ভেঙে।"

"এই তো ব্যাপার জয়ন্তবাবু, এখন এই ঘটনা থেকে আমরা কি বুঝব?"

জয়ন্ত ধীরে ধীরে বললে, "একটা কথা বেশ বোঝা যাচ্ছে।"

—"কি?"

—"মূর্তিটা পালিয়ে গেছে বন্দুকের ভয়ে।"

—"তা থেকে কি প্রমাণিত হয়?"

—"প্রমাণিত হয়, সে আগ্নেয় অস্ত্রের মহিমা জানে।"

—"কিন্তু এ প্রমাণ পেয়ে আমাদের লাভ কি? আমরা জানতে চাই সে মানুষটা জন্তু না ভূত?"

—"ভূতের কথা বাদ দিন। ভূত বন্দুক বা কামানকে ভয় করবে কেন? যারা ভূত মানে, তারা তো বলে—ভূত হচ্ছে অশরীরী।"

—"মানলুম সে ভূত নয়, কিন্তু তবু তো হালে পানি পাচ্ছি না।"

—"আমি অথই জলে।"

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে বললেন, "বাব্বাঃ! এই ডাকবাংলোর চারিদিকেই মাঠ আর জঙ্গল! কোন্ দিন হয়তো এর ওপরেই সেই না-মানুষ না-জন্তুটার দৃষ্টি পড়তে পারে! জানলা-দরজার বাধা তার কাছে বাধাই নয়! আমি যে কি করব বুঝতেই পারছি না—হুম্!"

মাণিক বললে, "উপবাস ক'রে রোগা হবার চেষ্টা করুন সুন্দরবাবু! শুনেছেন তো, ঐ মূর্তিটার লোভ হচ্ছে মানুষের দেহেরই উপরে? আপনার এই একটিমাত্র নধর দেহ, মাংস আছে তিন-তিনটে নরদেহের মতন। আপনার দেহ একবারমাত্র নিরীক্ষণ করলে মূর্তিটার জঠরানল জ্ব'লে উঠতে পারে দাউ দাউ ক'রে।"

সুন্দরবাবু বললেন "থামো বাপু, তুমি আর ফোড়ন দিও না! ভাত দেবার কেউ নন, কিল মারবার গোঁসাই। তুমি হ'চ্ছ তাই!"

জয়ন্ত আর কোন কথাই বললে না, কি যেন ভাবতে লাগল অত্যন্ত গম্ভীর মুখে।

একাদশ

ভাঙা কুলো নিয়ে টানাটানি কেন

দিক-কয় সব চুপচাপ। মদনপুরের হত্যাকারীর আর কোন পাত্তাই নেই।

কেউ কেউ বললে, "হরিহরবাবুর বন্দুকের গুলিতে সে আহত হয়েছে।"

কিন্তু হরিহরবাবু সে কথা মানেন না। বলেন, "সে জখম হ'লে ঘটনাস্থলে রক্তের দাগ থাকত। আমার গুলি তার গায়ে লাগেনি। তবে বন্দুকের ধমক খেয়ে সে বোধ হয় ভয় পেয়েছে, হয়তো কিছুকাল আর এ পথ মাড়াবে না।"

হত্যাকারী দেখা দিক্ আর নাই-ই দিক্, কিন্তু যে-রহস্য, সেই-রহস্যই থেকে গেল! কেন সে অকারণে এমন খুন আর লাশ চুরি করতে চায়? সে কে? কোথা থেকে আসে? কোথায় অদৃশ্য হয়?

মাঝে মাঝে মনে হয় সে হচ্ছে নরখাদক হিংস্র জন্তু। মুণ্ডহীন দুটো মৃতদেহের কণ্ঠদেশে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নেই, কিন্তু ধারালো দাঁতের দাগ পাওয়া গিয়েছে। হরিহরবাবু তাকে চতুষ্পদ জন্তুর মত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে

দেখেছেন। তার গর্জন যারাই শুনেছে তারাই বলেছে, অমানুষিক।

কিন্তু ঘটনাস্থলে পাওয়া যায় জন্তুর নয়—মানুষের হাত-পায়ের দাগ। সে গায়ের জোরে দরজা ভেঙে বা জানলার লোহার গরাদে দুম্‌ড়ে বার ক'রে নিয়ে লোকের বাড়িতে ঢোকে। নরখাদক জন্তুরা এ ভাবে গৃহস্থের বাড়িতে হানা দিয়েছে ব'লে শোনা যায় না।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন মানুষ কে আছে, দাঁত দিয়ে কামড়ে যে নর-মুণ্ডকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে?

এই অদ্ভুত হত্যাকারীর মনুষ্যত্ব বা পশুত্ব—দুই-ই প্রমাণ করবার উপায় নেই। তাকে ভূত ব'লে মানলে অনেকগুলো প্রশ্নের নিশ্চিত বা অনিশ্চিত উত্তর পাওয়া যায়, কারণ প্রেতের আকৃতি বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কারুর কোন সঠিক ধারণা নেই। ভূতের মূর্তি নাকি যে-কোনরকম হ'তে পারে আর সে নাকি করতে পারে যে কোনরকম অলৌকিক কাজ।

কিন্তু বেশি লোকের ভিড় দেখলে বা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করলে টেনে লম্বা দেয়, কে কবে শুনেছে এমন ভীরু ভূতের কথা?

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্। মাথাকে অনেক খাটিয়ে আর ঘামিয়ে আমি একটা সিদ্ধান্তে এসে হাজির হয়েছি।"

মাণিক বললে, "বলেন কি?"

"আমি তোমাকে কিছুই বলছি না। আমার বক্তব্য আমি জয়ন্তকে শোনাতে চাই।"

জয়ন্ত বললে, "শোনান।"

—"মানুষ হয়েও জন্তুর মতন ব্যবহার করতে পারে কে?"

—"পাগল।"

—"ঠিক। এ সব হচ্ছে কোন ভীষণ উন্মত্তের কীর্তি।"

—"ও কথা এক একবার আমারও মনে হয়েছে, কিন্তু ওর উপরে আমি কিছুতেই জোর দিতে পারছি না।"

—"কেন?"

—"এই-সব হত্যাকাণ্ডে যুক্তি না থাকতে পারে, কিন্তু পাগ্‌লামিরও

কোন লক্ষণ নেই।"

—"কি-রকম?"

—"প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হত্যাকারী একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করেছে। পাগল কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতির ধার ধারে না।"

সুন্দরবাবু চুপ করে রইলেন।

মাণিক বললে, "সুন্দরবাবু, অকারণেই আপনার মাথা খেটে আর ঘেমে মরল—আহা, বেচারী! আসুন, পাখার বাতাস দিয়ে তাকে একটু ঠাণ্ডা করি!"

মাণিক পাখার দিকে হাত বাড়ালে, রেগে গস্‌গস্‌ করতে করতে ঘরের বাইরে চলে গেলেন সুন্দরবাবু।

একজন চৌকিদার এসে জয়ন্তের হাতে দিলে একখানা চিঠি।

জিতেনবাবু লিখেছেন:

"জয়ন্তবাবু,

গত রাত্রে আবার হত্যাকারীর আবির্ভাব হয়েছিল। এবারে সে খালি হাতে ফিরে যায় নি—আবার এক হতভাগ্য মারা পড়েছে আর তার দেহ হয়েছে অদৃশ্য।

এখনি আমি ঘটনাস্থলে যাত্রা করব। আমার সঙ্গে যাবার জন্যে আপনাদেরও আহ্বান করছি। ইতি।"

পত্র পাঠ ক'রে জয়ন্ত বললে, "যাক্‌, এবারে আর পরের মুখে ঝাল খেতে হবে না।"

মাণিক বললে, "এ কথা কেন বলছ?"

—"মদনপুরের হত্যাকারী প্রথম যে তিনটে খুন করেছিল, তার কাহিনী আমরা পাঠ করেছি খবরের কাগজে। বাকি কথা শুনেছি পুলিশের মুখে। আমরা ঘটনাস্থল হাতে-নাতে পরীক্ষা করবার সুযোগ পাইনি। ঘটনাস্থলের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলে গোয়েন্দাকে কাজ করতে হয় অন্ধের মত। আর ঘটনার অনেকদিন পরে ঘটনাস্থলে গেলেও বিশেষ কোন ফল হয় না। এই জমিদার বাড়ির মামলাটাই দেখ।

আমরা যদি যথাসময়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির না হতুম, তা'হলে কোন সূত্রই দেখতে পেতুম না, অপরাধীও হয়তো ধরা পড়তো না, চন্দ্রশঙ্কর হ'ত আজ প্রতাপনারায়ণের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।"

—"তা'হলে এবারে তুমি অন্ধ রাত্রির পর সূর্যোদয় দেখবার আশা করছ?"

—"অতটা না হোক্, একটা কিছু আশা করছি বটে। নাও, এখন ওঠ। সুন্দরবাবুকে ডাকো।"

— "সুন্দরবাবু! অ সুন্দরবাবু!"

বারান্দা থেকে কর্কশ জবাব এল—"বাক্যি-বাণে জ্বালিয়ে মেরে আবার আমাকে ডাকাডাকি কেন?"

—"আরে মশাই, আবার একটা খুন হয়েছে। আমাদের এখনি ঘটনাস্থলে যেতে হবে।"

—"তা যাওনা তোমরা। আমার মত ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোকে নিয়ে টানাটানি কেন।"

—"বাপরে, তাও কি হয়? আপনি সঙ্গে না থাকলে আমাদের ঘটে বুদ্ধি সরবরাহ করবে কে? আসুন আসুন, ক্রোধ সম্বরণ করুন।"

—"হুম্।"

দ্বাদশ

রক্তচিহ্নের অনুসরণ

ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে জিতেনবাবু বললেন, "এবারে খুন হয়েছে এক বিদেশী ভিখারী। কাল সন্ধ্যার সময়ে সে এক গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা চেয়ে কিছু খাবার পায়। তাই খেয়ে সেই বাড়িরই বাইরেকার রোয়াকে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। সকলে তাকে সেখানে শুতে মানা করে, বিপদের কথাও বলে। সে কিন্তু কারুর মানা মানেনি।

বোধ হয় ভেবেছিল, মিথ্যা ভয় দেখিয়ে সকলে তাকে সেখান থেকে তাড়াবার ফিকিরে আছে।"

—"তারপর ?"

—"গভীর রাত্রে বিকট আর্তনাদে বাড়ির সকলের ঘুম যায় ছুটে।" একটা মানুষ চিৎকার করে বলছে—"রক্ষা কর, রক্ষা কর!" তারপরই শোনা গেল একটা জন্তুর হিংস্র গর্জন। তারপর মানুষ বা জন্তু আর কারুরই সাড়া পাওয়া গেল না। বাড়ির একজন লোক কৌতূহল দমন করতে না পেরে ছাদে গিয়ে উঠল। কাল চতুর্দশীর রাত গিয়েছে—চারিদিকে ছিল ধব্‌ধবে চাঁদের আলো। লোকটি ছাদের ধারে গিয়ে দেখলে, খানিক তফাতে একটা মিশ্‌-কালো চতুষ্পদ জন্তু মানুষের দেহের মত কি-একটা জিনিস মুখে ক'রে কাম্‌ড়ে ধ'রে মাটির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।"

—"সেটা কি জন্তু ?"

—"চাঁদের আলো ছিল বটে, কিন্তু দূর থেকে জন্তুটাকে চেনা যায় নি।"

—"জন্তুটা কত বড়, তাও বোঝা যায়নি ?"

—"এইটুকু শুনেছি, জন্তুটা নাকি চিতাবাঘের চেয়ে ছোট নয়।"

—"সে চার পায় ভর দিয়ে যাচ্ছিল ?"

—"হ্যাঁ। কিন্তু এও শুনলুম, চিতাবাঘ যেমন ক'রে হাঁটে তার হাঁটুনি নাকি তেমনধারা নয়।"

—"তারপর ?"

—"তারপর আর বলবার কথা বেশি নেই। জন্তুটা চ'লে যায় মদন-পুরের পুব-প্রান্তরের দিকে।......এই আমরা ঘটনাস্থলে এসে পড়েছি। এই বাড়ির ঐ রোয়াকের উপরেই ভিখারীটা শুয়েছিল। দেখুন জয়ন্ত-বাবু, রোয়াকের উপরে আর তলায় কত রক্ত জমাট বেঁধে আছে। এই দেখুন হত্যাকারীর হাতের আর বিকৃত পায়ের ছাপ।"

—"এ তো জন্তুর হাত-পায়ের চিহ্ন নয়।"

"না, মানুষের। এই দাগগুলোই তো আমাদের মাথা একেবারে গুলিয়ে দিয়েছে। দেখা দেয় জন্তু, গর্জন করে জন্তু, কিন্তু রেখে যায় মানুষের হাত-পায়ের ছাপ। এ কি রকম অলৌকিক কাণ্ড!"

জয়ন্ত মাটির উপরে হেঁট হয়ে প'ড়ে একমনে হাত ও পায়ের চিহ্ন-গুলো পরীক্ষা করতে লাগল।

সুন্দরবাবু আর একবার মাথা খাটাবার এবং ঘামাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "জয়ন্ত!"

—"আজ্ঞে।"

—"আমার কি সন্দেহ হয় জানো?"

—"কি?"

—"কোন মানুষই জন্তুর ছদ্মবেশ প'রে আর জন্তুর মত হেঁটে এই সব খুন করছে।"

—"কেন?"

—"পুলিশের চোখে ধুলো দেবে ব'লে, আবার কেন?"

—"মানলুম। কিন্তু মৃতদেহগুলো নিয়ে সে কি করে বলুন দেখি? সে টাকাকড়ি চায় না, তার লোভ কেবল মৃতদেহের উপরে। কেন?"

সুন্দরবাবু জবাব খুঁজে পেলেন না।

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "জিতেনবাবু, কাল যিনি জন্তুটাকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তিনি এখানে হাজির আছেন?"

পুলিশের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জনতার সৃষ্টি হয়েছিল। জিতেনবাবুর ইঙ্গিতে একটি ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন।

জয়ন্ত সুধোলে, "আপনি কাল যে জন্তুটাকে দেখেছিলেন সেটা চিতাবাঘের মত বড়, কিন্তু চিতাবাঘ নয়?"

—"আমার তো তাই বিশ্বাস।"

—"এমন বিশ্বাসের কারণ?"

—"তার চালচলন চিতাবাঘের মতন নয়।"

—"আপনি চিতাবাঘ দেখেছেন?"

—"অনেকবার।"

—"কোন কোন জাতের কুকুরও চিতাবাঘের মত বড় হয় জানেন?"

—"জানি। কিন্তু সে জন্তুটা কুকুরও নয়।"

—"তবে সেটা কি হ'তে পারে?"

—"জানি না। আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাইনি।"

—"তার ল্যাজ আছে?"

—"থাকতে পারে, কিন্তু আমি দেখিনি।"

—"সে এখান থেকে কত দূরে ছিল?"

হাত তুলে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "ঐখানে।"

যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত মাটির দিকে তাকিয়ে বললে, "ধুলোর উপর দিয়ে একটা রক্তাক্ত দেহ টেনে নিয়ে যাওয়ার স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। এই চিহ্ন ধ'রে যে-কোন শিশুও অগ্রসর হ'তে পারে। আসুন সবাই, আমরাও অগ্রসর হই। দেখা যাক্ জন্তুটা কোথায় গিয়েছে!"

রক্তাক্ত দেহ টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ মদনপুরের প্রান্ত ছাড়িয়ে প্রান্তরের উপরে গিয়ে পড়ল। তারপর সেই দাগ চলে গিয়েছে পূর্ব-দক্ষিণের অরণ্যের দিকে! সকলে জয়ন্তের পিছনে পিছনে অরণ্যের দিকে এগিয়ে গেল।

অরণ্য। সেখানেও রক্তের দাগ। আরো খানিক এগিয়ে দেখা গেল, দাগটা প্রবেশ করেছে মস্ত একটা ঝোপের ভিতরে।

জয়ন্ত বাহির থেকেই ঝোপটার ভিতরে উঁকিঝুঁকি মারলে। ঝোপের উপরে হাতের লাঠি দিয়ে বার-কয়েক আঘাত করলে।

জিতেনবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "আপনি কি মনে করেন জন্তুটা ঐ ঝোপের ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে?"

—"তাই মনে করছিলুম বটে। কিন্তু সে এখানে নেই। আপনারা এইখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি আগে ঝোপের ভিতরটা দেখে আসি।"

মাণিক বললে, "কিন্তু খুব সাবধান!"

জয়ন্ত হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। মিনিটখানেক পরে আবার ঝোপের বাইরে ফিরে এল সেই ভাবেই। মুখ তার গম্ভীর।

মাণিক বললে, "কি দেখলে?"

—"বীভৎস দৃশ্য?"

—"হ্যাঁ। ঝোপের ভিতরে রয়েছে একটা আধখান-খাওয়া মানুষের দেহ। এদিকে-ওদিকে ছড়ানো আছে মাংসহীন হাড়ের টুকরো আর নাড়ীভুঁড়ি। জন্তুটা এখানে নেই।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, ঐ জন্তুটা মানুষ মারে মাংস খাবার জন্যে?"

জিতেনবাবু ঝোপের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, জয়ন্ত বললে, "ওদিকে যাবেন না।"

—"কেন?"

—"সেই জন্তু বা কিম্ভূতকিমাকার জীবটা আবার ঐ ঝোপে ফিরে আসবে।"

—"কি ক'রে জানলেন?"

—"ধরুন বাঘের কথা। কোন জীব বধ করে একদিনে সে তার সবটা খেতে পারে না। বাকি অংশটা পরে খাবে বলে ঝোপঝাপের ভিতরে লুকিয়ে রেখে যায়। আমার বিশ্বাস এই জন্তুটাও তাই করেছে। এখানে যখন আধখানা খাওয়া মৃতদেহ লুকিয়ে রেখে গিয়েছে, সে আবার এখানে আসবে—খুব সম্ভব আজ রাত্রেই। আমি চাই ঝোপের ভিতরটা যেমন আছে তেমনি থাক্। সে যেন সন্দেহ করতে না পারে ওখানে বাইরের কেউ এসেছিল।"

—"এখন আমাদের কি কর্তব্য?"

—"ঝোপের পাশেই রয়েছে ঐ প্রকাণ্ড বটগাছটা। তাড়াতাড়ি লোকজন নিয়ে এসে, জনচারেক মানুষ বসতে পারে এমন একটা মাচান্ তৈরী ক'রে ফেলুন ঐ গাছের ডালে।"

—"আজ আমাদের ঐখানেই রাত্রিবাস করতে হবে নাকি?"

—"নিশ্চয়ই। ঐ জন্তুটা কি, তা জানতে পারলেই মদনপুরের সমস্ত

হত্যারহস্য পরিষ্কার হয়ে যাবে।”

সুন্দরবাবু বিড়্ বিড়্ ক'রে বললেন, “সারলে রে! জয়ন্ত আমাকেও দেখছি ছাড়বে না। আমার এই বিপুল বপু, আর ঐ উঁচু গাছের মচ্‌মচে মাচান্! সর্বনাশ, হুম্!”

ত্রয়োদশ

আলোকমণ্ডলে অপচ্ছায়া

পূর্ণিমার রাত্রি।

মদনপুরের ধু-ধু প্রান্তর ভেসে যাচ্ছে আজ জ্যোৎস্নার বন্যায়, সেখান দিয়ে যেন যে-কোন মুহূর্তে সাদা ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে পারে রূপকথার পরমসুন্দর রাজকুমার।

কিন্তু তারই প্রান্তে দেখা যাচ্ছে যে বিশাল অরণ্য, তার মধ্যে ঢুকলে পূর্ণিমাকে আর পাওয়া যায় না পরিপূর্ণ রূপে। তবে সেখানেও দেখা যায় আর এক রূপের ছবি। সেখানে চন্দ্রকিরণ খেলে অন্ধকারের সঙ্গে লুকোচুরি। সেখানে আলো আর আঁধার দেখায় যেন আশা আর নিরাশার ছন্দ।

কিন্তু সেখানে খালি রূপের ছবি নয়, কানের কাছে ধরা দেয় যে অভাবিত শব্দময় জগৎ, তার সঙ্গে সঙ্গীতের সম্পর্ক অল্প। সাপ করে ফোঁশ্-ফোঁশ্, হিংস্র জন্তু করে বুভুক্ষু চিৎকার, আক্রান্ত জীব করে অন্তিম আর্তনাদ।

যেখানেই অন্ধকার সেখানেই মনে হয়, ভয়াবহ মৃত্যুদূতরা গোপনে ব'সে ষড়যন্ত্র করছে জীবনের বিরুদ্ধে। তার উপরে আছে গহন রাত্রির রোমাঞ্চকর, রহস্যময় ভাষা, যা কানে শোনা যায় না, অনুভব করতে হয় প্রাণে প্রাণে।

বটগাছের মাচানের উপরে আছে চার মূর্তি—জয়ন্ত, মাণিক, জিতেন-বাবু ও সুন্দরবাবু।

কারুর মুখেই টুঁ-শব্দটি নেই। প্রত্যেকেই ব'সে আছে স্থির পাথরের পুতুলের মত। প্রত্যেকেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ নীচেকার মস্ত ঝোপের দিকে। যে-কোন সময়ে ওখানে যে আশ্চর্য দৃশ্যের অবতারণা হ'তে পারে তার জন্যে যেন রুদ্ধশ্বাসে প্রস্তুত হয়ে আছে সকলেই।

এইভাবে কেটে গেছে প্রায় তিন ঘণ্টা।

সুন্দরবাবুর মনে হয়েছে এই তিন ঘণ্টা যেন তিন যুগ। এখানে আছে আবার সেই পাজীর-পা-ঝাড়া মশার দলের সঙ্গে নতুন নতুন জাতের অজানা কীটপতঙ্গ। তাদের অনেকেই কামড়ায় তো বটেই, তার উপরে আবার সুবিধা পেলে নাক আর কানের ছ্যাঁদায় ঢুকে পড়তেও ছাড়ে না। কানে পোকা ঢুকলে কান ভোঁ-ভোঁ করে বটে, বাইরে তা শোনা যায় না। কিন্তু নাকের ভিতরে কেউ অনধিকার প্রবেশ করলে মানুষ কি না হেঁচে কিংবা সশব্দে ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ না ক'রে থাকতে পারে? এরই মধ্যে সুন্দরবাবু তিনবার জোরে হেঁচে ফেলেছেন এবং সশব্দে ফ্যাচ্-ফোচ করেছেন অন্ততঃ বার ছয়েক।

নীচের ঝোপটার উপরে এতক্ষণ খানিকটা চাঁদের আলো জেগে ছিল, এখন তা স'রে গেল ধীরে ধীরে। ঝোপটা এখনো দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।

হঠাৎ ছুটো ছোট জানোয়ার সভয়ে শুক্‌নো পাতা মড়মড়িয়ে বেগে পালিয়ে গেল।

—জয়ন্ত ভাবতে লাগল, ওরা পালিয়ে গেল কাকে দেখে?

প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল অবিলম্বেই। কিছু দূরে ছিল চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল খানিকটা জায়গা। আচম্বিতে সেই আলোকমণ্ডলের ভিতর দিয়ে মূর্তিধারী জীবন্ত অভিশাপের মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কি-একটা বৃহৎ জন্তু প্রচণ্ড তীব্রগতিতে বড় ঝোপটার দিকে ছুটে এল।

ঝোপ থেকে একটু তফাতে এসে মূর্তিটা যে স্থির হয়ে দাঁড়াল,

এটুকুও বেশ বোঝা গেল।

ছুটো কট্‌মটে, বন্য ও দপ্‌দপে চক্ষু বটগাছের উপরদিকে তাকিয়ে আছে! তার দেহ প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু দৃশ্যমান জ্বলন্ত চক্ষু!

জয়ন্ত বুঝলে, জন্তুটা তাদের আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে। সে তাড়াতাড়ি বন্দুকটা তুলে ধরলে।

জন্তুটা একবার চাপা গর্জন করলে, তারপর একলাফ মেরে ফিরে আবার সেই আলোকমণ্ডলের ভিতর দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে তীর বেগে!

জয়ন্ত এরই জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। তার বন্দুক হুঙ্কার দিয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ—এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা আকাশ-ফাটানো বন-কাঁপানো অমানুষিক চীৎকার ক'রে জন্তুটা মাটির উপরে আছড়ে পড়ল। দু-একবার ছট্‌ফট্‌ করলে, তারপরেই একেবারে আড়ষ্ট।

আরো নিশ্চিন্ত হবার জন্যে জয়ন্ত তার নিশ্চেষ্ট দেহ লক্ষ্য ক'রে আবার একবার বন্দুক ছুঁড়লে। কিন্তু মূর্তি আর নড়ল না।

জয়ন্ত গাছ থেকে নামতে নামতে বললে, "জিতেনবাবু, আপনারাও আসুন!"

সবাই আলোকমণ্ডলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সকলেরই দৃষ্টি বিপুল বিস্ময়ে স্তম্ভিত। ওটা কিসের মূর্তি? মানুষের না জন্তুর?

'টর্চে'র আলোতে দেখা গেল, তার সর্বাঙ্গ মানুষের মতন বটে, কিন্তু মনুষ্যত্ব নাই তার কোথাও। সমস্ত দেহটাই লম্বা লম্বা কালো লোমে আচ্ছন্ন, মাথায় জট-পাকানো দীর্ঘ, রুক্ষ চুল, কর্কশ ও বৃহৎ দাড়ী-গোঁফে মুখখানা প্রায় ঢাকা। বোজা চোখদুটো দেখা যাচ্ছিল না। নাসারন্ধ্র অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত। পশুভাবপূর্ণ পুরু পুরু ফাঁক-করা ওষ্ঠাধরের ভিতর থেকে বড় বড় হিংস্র ও বিবর্ণ দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে—পৃথিবীর কোন মানুষেরই দাঁত ও-রকম হয় না। হাতের ও পায়ের আঙুলেও অত্যন্ত লম্বা ও ধারালো নখ। পায়ের চেটোও বিকৃত—এ-রকম পা নিয়ে কেউ মানুষের মতন সোজা হয়ে মাটির উপর দিয়ে হাঁটতে পারে না।

এ যেন অর্ধ-মানব ও অর্ধ-পশুর দেহ।

সকলের আগে কথা কইলে মাণিক। বললে, "গুলি খেয়ে এই মূর্তিটা যখন চেঁচিয়ে উঠেছিল, তখন আমার মনে হয়েছিল, যেন একটা নেক্ড়ে-বাঘ চীৎকার করছে!"

জয়ন্ত বললে, "ঠিক বলেছ মাণিক! আমারও বিশ্বাস, এ হচ্ছে নেক্ড়ে-মানুষ!"

জিতেনবাবু বললেন, "নেক্ড়ে-মানুষ আবার কি?"

—"নেক্ড়ে-বাঘের দ্বারা পালিত মানুষ।"

—"তাও আবার হয় নাকি?"

—"এদেশের সংবাদপত্রে—এমন কি মাসিক পত্রিকাতেও এই রকম সব নেক্ড়ে-মানুষের বিবরণ আর ছবি বারকয়েক প্রকাশিত হয়েছে। একটি নেক্ড়ে-মানুষের ফটোও আমার কাছে আছে। তবে সে পুরুষ

নয়, মেয়ে। রঁাচি অঞ্চলের বনে তাকে পাওয়া যায়। এক পাদ্রীসাহেব তাকে পালন করেন।”

—“আশ্চর্য ব্যাপার!”

—“কিছুই আশ্চর্য নয়। হয়তো নেকড়ে-বাঘিনীর বাচ্ছাগুলো কোন গতিকে মারা গিয়েছিল; তারপর খুব শিশু অবস্থায় এই মানুষটাকে সে চুরি ক'রে নিয়ে যায়—নেকড়েদের মনুষ্য-শিশু চুরি করার বদ-অভ্যাসও আছে। তারপর যে কোন কারণেই হোক্ নেকড়ে-মায়ের প্রাণে মায়া বা স্নেহের উদ্রেক হয়, শিশুকে সে বধ না ক'রে প্রথমে নিজের দুগ্ধ দিয়ে, পরে শিকার-করা জীবজন্তু খাইয়ে পালন করে। নেকড়েদের সঙ্গে থেকে থেকে এই মানুষটাও ক্রমে নেকড়ে-ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। আফ্রিকায় এক-বার একটি মানুষের মেয়েকে পাওয়া গিয়েছিল, তাকেও শিশু-বয়সে চুরি ক'রে পালন করেছিল গরিলারা, আর তারও প্রকৃতি হয়ে গিয়েছিল গরিলাদেরই মত। এই মাসকয়েক আগেই সংবাদপত্রে আর মাসিক-পত্রিকায় একটি হরিণ-মানুষের ছবি আর বিবরণ বেরিয়েছে, আপনারা দেখেন নি? সে বাস করত বনের হরিণদের সঙ্গে, হঠাৎ ধরা পড়েছে বলেই আমরা তার কথা জানতে পেরেছি।”

জিতেনবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, “অদ্ভুত এই পৃথিবীর রহস্য, আমরা কতটুকু খবরই বা রাখতে পারি? যাক্, নেকড়ে-মানুষ আর ইহ-লোকে নেই, মদনপুরের বাসিন্দারা এইবারে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।”

সুন্দরবাবু বললেন, “আমিও বাঁচলুম! আর আগ-ডালে মগ-ডালে মাচানে ব'সে কীট-পতঙ্গের খোরাক হ'তে হবে না—বাব্বাঃ!”

মাণিক বললে, “আবার ‘বাব্বাঃ’ কেন সুন্দরবাবু? আপনার সুবিখ্যাত ‘হুম্’ শব্দটি উচ্চারণ ক'রে এখন ‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’ করতে আজ্ঞা হোক্।”

সুন্দরবাবু হাসতে হাসতে বললেন—“অবশ্য, অবশ্য! হুম্।”

সুন্দরবনের রক্তপাগল

প্রথম

সুন্দরবনে সুন্দরবাবু

বিশাল অরণ্য-সাম্রাজ্য! তরঙ্গিত শ্যামলতার মহাসাগর!

দুর্ভেদ্য জঙ্গলের প্রাচীর—তার ভিতর দিয়ে যাতায়াতও করতে পারে না মানুষ। আবার ইচ্ছা থাকলেও মানুষ এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আনাগোনা করতে ভরসা করে না, কারণ এ হচ্ছে মহা বিপদজনক স্থান। এখানকার প্রধান বাসিন্দা হচ্ছে 'রয়েল বেঙ্গল' ব্যাঘ্র এবং তার উপর আছে 'বয়ার' বা বন্য মহিষ—তারাও এমন হিংস্র যে শিকারীরা তাদের বাঘের চেয়ে কম ভয় করে না। আর আছে পাঁচ-ফুট লম্বা ও তিন-ফুট উঁচু তীক্ষ্ণদন্তধারী ভীষণ বন্য-বরাহ। মাঝে মাঝে আজও গণ্ডারের দেখা পাওয়া যায়। প্রতি পদেই এখানে সর্পভয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অজগর তো আছেই এবং সেই সঙ্গে আছে এত জাতের বিষধর সর্প, পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় না যাদের তুলনা। তাদের নামও কত-রকম! ধনীরাজ, দুধরাজ, পাতরাজ, মণিরাজ, ভীমরাজ, মণিচূড়, শঙ্খচূড়, শাঁখামুঠি, নাগরচাঁদ, গোখুরা ও কেউটে প্রভৃতি। এদের প্রত্যেকেরই দংশন হচ্ছে মারাত্মক। কাজেই মানুষ নিতান্ত দায়ে না পড়লে এই ভয়াবহ অরণ্যের ত্রিসীমানায় আসতে রাজি হয় না।

এই বিপুল অরণ্য ভেদ ক'রে যেখান-সেখান দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে বড়, মাঝারি ও ছোট নদ আর নদী এবং খাল আর নালা। সাধারণত এই জলপথের সাহায্যেই মানুষ কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে আনাগোনা করতে পারে। কিন্তু এই জলপথও কিছুমাত্র নিরাপদ নয়। কারণ, নৌকো থেকে নত হয়ে হস্ত-প্রক্ষালনের জন্যে তুমি যদি একবার জলস্পর্শ করবার চেষ্টা কর, তা'হলে পর-মুহূর্তেই হয়তো নৌকার উপর থেকে

একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এখানকার প্রত্যেক নদীতে বাস করে অসংখ্য বড় বড় কুমীর। সর্বদাই তারা সচেতন হয়ে আছে, কখন তোমাকে নিজের কবলগত করবার সুযোগ পাবে ব'লে।

অরণ্যের মাঝে মাঝে আছে ছোট বড় মাঠ আর জলাভূমি। সে-সব জায়গায় গিয়ে কবিত্ব প্রকাশ করবার কোন উপায়ই নেই। দেখতে সুন্দর হ'লেও সেখানকার বাতাস পর্যন্ত বিষাক্ত।

অরণ্যের মধ্যে যেখানে-সেখানে দেখা যায় 'সুন্দরী' গাছের ভীড়। তাদের আকার সুদীর্ঘ, সুকঠিন কাঠের রং লাল। পাতা ছোট ছোট, পাতাগুলির উপরদিক খুব তেলা ও নিচের দিকের রং ধূসর। এ-বনে গাছ আছে আরো অনেক জাতের, তাদের অনেকের নামও বেশ বিচিত্র। যথা—ধোন্দল, গেঁয়ো, বাইন্, কেওড়া, বলা, গরান্, হেন্তাল, গর্জন, গাব ও বনঝাউ। এখানে গোলপাতা ও হোগ্লাও দেখা যায় যেখানে-সেখানে।

বলা বাহুল্য, এই পৃথিবীবিখ্যাত অরণ্যের নাম—সুন্দরবন। দক্ষিণ-বাংলা বলতে বোঝায় এই অতি-ভীষণ সুন্দরবনকেই।

এই অরণ্যের যেখানে সমাপ্তি সেইখান থেকে আরম্ভ হয়েছে অনন্ত সাগরের চিরন্তন উচ্ছ্বাস।

এই সুন্দরবনের একটি অবৃহৎ নদীর ভিতর দিয়ে চারিদিকের নীরবতাকে শব্দিত ক'রে ছুটে চলেছে একখানি মোটর-বোট। তখন সন্ধ্যাবেলা—যদিও পূর্ণিমার চাঁদকে দেখে অন্ধকার সেদিন বেরিয়ে আসতে পারেনি বনের ভিতর থেকে। বোটের এখানে-সেখানে ব'সে রয়েছে কয়েকজন দীর্ঘাকার বলবান ব্যক্তি, উর্দি না থাকলেও তাদের দেখে বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, তারা পুলিশ-ফৌজের অন্তর্গত।

মোটর-বোটের ভিতর ব'সে আছেন এক ব্যক্তি, তাঁর পরনে ছিল উচ্চতম পুলিশ-কর্মচারীর মার্কা-মারা পোশাক। তিনি টুপিটি খুলে রেখেছিলেন ব'লে দেখা যাচ্ছে, তাঁর সারা মাথাটি জুড়ে বিরাজ করছে প্রকাণ্ড একটি টাক। এবং তেমনি প্রকাণ্ড তাঁর ভুঁড়িটি, এমন হৃষ্টপুষ্ট

দোদুল্যমান ভুঁড়ি কোন পুলিশ-কর্মচারীর দেহেই শোভা পায় না। বোটের ভিতরে ব'সে তিনি এদিকের ও ওদিকের গবাক্ষ দিয়ে নদীর দুই তীরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করছিলেন বারংবার।

কিন্তু নদীর কোনদিকেই সন্দেহজনক কিছুই দেখা যায় না। নদীর দুই তীরের বনের গাছপালা করছে সুমধুর মর্মরধ্বনি এবং মাথার উপরকার সমুজ্জ্বল আকাশের গায়ে জেগে আছে পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতির্ময় মুখ। কোথাও মানুষ বা অন্য কোন জন্তুর সাড়া নেই, এমন কি, সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদের কণ্ঠেও এখনো জাগ্রত হয়নি বিভীষণ মৃত্যু-ধ্রুপদ!

নদীর জলকে ফেনায়িত ক'রে সমানে ছুটে চলেছে কলের নৌকো। প্রকৃতির আদিম ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যের মধ্যে কৃত্রিম ও আধুনিক এই মোটর-বোটকে দেখাচ্ছে অত্যন্ত বেমানান। কিন্তু উপায় নেই, যেখানে হবে আধুনিক সভ্যতার পদার্পণ, প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্যের মধ্যে সেখানেই হবে ছন্দপাত।

আচম্বিতে হ'ল এক ধারণাতীত ব্যাপার। মোটর-বোট বাধা পেয়ে অধিকতর উচ্চস্বরে ক'রে উঠল এক ক্রুদ্ধ গর্জন। কলের নৌকো আর অগ্রসর হ'তে পারলে না।

বোটের ভিতরকার সেই হৃষ্টপুষ্ট লোকটি ব'লে উঠলেন, "হুম্। হ'ল কি? বোটের কল-কব্জা খারাপ হয়ে গেল নাকি?"

বোট যে চালাচ্ছিল সে বললে, "না হুজুর, বোটের সামনে জলের ভিতর থেকে জেগে উঠেছে দু'গাছা মোটা কাছি।"

—"কাছি কি বাপু? জলের ভিতরে কাছিম থাকতে পারে, কিন্তু জলের ভিতর থেকে কাছি ভেসে ওঠে এমন কথাও তো কখনো শুনিনি!"

—"হ্যাঁ হুজুর, জলের ভিতর থেকে ভেসে উঠেছে দু'গাছা কাছি! চেয়ে দেখুন, কাছি দু'গাছা নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত চ'লে গিয়েছে। ও কাছি কারা ধ'রে আছে জানি না, কিন্তু তারা বোধহয় আমাদের বাধা দিতে চায়!"

—"বাধা দিতে চায়? হুম্! তাহ'লে ব্যাপারটা বেশ বোঝাই যাচ্ছে। যাদের ধরবার জন্যে আমরা এসেছি এ-অঞ্চলে, তারাই বোধহয় আমাদের ধরবার ফিকিরে আছে। বোটের মুখ ফেরাও, বোটের মুখ ফেরাও। যেদিক থেকে আসছি আবার সেইদিকে ফিরে চল।"

বোট কিন্তু মুখ ফিরিয়েও মুক্তিলাভ করতে পারলে না। কারণ ইতিমধ্যে ওদিকেও জেগে উঠেছে আরো ছ'গাছা মোটা মোটা কাছি। বোটের এখন এদিক বা ওদিক কোনদিকেই যাবার উপায় নেই।

হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিটির ললাটদেশ তখন ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে। রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে এবং হাঁসফাঁস করতে করতে ভিতর থেকে বাইরে এসে তিনি বললেন, "পঁচিশ বছর পুলিশে চাকরি করছি। এমনভাবে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মতন মরতে আমি রাজি নই। আমি এখনি জলে ঝাঁপ খাব।"

এক ব্যক্তি বললে, "সে কি স্যর! জলে ঝাঁপ খাবেন কি? শুনেছি আপনি তো সাঁতার জানেন না।"

—"হুম্! সাঁতার জানি না বটে, কিন্তু তোমরা ভেবেছ কি আমি

হচ্ছি নিতান্ত নাবালক? আমার জামার তলায় আছে জলে ভেসে থাকবার পোশাক। স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে অনায়াসেই আমি বিপদের বাইরে গিয়ে পড়তে পারব—কিছুতেই আমি ডুব্‌ব না। বাপু হে, জলপথে যখন শত্রুপুরীতে এসেছি, তখন কি আমি প্রস্তুত হয়ে আসিনি মনে কর?"

—"কিন্তু স্যর, এখানকার নদীতে কিল্‌বিল্‌ করে কুমীরের দল! তাদের কেউ-না-কেউ আপনাকে কোঁৎ ক'রে গিলে ফেলবে।"

—"ধেৎ, বোকারাম কোথাকার! তুমি কি জানো না মানুষ যতক্ষণ জলে সাঁতার কাটে, কুমীর তাকে ধরতে পারে না? মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই কুমীর তার লক্ষ্য স্থির ক'রতে পারে।"

হঠাৎ আর-একজন ব'লে উঠল, "হুজুর, নদীর দু' তীরের দিকে তাকিয়ে দেখুন! ওদিক থেকে দু'খানা আর এদিক থেকে দু'খানা নৌকো তর্‌তর্‌ ক'রে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।"

—"ওরা আমাদেরই বন্দী করতে আসছে! এইবারে আমি জলে ঝাঁপ খাব।"

—"কিন্তু স্যর, আপনি তো জলে ঝাঁপ খেয়ে হয় পাতালে, নয় কুমীরের পেটে গিয়ে হাজির হবেন! আমরা এখন কি করি।"

—"সাঁতার জানা থাকে তো জলে ঝাঁপ খাও, নয়তো বোম্বেটেদের হাতে ধরা দাও! এ-সময়ের মূলমন্ত্র কি জানো? চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা!"

—"না স্যর, আমরা ওদের হাতে ধরা দেব না, আমরা ওদের সঙ্গে লড়াই করব।"

—"দলে ওরা ভারি, ওদের সঙ্গে লড়াই ক'রে সুবিধে ক'রে উঠতে পারবে কি? বেশ, তোমাদের যা-খুশি তাই কর, আমি কিন্তু জলে ঝাঁপ খেলুম! জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা! শ্রীচরণে ঠাঁই দিও মা! হুম্‌!"

দ্বিতীয়

সব-চেয়ে বিস্ময়কর

সেদিন এখানে চায়ের আসরে অতিরিক্ত ঘটা। কারণটা হচ্ছে, জয়ন্ত ও মাণিক করেছে আজ বিমল ও কুমারকে প্রভাতী-চায়ের নিমন্ত্রণ।

জয়ন্ত জানত বিমল, কুমার, রামহরি ও বাঘা—এরা সবাই হচ্ছে একই পরিবারের অন্তর্গত। কাজেই বিমল ও কুমারের সঙ্গে এসেছিল রামহরি এবং বাঘাও।

এবং রামহরির রন্ধনের হাত অত্যন্ত সুপটু ব'লে নিমন্ত্রিত হয়েও তাকে ঢুকতে হয়েছিল রন্ধনশালায়, জয়ন্ত ও মাণিকের বিশেষ অনুরোধে।

প্রভাতী-চায়ের আসর হ'লে কি হয়, রামহরি সেদিন প্রস্তুত করেছিল অনেক-রকম খাবার।

ইতিমধ্যে খাবারের ছোট এক-দফা হয়ে গেল—গরম গরম টোস্ট, এগ-পোচ্ এবং চা।

চায়ের পেয়ালায় চামচে দিয়ে চিনি মেশাতে মেশাতে জয়ন্ত বললে, "বিমলবাবু, কুমারবাবু, আপনারা তো পৃথিবীর জানা-অজানা বহু দুর্গম দেশে বেড়িয়ে এসেছেন। এমন কি পৃথিবীর বাইরে মঙ্গল-গ্রহে গিয়েও পদার্পণ করতে ছাড়েন নি! কিন্তু বলতে পারেন কি, আপনারা সব-চেয়ে বিস্ময়কর কী দেখেছেন?"

বিমল একটা চুমুক দিয়ে চায়ের পেয়ালাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললে, "সবচেয়ে বিস্ময়কর কী দেখেছি? কুমার, তুমি এ-প্রশ্নের কি উত্তর দিতে চাও?"

কুমার হাসতে হাসতে বললে, "জীবনে আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে, আমাদের এই বাঘা!"

মাণিক বললে, "বাঘা? শুনেছি আপনারা ময়নামতীর মায়াকাননে গিয়ে আদিম পৃথিবীর অতিকায় জীব ডাইনসর প্রভৃতির সঙ্গেও আলাপ ক'রে এসেছেন। বাঘা কি তাদের চেয়েও আশ্চর্য?"

বিমল উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, "নিশ্চয়, নিশ্চয়! বাঘার চেয়ে আশ্চর্য কোন-কিছু আমিও জীবনে দেখিনি!"

জয়ন্ত বললে, "বাঘাকে আপনি ভালোবাসেন, তাই ও-কথা বলছেন! লোকে যাকে ভালোবাসে, তাকেই সবচেয়ে-বড় ব'লে মনে করে। ঐ তো একটা দেশী কুকুর—"

বিমল বাধা দিয়ে ব'লে উঠল, "জয়ন্তবাবু, আপনার মতন বুদ্ধিমান লোকও যদি গোলাম-মনোবৃত্তির পরিচয় দেন, তাহ'লে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হব। সাদা-চামড়ারা এই কালো বাংলা দেশ আর এই কালো বাঙালীকে ঘৃণা করে ব'লে এ-দেশের কুকুর বাঘাও কি হবে ঘৃণ্য জীব? বাঘাকে আপনারা এখনো চেনবার সুযোগ পাননি। কুকুর হ'লেও সে হচ্ছে অদ্ভুত, বাংলার গৌরব! ইউরোপ-আমেরিকার যে-কোন 'পেডিগ্রি-ডগে'র চেয়েও সে হচ্ছে উচ্চতর শ্রেণীর জীব! বাঘাকে আমরা যদি হুকুম দি, তাহ'লে সে একলাই সিংহেরও উপরে গিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারে। কত বড় বড় সাংঘাতিক বিপদ থেকে বাঘা আমাদের উদ্ধার করেছে, সে-কথা তো আপনারা জানেন না! বাঘাকে আমরা অধিকাংশ মানুষেরই চেয়ে শ্রদ্ধা করি!"

কুমার বললে, "শুধু আমরা নই, বাংলার কবি ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত অনেক-কাল আগেই ব'লে গিয়েছেন:

'কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি'
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।'—

জয়ন্তবাবু, বাঘা হচ্ছে বাংলার কুকুর, কিন্তু তার ভিতরে গোলাম-মনোবৃত্তি নেই। ঠিকমত যত্ন করলে আর পালন করতে পারলে বাংলার নিজস্ব কুকুরও যে কতখানি অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে, বাঘা হচ্ছে তারই জ্বলন্ত প্রমাণ!"

ঘরের এক প্রান্ত দিয়ে একটা নেংটি ইঁদুর ল্যাজ তুলে তীরের মত কোণের ঐ আলমারিটার তলায় গিয়ে ঢুকেছিল, বাঘা এতক্ষণ ছিল তাকেই পুনরাবিষ্কার করবার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত! কিন্তু পলাতক ইঁদুরের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। বাঘা ইঁদুরকে ধরবার চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু সজাগ কানে বারবার শুনছিল তার নিজেরই নাম! অতএব ইঁদুরকে ত্যাগ ক'রে সে এখন তার মনিবদের কাছে যাওয়াই উচিত মনে করলে।

কুমার হাসতে হাসতে বললে, "কিরে বাঘা, তুই আবার কি বলতে চাস্?"

বাঘা প্রবল বেগে লাঙ্গুল আস্ফালন ক'রে একটি লাফ্ মেরে বললে, "ঘেউ, ঘেউ!"

বিমল হেসে ফেলে বললে, "বাঘা রে, তুই দিশী-কুকুর ব'লে জয়ন্তবাবু আর মাণিকবাবু তোকে মানতে রাজি হচ্ছেন না। তুই একবার এঁদের ধমকে দে তো!"

বাঘা তখনি জয়ন্ত আর মাণিকের দিকে ফিরে দাঁত-খিঁচিয়ে গম্ভীর স্বরে গর্‌র্ গর্‌র্ ক'রে গর্জন ক'রে উঠল!

জয়ন্ত হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "ব্যাস্, বিমলবাবু! আপনাকে আর কিছু প্রমাণিত করতে হবে না! বাঘা যে গেল-জন্মে মানুষ ছিল, আর এ-জন্মেও তার কুকুর-দেহের ভিতরে যে মানুষের আত্মা বর্তমান আছে, এ-কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য হচ্ছি! দ্বারপথ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, বারান্দা দিয়ে রামহরি আর মধু আসছে খাবারের 'ট্রে' হাতে ক'রে। অতএব মুখ দিয়ে এখন বাক্য ত্যাগ না ক'রে খাদ্য গ্রহণ করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ!"

ঠিক এই সময়েই শোনা গেল সিঁড়ির উপর দিয়ে ভারি ভারি দ্রুত-চলা পায়ের শব্দ!

জয়ন্ত বললে, "ও-পায়ের শব্দ আমি চিনি! সুন্দরবাবু আসছেন! পায়ের শব্দ শুনেই মনে হচ্ছে ব্যাপার বড় গুরুতর!"

—বলতে বলতে সুন্দরবাবু এসে হাজির হ'লেন সেই ঘরের দ্বারদেশে।

মাণিক বললে, "চতুষ্পদ জীবদের নাসিকার শক্তি নাকি মানুষদেরও চেয়ে প্রখর। কিন্তু সুন্দরবাবু, আপনার ঘ্রাণশক্তি তাদেরও হার মানাতে পারে!"

সুন্দরবাবু মাথার টুপী খুলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললেন, "এ-কথার মানে কি মাণিক?"

—"মানেটা হচ্ছে এই যে, আজ আমাদের এখানে পানাহারের বিশেষ আয়োজন হয়েছে, এ-কথাটা আপনি জানতে পারলেন কেমন ক'রে?"

সুন্দরবাবু ধুপ্‌ ক'রে একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে প'ড়ে বললেন, "হুম্‌। পানাহার। পানাহার করতেই আমি এখানে এসেছি বটে। পরপারে যেতে যেতে কোন-রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে আজ আমি তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি! প্রাণ থাকলে লোকে পেটের কথা ভাবে, আমি এখন পেটের কথা মোটেই ভাবছি না!"

মাণিক বললে, "তাহ'লে আপনি কি আজ এখানে দয়া ক'রে কিছুই গ্রহণ করবেন না?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমি কি তাই বলছি? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই। খাবার তৈরি থাকলে যে খেতে রাজি হয় না আমার মতে সে হচ্ছে—নরাধম!"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, হাসি-ঠাট্টার কথা থাক্‌, আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, আপনি আজ এখানে বেড়াতে-বেড়াতে খাবার খেতে আসেন নি। ব্যাপার কি বলুন তো?"

সুন্দরবাবু সাগ্রহে একখানা 'ফ্রেঞ্চ্‌ কাটলেট'কে আক্রমণ ক'রে বললেন, "বলছি ভায়া, বলছি। এমন ব্যাপার আমি আর কখনো দেখিওনি শুনিওনি! তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আমি কোন কাজ করি না, জানো তো!......আরে, হুম্‌! বিমলবাবু? কুমারবাবু? আপনারাও আজ এখানে হাজির? আমার ভাগ্য দেখছি খুব ভালো!

…আরে, সেই বিচ্ছিরি নেড়িকুত্তাটাকেও সঙ্গে ক'রে এনেছেন দেখছি যে! আর ব্যাটা আর-সবাইকে ছেড়ে ঠিক আমার দিকেই কট্‌মট্ ক'রে তাকিয়ে আছে! মশায়, ও-কুকুরটা আমার দিকে অমন্ ক'রে তাকিয়ে থাকলে আমি ভারি নার্ভাস্ হয়ে যাই! ওকে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতে বলুন।"

কিন্তু বাঘাকে মানা করতে হ'ল না, হঠাৎ নিচে থেকে রামহরির ডাক শুনে এক দৌড় মেরে ঘরের বাইরে চ'লে গেল।

খানিকক্ষণ পরে ভোজন-পর্ব শেষ হ'ল। সুন্দরবাবু উঠে গিয়ে এক-খানা আরামপ্রদ সোফার উপর ব'সে এক পায়ের উপরে আর এক পা তুলে দিয়ে আগে একটি সুদীর্ঘ 'আঃ' শব্দ উচ্চারণ করলেন। তারপর একটি চুরোট ধরিয়ে হুস্ ক'রে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে শুরু করলেন তাঁর কাহিনী :

সুন্দরবনের ভিতরে দেখা দিয়েছে এক আধুনিক দেবী চৌধুরাণী! তাকে এখনো কেউ চোখে দেখেনি, সবাই শুনেছে কেবল তার কণ্ঠস্বর!

জয়ন্ত, তুমি জানো সুন্দরবনের ভিতরে নানা-শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা সর্বদাই যাতায়াত করে। আর সুন্দরবনের ভিতরে মানুষের যাতায়াতের প্রধান পথ হচ্ছে জলপথ। এত নদী-নালা বোধহয় পৃথিবীর আর কোন দেশের কোন অরণ্যেই নেই। সুন্দরবনের জঙ্গল নানা স্থানেই এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, তার ভিতরে মানুষ প্রবেশ করবে কি, দিন-দুপুরে প্রখর সূর্যালোকও প্রবেশ করতে পারে না। জঙ্গল যেখানে পাত্‌লা সেখানেও মানুষের পক্ষে নিরাপদ নয়। হয়তো গাছের উপরে দুলতে থাকে মোটা মোটা অজগর এবং গাছের তলায় মানুষের জন্যে অপেক্ষা করে ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল। এবং সেইসঙ্গে আরো অনেক-রকম চতুষ্পদ জীব আর বুকে-হাঁটা বিষাক্ত সরীসৃপও আছে। তবু মোম, মধুর সংগ্রাহক আর কাঠুরিয়াদের জঙ্গলের ভিতরে পায়ে হেঁটে প্রবেশ করা ছাড়া উপায় কিন্তু নেই। যাদের বাধ্য হয়ে পদব্রজে সুন্দরবনের ভিতরে প্রবেশ করতে হয়, তারা মোব্‌রা-গাজীর বংশধর নামে খ্যাত ফকিরদের কাছে গিয়ে আগে

আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই ফকিররা নাকি মন্ত্রগুণে ব্যাঘ্র বা কুমীরের হিংস্র দৃষ্টি মানুষদের উপরে পড়তে দেয় না।

যাক্ সে কথা। এখন জলপথের কথাই হোক্। বলেছি সুন্দরবনের জলপথে নৌকোয় চ'ড়ে নানা-শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা সর্বদাই আসা-যাওয়া ক'রে থাকে। কিন্তু হঠাৎ এই-সব জলপথ হয়ে উঠেছে বিপদ্‌জনক—এমন কি সাংঘাতিক।

ধরো, কোন ধনী-ব্যবসায়ীর নৌকো সুন্দরবনের কোন একটা নদীর ভিতর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। যেতে যেতে নৌকোর আরোহীরা দেখলে দূর থেকে বেগে আর-একখানা বড় নৌকো (বা সময়ে সময়ে দ্রুতগামী ছিপ্) বেগে তাদের কাছে এসে হাজির হ'ল।

সেই বড় নৌকো বা ছিপের উপর থেকে একজন লোক চেঁচিয়ে ব্যবসায়ীদের নৌকোর চালককে ডেকে বললে, "মাঝি, একটু আগুন কি দেশলাই আছে ভাই? আমাদের আগুন কি দেশলাই নেই, আমরা তামাক খেতে পাচ্ছি না।"

ব্যবসায়ীদের নৌকোর মাঝি আগুন বা দেশলাই দিয়ে নবাগতকে সাহায্য করতে উদ্যত হ'ল।

কিন্তু যেই সে হাত বাড়িয়ে নতুন নৌকোকে আগুন বা দেশলাই দিতে গেল, অমনি অপর নৌকোর উপর থেকে কেউ তার হাত ধ'রে টান মেরে তাকে একেবারে জলের ভিতরে ফেলে দিলে। মাঝিহীন নৌকো আর অগ্রসর হ'তে পারলে না। সেই সুযোগে নতুন নৌকোর উপর থেকে যমদূতের মতন দশ-বারো জন লোক বাঘের মতন লাফ মেরে ব্যবসায়ীদের নৌকোর উপরে এসে পড়ল—তারা সকলেই সশস্ত্র। কেবল তরোয়াল বা ছোরা নয়, তাদের সঙ্গে থাকে বন্দুক আর রিভলভার পর্যন্ত।

তারপর তারা ব্যবসায়ীদের নৌকোর সমস্ত আরোহীকে আক্রমণ করে। তারা এমন নির্দয় যে, কারুকেই প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে দেয় না। সকলকেই খুন ক'রে তাদের সঙ্গে টাকাকড়ি বা মূল্যবান যা-কিছু

থাকে সমস্তই লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যায়। এমন কি নৌকোখানাকে পর্যন্ত ছাড়ে না। সেখানাকেও তাদের নৌকোর সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যায় কোথায়, তা কেউ জানে না।

মাঝে মাঝে আক্রান্ত-ব্যবসায়ীদের নৌকোর ভিতর থেকে দু-একজন লোক কোন-গতিকে জলে ঝাঁপ্ খেয়ে সাঁতার দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে। তাদের মুখ থেকেই জানতে পেরেছি বোম্বেটেদের এই আক্রমণ-প্রণালী।

জয়ন্ত, এই আক্রমণের কৌশলটা নতুন নয়। হয়তো তুমি জানো, এদেশে যখন ইংরেজ-শাসনের আরম্ভ, ডাকাত আর বোম্বেটেদের অত্যাচারে বাংলাদেশ তখন ছিল প্রায় অরাজকের মতন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডাকাত আর বোম্বেটেদের তখন আলাদা ক'রে ভাবা হ'ত না। বাংলাদেশ নদী-প্রধান ব'লে স্থলপথের দস্যুরা তখন প্রায়ই সাহায্য গ্রহণ করত জলপথের। সে-সময়কার ডাকাত বা বোম্বেটেরা যখন কোন নৌকোর উপরে এসে হানা দিত, তখন সুন্দরবনের এই আধুনিক বোম্বেটেদের মতই প্রথমে গোড়া ফেঁদে বলত, 'মাঝি, একটু আগুন দেবে ভাই?' দেখা যাচ্ছে, এই আধুনিক বোম্বেটেরা আবার সেই পুরাতন কৌশলই অবলম্বন করতে চায়।

কিন্তু আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার কি জানো? সুন্দরবনে ব্যবসায়ীদের প্রত্যেক নৌকোই যখন আক্রান্ত হয়েছে, তখন শুনতে পাওয়া গেছে এক তীব্র আর তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ। বোম্বেটেরা সকলেই সেই নারীকণ্ঠেরই আদেশ পালন করে।

অথচ সেই নারী যে কে, আজ-পর্যন্ত কেউ তা দেখেনি। আজকাল ছিপের ব্যবহার নেই, কিন্তু এই বোম্বেটেরা মাঝে মাঝে ব্যবহার করে সেই সেকেলে ছিপ। এ-শ্রেণীর নৌকো—অর্থাৎ ছিপের উপরে কোনরকম ছাউনি থাকে না; সকলেই তা জানে। কিন্তু ছিপের উপরে এখন পর্যন্ত কেউ কোন স্ত্রীলোককে দেখতে পায়নি। সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি, বিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক দেবী চৌধুরানী হত্যা ও লুণ্ঠন

করে পুরুষের ছদ্মবেশের আড়ালেই।

কর্তাদের হুকুম হয়েছিল, যেমন ক'রে হোক্ আমাকে এই অতি-নৃশংস দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করতেই হবে। কারণ সুন্দরবনের জলপথে আজকাল নাকি ব্যবসায়ীদের নৌকোর আনাগোনা বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। আজ-পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে নাকি পাঁচশতেরও বেশি লোক। কর্তাদের হুকুম অবশ্য আমার ভালো লাগেনি মোটেই। যত-সব মারাত্মক মামলার ভার আমার ঘাড়েই-বা পড়বে কেন? কিন্তু উপায় নেই, আমি হচ্ছি মাইনের চাকর। হুম্! আর বেশিদিন দেরি নেই। পেনশন নিতে পারলেই বাঁচি!

দলবলসুদ্ধ দেবী চৌধুরানীকে পাকড়াও করবার জন্যে যেতে হ'ল আমাকে। সেপাইদের নিয়ে মোটর-বোটে চ'ড়ে দিন-পনেরো ধ'রে সুন্দরবনের নানা নদী-নালাতে ঘুরে ঘুরে বেড়ালুম। কিন্তু একটা বোম্বেটেরও চুলের টিকি পর্যন্ত দেখতে পেলুম না। এমন কি এ-কয়দিনের ভিতরে কোন ব্যবসায়ীর নৌকোই বোম্বেটের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলুম, দেবী-চৌধুরানী-বেটী তার দলবল নিয়ে বোধহয় পুলিশের ভয়ে সুন্দরবন ছেড়ে চম্পট দিয়েছে।

হায়রে কপাল! পরশু রাত্রেই ভালো করেই টের পেয়েছি, আমার সে-বিশ্বাস হচ্ছে একেবারেই বাজে বিশ্বাস! হুম্! পরশু রাত্রের কথা ভাবতেও আমার পিলে চমকে যাচ্ছে এখনো। উঃ, সে কী ব্যাপার! একেলে দেবী চৌধুরানী-বেটী কি ধড়িবাজ মেয়ে রে বাবা!

মোটর-বোটে চেপে ফিরে আসছিলুম কলকাতার দিকে। আকাশে ছিল চাঁদের আলো, বাতাসে ছিল ফুলন্ত সবুজ পাতার গন্ধ। নদীর জল চাঁদের আলোর লক্ষ লক্ষ হীরের টুকরো নিয়ে লোফালুফি করতে করতে তর্ তর্ ক'রে ব'য়ে যাচ্ছিল গান গাইতে গাইতে। জয়ন্ত, তুমি বিশ্বাস করবে না, হঠাৎ আমার প্রাণে জাগল কবিত্ব! হঠাৎ আমি আত্মহারা হয়ে গেয়ে উঠলুম, রবিঠাকুরের "ও আমার চাঁদের আলো" ব'লে সেই গানটা! কিন্তু পুলিশের পক্ষে কবিত্ব যে কি সাংঘাতিক

জিনিস, সেটা টের পেতে বিলম্ব হ'ল না।

কবিত্বের জোয়ারে ভেসে যেই অন্যমনস্ক হয়েছি, আচম্বিতে আমাদের মোটর-বোটের আগে আর পিছনে জেগে উঠল দু'গাছা দু'গাছা ক'রে চারগাছা দড়ির বাধা! আমাদের বোটের এগুবার আর পিছোবার দুই পথই বন্ধ। জলের ভেতরে চারগাছা মোটা কাছি ডুবিয়ে দুই তীরে অপেক্ষা করছিল একেলে দেবী চৌধুরানীর দল। বোটকে কবলে পেয়েই তারা ক'রে ফেললে সেখানাকে একেবারেই বন্দী!

কিন্তু হুঁ-হুঁ বাবা, আমি হচ্ছি শত শত যুদ্ধজয়ী প্রাচীন পুলিশ-কর্মচারী! এত সহজে আমাকে কি হস্তগত করা যায়? জলপথে যাচ্ছি, অথচ আমি সাঁতার জানি না। যদি কোন অঘটন ঘটে, অগাধ জলের মধ্যে তলিয়ে যাব আড়াই-মণ ওজনের নিরেট লোহার জিনিসের মত। কাজেই সুন্দরবনের নদীতে বেড়াবার সময় আমার ইউনিফরমের তলায় এমন মজার পোশাক পরেছিলুম যে, আড়াই-মণ তিন-মণ ওজনের বৃহৎ মানুষকেও তা পাতালের দিকে তলিয়ে যেতে দেয় না কিছুতেই।

অম্লানবদনে খেলুম জলে ঝাঁপ! সেই মোটর-বোটের আর আমার দলের লোকদের কি যে হাল হ'ল, তার আমি কিছুই জানি না। কিন্তু আমি খরস্রোতা নদীর টানে ভেসে চললুম রীতিমত দ্রুতবেগে! তারপর বোধহয় মাইল-কয়েক পথ পার হয়ে ভাসতে ভাসতে উঠলুম গিয়ে নদীর এক তীরে।

তীরে উঠেই শুনলুম, খানিক তফাৎ থেকে এক ব্যাঘ্র গাইছে হালুম্-হুলুম্ রাগিণী! বোম্বেটেরা ভালো কি বাঘরা ভালো তা নিয়ে আমি মনে মনে আলোচনা করবার কোন সুযোগ পেলুম না! আমি প্রাণপণ চেষ্টায় চ'ড়ে বসলুম একটা বড় গাছের উঁচু ডালের উপরেই।

সেখানে আবার-এক নতুন বিপদ! বিষম কিচির-মিচির আওয়াজ শুনেই বুঝলুম সেই গাছের ডালে ডালে বাস করে বোধহয় শত-শত বাঁদর। মনে হ'ল, গভীর রাত্রে এই অনাহূত মানুষ-অতিথিকে দেখে সেই শত-শত বানরের দল যেন আশ্রয় দিতে মোটেই প্রস্তুত নয়! গাছের

ডালের উপর শব্দ শুনেই আন্দাজ করলুম, তাদের কেউ কেউ যেন আসছে আমাকে আক্রমণ করতে। জলে স্থলে শূন্যে গাছের ডালেও আমার জন্যে আজ দেখছি অপেক্ষা ক'রে আছে কেবল বিপদের পর বিপদ! মেজাজ ভীষণ গরম হয়ে উঠল! আর কোন দয়া-মমতা না ক'রে চতুর্দিকে করতে লাগলুম রিভলভারের গুলিবৃষ্টি! রিভলভারের কি মহিমা! অতবড় গাছটা হয়ে গেল একদম নিঃশব্দ! কেবল গাছের তলায় মাটির উপরে শুনতে লাগলুম ধুপ্ ধাপ্ শব্দের পর শব্দ! বুঝলুম, বানরের দল এ-গাছের বাসা ছেড়ে মাটির উপরে লাফ মেরে স'রে পড়ছে অন্য কোথাও!

বাঁদরের দল তো গেল ভাই, এল আবার নতুন শত্রুর দল! তারা আবার এমন শত্রু যে, কামান দাগলেও ব্যর্থ হবে গোলা ছোঁড়া! এই হতভাগ্য সুন্দরবাবুকে আক্রমণ করলে ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে ভয়াবহ মশারা মনের সুখে পোঁ-পোঁ রাগিণী ভাঁজতে ভাঁজতে। সে-যে কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড, কলকাতায় ব'সে তোমরা তা আন্দাজ করতে পারবে না। আমি বলছি তা যে অত্যুক্তি নয়, এখনো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে তোমরা সেটা কতক আন্দাজ করতে পারবে। বারবার মনে হয়েছিল ডাকুক-গে সুন্দরবনের কেঁদো বাঘ, মারি লাফ্‌টা আবার মাটির উপরে! যাক্, বুদ্ধিমানের মত সে-ইচ্ছা দমন ক'রে ফেলেছিলুম।

কিন্তু জয়ন্ত, একটা কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। যদিও আমি কোন নারীকে দেখতে পাইনি, কিন্তু নৌকোর উপর থেকে ঝাঁপ্ খেয়ে আমি যখন অগাধ জলের উপরে ভাসছি, নদীর এক তীর থেকে তখন শুনতে পেয়েছিলুম, খনখনে মেয়ে-গলায় খল-খল অট্টহাসির পর অট্ট-হাসি! সে যে নারীর কণ্ঠ তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই, কিন্তু পৃথিবীর কোন নারীর কণ্ঠই যে সে-রকম বীভৎস, নিষ্ঠুর আর হিংস্র অট্টহাসি হাসতে পারে, আমি কখনো স্বপ্নেও তা ধারণায় আনতে পারিনি। ভয়ানক বন্ধু, ভয়ঙ্কর! সেই কুৎসিত হাসির ভিতরে জেগে উঠেছিল যেন দুনিয়ার সমস্ত পাপ আর শয়তানি! হুম্!"

তৃতীয়

নতুন অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ

জিজ্ঞাসু-চোখে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্তও খানিকক্ষণ মুখ নামিয়ে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। তারপর মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, "বিমলবাবু, কুমারবাবু, সব তো শুনলেন সুন্দর-বাবুর মুখে। আপনাদের কি মনে হয়?"

বিমল বললে, "বাঙলাদেশে মেয়ে-বোম্বেটের কথা এই প্রথম শুনলুম।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কেন, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে আপনি কি দেবী চৌধুরানীর কথা পড়েন নি?"

বিমল বললে, "পড়েছি। যদিও দেবী চৌধুরানীর সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক আছে, তবু ঐ নারী-চরিত্রটিকে নিয়ে বঙ্কিমবাবু লিখেছিলেন—কাল্পনিক উপন্যাস। আর ইতিহাসের কি উপন্যাসের দেবী চৌধুরানী মেয়ে-বোম্বেটে ছিলেন না। রংপুর অঞ্চলে যখন একবার চাষারা বিদ্রোহী হয়, দেবী চৌধুরানী আর ভবানী পাঠক প্রভৃতির নাম শোনা গিয়েছিল সেই-সময়ে। ভবানী পাঠক যে-কালীর প্রতিমাকে পুজো করতেন, ও-অঞ্চলে এখনো তা বিদ্যমান আছে। আমি আর কুমার সেই প্রতিমাকে স্বচক্ষে দেখে এসেছি। কিন্তু সুন্দরবাবু, আজ যে মেয়ে-বোম্বেটের কথা বললেন, আমার কাছে তা অত্যন্ত অদ্ভুত ব'লেই মনে হ'ল।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কেন, অদ্ভুত ব'লে মনে হ'ল কেন? আপনি কি জানেন না এই কলকাতা-শহরেই নামজাদা মেয়ে-গুণ্ডা আছে? মেয়ে-গুণ্ডা যখন থাকতে পারে, মেয়ে-বোম্বেটেই-বা থাকবে না কেন? হুম্! এই পৃথিবীটা হচ্ছে এক আজব জায়গা, এখানে অসম্ভব কিছুই নেই।"

বিমল বললে, "আমি আপনার কথার প্রতিবাদ করছি না সুন্দর-বাবু। ব্যাপারটা অদ্ভুত ব'লে মনে হচ্ছে, তাই বললুম।"

কুমার বললে, "মেয়েই হোক্ আর পুরুষই হোক্, প্রত্যেক বোম্বেটের পিছনে কিছু-না-কিছু পূর্ব-ইতিহাস থাকেই। পুলিশের কর্তব্য হচ্ছে, আগে সেই ইতিহাসের খবর নেওয়া। কোন মেয়ে-বোম্বেটে হঠাৎ আকাশ থেকে খ'সে পড়তে পারে না। বোম্বেটে রূপে দেখা দেবার আগে নিশ্চয়ই সে অন্য কোন-না-কোন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পুলিশের খাতায় আপনি ঐ মেয়ে-বোম্বেটের কোন পূর্ব-ইতিহাস পেয়েছেন কি?"

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "কিছুই পাইনি। ঐ যা বললেন, এই বোম্বেটে-বেটী ঠিক যেন আকাশ থেকেই খ'সে পড়েছে।"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবন অঞ্চলে কোন মেয়ে-বোম্বেটের যে আবির্ভাব হয়েছে, সুন্দরবাবুর কাহিনীর ভিতরে আমি তার কোন প্রমাণই পেলুম না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "প্রমাণ পেলে না মানে? তবে এতক্ষণ ধ'রে আমি কার কথা বললুম?"

সুন্দরবাবুর কথার প্রতিধ্বনি ক'রে জয়ন্ত বললে, "কার কথা বললেন, আমিও তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

—"কার কথা আবার, আমি ঐ মেয়ে-বোম্বেটের কথাই বলেছি।"

—"তাকে কেউ দেখেছে?"

—"না। কিন্তু সবাই তার গলা শুনেছে। হুকুম দ্যায় সে, আর দলের পুরুষরা সেই হুকুম-মত কাজ করে।"

—"বুঝলুম। কিন্তু সকলেই—এমন কি আপনিও শুনেছেন কেবল একটি নারীর কণ্ঠস্বর। সেই নারীকে কেউ কোনদিন দেখেনি, এমন কি তার কোন পূর্ব-ইতিহাস পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। চোখে না দেখে কেবল কোন কণ্ঠস্বরের ওপরে নির্ভর ক'রে আমি কোন কথাই বলতে চাই না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "শোনা-কথা মাত্রেই কি বাজে হয় বাপু?"

—"কোন্ কথা বাজে আর কোন্ কথা কাজের তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। মেয়ে-বোম্বেটের কথা নিয়েও এখন আমি আলোচনা করতে চাই না। আমি নাড়াচাড়া করছি কেবল ঐ ঘটনাগুলো নিয়ে। বোঝা যাচ্ছে, সুন্দরবন অঞ্চলে একদল নৃশংস জলদস্যুর আবির্ভাব হয়েছে। তারা খালি ডাকাতি করে না, যাদের উপরে হানা দেয় তাদের প্রত্যেককেই হত্যা করে। আর সব-চেয়ে ভাববার কথা হচ্ছে, ডাকাতরা নৌকোগুলো পর্যন্ত নিয়ে অদৃশ্য হয়।"

সুন্দরবাবু বললেন, "এর মধ্যে আর ভাববার কথা কি আছে?"

জয়ন্ত বললে, "ভাববার কথা নেই? ডাকাতরা নৌকোগুলো নিয়ে যায় কেন?"

—"কেন আবার, সমস্ত প্রমাণ নষ্ট ক'রে দেবে ব'লে। লুটপাটের পর তারা প্রত্যেক মানুষকে খুন করে ঐ-কারণেই।"

বিমল বললে, "সুন্দরবাবু, আমার মনে হয় এই নৌকোচুরির ভিতরে অন্য-কোন রহস্যও থাকতে পারে।"

—"কি রহস্য, শুনি?"

—"আমার বিশ্বাস, ঐ ডাকাতদের দলপতি এমন-একটা বৃহৎ দল গঠন করছে কিংবা করেছে, যার জন্যে দরকার অনেক নৌকোর।"

জয়ন্ত বললে, "আমিও বিমলবাবুর কথায় সায়-দি।"

সুন্দরবাবু চম্‌কে উঠে বললেন, "ও বাবা, হুম্!"

মাণিক বললে, "এ-অনুমান যদি সত্য হয়, তাহ'লে ব্যাপারটা রীতিমত সাংঘাতিক ব'লে মানতে হবে। যে-ডাকাতরা প্রত্যেক মানুষকেই হত্যা করে, তারা দলে ভারি হ'লে কি আর রক্ষে আছে?"

জয়ন্ত বললে, "আমিও সেই কথাই ভাবছি।"

সুন্দরবাবু বললেন, "ভেবেছি তো আমিও অনেক। খালি ভেবে কি লাভ, একটা উপায় তো করতে হবে?"

জয়ন্ত বললে, "আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা করা।"

সুন্দরবাবু মাথার টাকের উপরে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "আরে বাবা, যাত্রা-থিয়েটারের কথা ছেড়ে দাও। যাত্রা তো আমিও করেছিলুম, কিন্তু ফল হ'ল কি? ঘটে বুদ্ধি আছে ব'লে কোন-গতিকে পৈতৃক প্রাণটি নিয়ে এ-যাত্রা পালিয়ে আসতে পেরেছি।"

জয়ন্ত বললে, "বোকার মতন কাজ করলেই শাস্তিভোগ করতে হয়।"

—"হুম্, বোকার মতন আবার কি কাজ করলুম?"

—"আপনি যে চারিদিকে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে করতে গিয়েছিলেন।"

—"মানে?"

—"প্রকাশ্যে নৌকো-বোঝাই পুলিশ-ফৌজ নিয়ে আপনি গিয়েছিলেন ডাকাতদের ধরতে। কাজেই আপনাকে ধরতে চেষ্টা করেছিল, তারাই।"

সুন্দরবাবু অনুতপ্তকণ্ঠে বললেন, "ঠিক ভাই জয়ন্ত, ঠিক! বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে! হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি ও-অঞ্চলে আমাদের যাওয়া উচিত ছিল, ছদ্মবেশে।"

জয়ন্ত বললে, "তা যাননি ব'লেই পুলিশের সাড়া পেয়েই ডাকাতরা প্রথমে জাল গুটিয়ে আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল। তারপর চমৎকার ফাঁদ পেতে তারা চেষ্টা করেছিল পুলিশ-বাহিনীকে একেবারে উচ্ছেদ করতে।"

সুন্দরবাবু কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "উচ্ছেদ তো তারা করেছেই, হয়তো দলের ভিতরে বেঁচে আছি খালি আমিই একলা। শুনছি আমাদের বড়-সাহেব নাকি আমার উপরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এখনো তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি হইনি, কিন্তু কেমন ক'রে যে মুখরক্ষা করব কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। ভাই জয়ন্ত, তুমি একটা সৎপরামর্শ দাও।"

জয়ন্ত বললে, "আমার মত যদি মানেন, তাহ'লে সদলবলে আবার ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা করুন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "এবারে তুমিও আমাদের সঙ্গে থাকবে তো?"

—"যদি বলেন, থাকব। আমিও থাকব, মাণিকও থাকবে। বিমল-

বাবু, মাণিকবাবু, আপনাদের খবর কি? হাতে কোন নতুন এ্যাড্-ভেঞ্চার আছে নাকি?"

বিমল মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "একটাও না, একটাও না। দুনিয়ায় অত্যন্ত এ্যাড্ভেঞ্চারের অভাব হয়েছে, আমি আর কুমার এখন বেকার ব'সে আছি।"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "তাহ'লে চলুন না, সকলে মিলে একবার সুন্দরবন ভ্রমণ ক'রে আসি।"

বিমল ও কুমার একসঙ্গেই বললে, "রাজি!"

মাণিক হাসতে হাসতে বললে, "জয়ন্ত, ক্যাংলাদের তুমি জিজ্ঞাসা করছ ভাত খাবে কিনা! নতুন এ্যাড্ভেঞ্চারের গন্ধ পেলে বিমলবাবু আর কুমারবাবু যে তখনি মেতে উঠবেন, "এটা তো জানা কথাই!"

চতুর্থ

বিজনবাবুর প্রমোদ-তরণী

চব্বিশ পরগণার প্রান্তদেশে সমুদ্রের অনেকগুলো বাহু যেখানে সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তারই কাছাকাছি মাঝারি একটি নদী-পথ।

সেই নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে নোঙরে বাঁধা 'লঞ্চ্'। সেখানি হচ্ছে বিখ্যাত জমিদার বিজনবিহারী রায়চৌধুরীর বাষ্পীয় প্রমোদ-তরণী।

জমিদারি থেকে বিজনবাবুর বার্ষিক আয় চার লক্ষ টাকার উপর। তার উপরে আছে তাঁর ব্যাঙ্কের খাতা। বয়সে তিনি যুবক এবং জমিদারির একমাত্র মালিক। তাঁর নাম জানে না বাঙলা দেশে এমন লোক খুব কমই আছে, কেননা দীন-দুঃখীদের জন্যে তিনি অর্থব্যয় করেন অকাতরে। তাঁর একটি সখও আছে এবং সেটি হচ্ছে সঙ্গীত-প্রিয়তা।

নিয়মিত মাহিনা দিয়ে তিনি অনেক বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীকে রীতিমত লালনপালন করেন।

মাঝে মাঝে তিনি তাঁর বাষ্পীয় প্রমোদ-তরণী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন বাঙলাদেশের নানা জলপথে। বিশেষ ক'রে সুন্দরবন হচ্ছে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় জায়গা। এখানে তিনি যখন অবসরযাপন করতে যান, তখন তাঁর সঙ্গে থাকে কয়েকজন সঙ্গীতপ্রিয় বন্ধু এবং কয়েকজন বিখ্যাত গায়ক।

সেদিন ছিল, পূর্ণিমার রাত। পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে সুন্দরবনের অসীম শ্যামলতা হয়ে উঠেছে বিচিত্র এবং জ্যোতির্ময়! বাতাসের ছন্দে ছন্দে নদীর দুই তীরের নির্জন অরণ্যের মধ্য থেকে ভেসে আর ভেসে আসছে অশ্রান্ত মর্মর-রাগিণী! এবং সেই রাগিণীর সঙ্গে সুর জুড়ে দিয়েছে উচ্ছ্বসিত তটিনীর অপূর্ব কলতান!

বিজনবাবুর প্রমোদ-তরণীও নিস্তব্ধ হয়ে ছিল না। 'লঞ্চে'র উপরকার ছাদের উপরে বসেছে বেশ একটি ছোটখাটো সভা। সেখানে গায়করা আছেন আর আছেন বিজনবাবু ও তাঁর বন্ধুগণ। একজন বিখ্যাত গায়ক তখন সন্তবাহারে করছিলেন চমৎকার আলাপ।

এমন সময়ে নদী-পথে উঠল একটা বেসুরো শব্দ। একখানা মোটর-বোট গর্জন করতে করতে এসে থেমে গেল ঠিক প্রমোদ-তরণীর পাশে।

বিজনবাবু 'লঞ্চে'র ধারেই বসেছিলেন। তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝলেন, মোটর-বোটখানার কোন কল বোধহয় বিগ্‌ড়ে গিয়েছে।

মিনিট চার-পাঁচ পরে মোটর-বোটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন একটি প্রাচীন ভদ্রলোক। উজ্জ্বল চাঁদের আলোকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল, তাঁর মাথার শ্বেত কেশ এবং মুখের ধব্‌ধবে লম্বা দাড়ি। ভদ্রলোকের আকারও যে বিশেষ দীর্ঘ সেটাও বেশ বোঝা গেল, কিন্তু বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে তাঁর দেহ।

হঠাৎ জেগে উঠল এক নারী-কণ্ঠস্বর। যেন কোন নারী বললে, "এই 'লঞ্চে'র মালিক কে?"

বিজনবাবু বিস্মিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ছাদের রেলিঙে ঝুঁকে প'ড়ে এদিকে-ওদিকে তাকিয়েও দেখতে পেলেন না কোন নারীকেই।

তারপরই তাঁর বিস্ময় আরো বেড়ে উঠল। কারণ সেই বৃদ্ধ তাঁকে সম্বোধন ক'রেই আবার সেই নারী-কণ্ঠেই বললে, "এই 'লঞ্চে'র মালিকের সঙ্গে একবার আমার দেখা হবে কি?"

নারী-কণ্ঠে কথা কইছেন ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোক!

বিজনবাবু জীবনে কোন পুরুষের গলাতেই এমন মেয়েলি-আওয়াজ শোনেন নি। নিজের হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে তিনি বললেন, "আমিই এই 'লঞ্চে'র মালিক। আপনি কি বলতে চান, বলুন।"

মোটর-বোটের বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, "নমস্কার মশাই, নমস্কার! আমার বোট অচল হয়ে গিয়েছে। বোটের চালক বলছে, তার 'পেট্রলে'র ভাণ্ডার ফুরিয়ে গিয়েছে। আপনার কাছ থেকে কিছু 'পেট্রল' আশা করতে পারি কি? বড়ই বিপদে পড়েছি মশাই, যদি এই উপকারটি করতে পারেন তাহ'লে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।"

বিজনবাবু বললেন, "আমার 'লঞ্চে' তো অতিরিক্ত 'পেট্রল' নেই! আপনাকে যে এই বিপদে সাহায্য করতে পারলুম না, এজন্যে বড়ই দুঃখিত হচ্ছি।"

বৃদ্ধ স্তব্ধ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর হতাশভাবে বললেন, "কার মুখ দেখে বেরিয়েছি জানি না, বড়ই বিপদে পড়লুম। বোট হ'ল অচল, সঙ্গে নেই খাবার, আজ সারারাত অনাহারেই কাটাতে হবে দেখছি! আর কাল সকালেই বা এ-বোট চলবে কেমন ক'রে, তাও তো বুঝতে পারছি না!"

বৃদ্ধ আবার যখন বোটের ভিতরে ঢুকতে উদ্যত হলেন বিজনবাবু সেই-সময়ে বললেন, "মশাই, আপনার অতটা চিন্তিত হবার কারণ নেই। বোটখানা আমার 'লঞ্চে'র পিছনে বেঁধে আজ আপনি অনায়াসেই আমাদের সঙ্গে রাত্রিবাস করতে পারেন।"

বৃদ্ধ বললেন, "ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তো একলা নই, আমার সঙ্গে রয়েছে যে আরো জন-আষ্টেক লোক। তাদের কি ব্যবস্থা করি বলুন দেখি?"

বিজনবাবু সহাস্যে বললেন, "তাঁদের ব্যবস্থা করতেও আমার কষ্ট হবে না। সবাইকে সঙ্গে ক'রে আপনি এখন 'লঞ্চে'র উপরে এলেই আমি আনন্দিত হব।"

বৃদ্ধের দেহ বোধহয় অত্যন্ত দুর্বল। তাঁর সঙ্গের লোকেরা তাঁকে সাহায্য না করলে নিশ্চয়ই তিনি বোট ছেড়ে 'লঞ্চে'র উপরে এসে উঠতে পারতেন না। বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে সদলবলে 'লঞ্চে'র ছাদের উপরে এসে দাঁড়ালেন। বিজনবাবু দেখলেন, বৃদ্ধের প্রত্যেক সঙ্গীরই দেহ হচ্ছে রীতিমত অসাধারণ। সকলেরই মূর্তি যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুদীর্ঘ এবং সকলেরই হাতে রয়েছে এক-একগাছা ক'রে বড় লাঠি। ঐ-সব বলবান মূর্তির পাশে বৃদ্ধের দেহকে দেখাচ্ছিল এত অসহায় যে, বর্ণনা ক'রে তা বোঝানো যায় না।

বিজনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "আপনার সঙ্গে এত মোটা-মোটা লাঠির সমারোহ কেন?"

বৃদ্ধ সহাস্যে বললেন, "সুন্দরবন জায়গা তো নিরাপদ নয়। কখন্ কি হয় বলা যায় না। সেইজন্যে একটু প্রস্তুত হয়েই থাকতে হয়।"

বিজনবাবু বললেন, "কিন্তু আমার এই 'লঞ্চে'র উপরে আপনাদের ঐ লাঠিগুলি কোন কাজেই লাগবে না। এখানে হচ্ছে সঙ্গীতচর্চা, যষ্টির সঙ্গে যার কোনই সম্পর্ক নেই।"

হঠাৎ আসরের ভিতর থেকে বিজনবাবুর এক বন্ধু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "কি আশ্চর্য! চেয়ে দেখ বিজন, চেয়ে দেখ। চারিদিক থেকে ভেসে আসছে কতগুলো নৌকো। খান-চারেক ছিপ্ও আছে দেখছি। ব্যাপার কি?"

নোঙর বেঁধে 'লঞ্চ্' যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানকার নদীর দুই তীরেই ছিল এখানে-ওখানে কতগুলো ছোট-ছোট নালার মত জলপথ।

নৌকোগুলো বেরিয়ে আসছে সেই-সব নালার ভিতর থেকেই। বিজন-বাবু ভালো ক'রে দেখবার জন্যে আবার 'লঞ্চে'র ধারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, এমন সময় সেই বৃদ্ধ বললেন, "আপনিই তো বিজনবাবু ?"

বিজনবাবু ফিরে বললেন, "আপনি আমার নামও জানেন দেখছি !"

আচম্বিতে বৃদ্ধের চেহারা গেল একেবারে বদলে। যুবকের মতন সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে সেই অদ্ভুত বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ নারী-কণ্ঠে বললেন, "মশায়ের নাম জানি ব'লেই তো 'লঞ্চে'র উপরে এসে উঠেছি! সকলের পরিচয় না জানলে কি আমাদের চলে ? হা হা হা হা !"

কণ্ঠ—নারীর, কিন্তু কী তীব্র সেই অট্টহাস্য।

বিজনবাবু শান্তকণ্ঠেই বললেন, "আপনার কথার মানে বুঝতে পারলুম না।"

বৃদ্ধ বললেন, "মানে বুঝতে আর বেশি দেরি লাগবে না। আপনি সুন্দরবনের মধু-ডাকাতের নাম শুনেছেন কি ?"

বিজনবাবু বললেন, "অমন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম আবার শুনিনি ? মধু-ডাকাতের অত্যাচারে সুন্দরবনের নদীতে নদীতে আজ ব্যবসায়ীদের নৌকো চলে না বললেই হয়। মধু খালি অর্থ লুণ্ঠনই করে না, তার কবলে যারা পড়ে তাদের সকলকেই হত্যা করে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, মধুর ব্যবহারও বিশেষ মধুর নয় !" বলতে বলতে তিনি লক্ষ্য ক'রে দেখলেন, বৃদ্ধের একটা চোখ হচ্ছে পাথরের চোখ। সেই এক-চক্ষু বৃদ্ধ খনখনে মেয়ে-গলায় আবার অট্টহাস্য ক'রে উঠে বললেন, "আমিই হচ্ছি সেই মধু-ডাকাত! এখন আমার বক্তব্যটা আপনি দয়া ক'রে শুনবেন কি ?"

বিজনবাবু একথা শুনেও কিছুমাত্র বিচলিত হ'লেন না। স্থিরকণ্ঠে বললেন, "তুমি মধু কি বিষ আমি তা জানতে চাই না, কিন্তু আমার 'লঞ্চে'র উপরে তোমার আবির্ভাব কেন ?"

মধু তার লাঠিটা সশব্দে ঠুকতে ঠুকতে বললে, "আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি। আপনি একজন দানশীল ব্যক্তি আর বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ লোক। আমার নিয়ম হচ্ছে, যাদের ওপরে আমি হানা দি,

তাদের সকলকেই করি খুন। কিন্তু আপনাকে আমি খুন করতে চাই না।"

বিজনবাবু বললেন, "আমার উপরে তোমার এতটা অনুগ্রহের কারণ কি?"

—"কারণ আছে বৈকি। আপনাকে আমি এখনি কীটের মতন হত্যা করতে পারি, কিন্তু তা করব না কেন জানেন? ভীমরুলের চাকে খোঁচা না মারাই ভালো।"

—"অর্থাৎ?"

—"আপনার মতন নামজাদা লোককে আজ যদি আমি পরলোকে পাঠিয়ে দি, তাহ'লে ইহলোকে উঠবে অত্যন্ত অভদ্র-কোলাহল! কিন্তু আপনাকে প্রাণে মারব না কেবল একটি শর্তে।"

—"শর্তটা কি শুনি?"

—"আপনার আর আপনার বন্ধুদের কাছে যা-কিছু টাকাকড়ি আর মূল্যবান জিনিস আছে, সমস্তই এখনি আমার হাতে ভালো মানুষের মতন সমর্পণ করুন।"

—"তাই নাকি?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার যে-কথা সেই কাজ।"

আচম্বিতে সেই নির্জন অরণ্যবিহারী-রাত্রির বুক যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল তীব্র বাঁশীর পর বাঁশীর শব্দে!

মধু-ডাকাত সচমকে ব'লে উঠল, "ও কিসের শব্দ?"

বিজনবাবু প্রশান্তভাবে হাসতে হাসতে বললেন, "মধু-ডাকাত, বেজে উঠেছে পুলিশের বাঁশী। চেয়ে দেখ, চারিদিক থেকে ছুটে আসছে তোমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে পুলিশের মোটর-বোটগুলো। আজ তুমি ফাঁদে পা দিয়েছ!"

মধু টপ্ ক'রে তার মোটা লাঠিগাছা মাথার উপরে তুলে বিকৃত নারী-কণ্ঠে কুৎসিত ভয়াবহ গর্জন ক'রে বললে, "তাই নাকি? তাহ'লে আগে তুই-ই মর্!"

বিজনবাবু দুই পা পিছিয়ে গিয়ে চকিতে পকেটের ভিতর থেকে

একটি চক্‌চকে অটোমেটিক-রিভলভার বার ক'রে বললেন, "মধু, আমিও অপ্রস্তুত হয়ে নেই। পুলিশের অনুরোধে তোমার লীলাখেলা সাঙ্গ করবার জন্যেই আজ আমার এখানে আগমন হয়েছে!"

মধুর একটিমাত্র চক্ষু একবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠেই আবার নিবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে তীরবেগে ছুটে গিয়ে 'লঞ্চে'র ছাদের উপর থেকে মারলে এক লাফ্‌!

নদীর জলে ঝপাং ক'রে গুরুদেহ পতনের একটা শব্দ হ'ল। বিজনবাবু ছাদের ধারে গিয়ে দেখলেন, মধু গিয়ে উঠল তার নিজের মোটর-বোটের ভিতরে এবং তারপরেই চালকের আসনে ব'সে বোটখানা চালিয়ে দিলে পূর্ণবেগে!

চারিদিক থেকে যে নৌকো ও ছিপ্‌গুলো 'লঞ্চে'র দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছিল, পুলিশের মোটর-বোটগুলো তাদের উপরে গিয়েই পড়ল। তারপরই সেই চন্দ্রপুলকিত আকাশ যেন বিষাক্ত হয়ে উঠল উপরি-উপরি মনুষ্য-কণ্ঠের চিৎকারে, গর্জনে, আর্তনাদে এবং ঘন-ঘন বন্দুকের শব্দে!

কিন্তু পুলিশের একখানা মোটর-বোট সেই হাঙ্গামায় যোগ দিলে না, সেখানা দ্রুতবেগে এগিয়ে চ'লে গেল সোজা নদীর পথ ধ'রে।

সেই বোটের ভিতরে ব'সে আছে সুন্দরবাবুর সঙ্গে জয়ন্ত, মাণিক, বিমল ও কুমার।

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্‌! মধু-বেটা দেখছি আমার সেই মোটর-বোটখানা নিয়েই লম্বা দেবার চেষ্টায় আছে!"

এ-বোটখানা চালাচ্ছিল বিমল স্বয়ং। বোটের গতি যথাসম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে সে বললে, "জয়ন্তবাবু, মধুর বোট 'স্টার্ট্‌' পেয়েছে আমাদের আগেই! ওর নাগাল ধরতে পারব কিনা বুঝতে পারছি না।"

জয়ন্ত বললে, "চাঁদের আলোয় কালো রেখার মত মধুর বোটখানা সামনেই দেখা যাচ্ছে! স্পীড্‌' আরো বাড়িয়ে দিলে কি ওকে ধরতে পারা যাবে না?"

বিমল বললে, 'স্পীড্' যা বাড়িয়ে দিয়েছি তাই-ই হচ্ছে বিপদজনক। কিন্তু তবু মধু আর আমাদের মধ্যে ব্যবধান কমছে ব'লে তো মনে হচ্ছে না।"

নদী এতক্ষণ চলছিল সমান রেখায়। তারপরই খানিক দূরে দেখা গেল একটা বাঁক! মধুর বোটখানা অদৃশ্য হয়ে গেল সেই বাঁকের কাছে মোড় ফিরে। মিনিট-দেড়েক পরেই পুলিশের বোটখানাও যখন সেই বাঁকের কাছে গিয়ে মোড় ফিরলে তখন সবাই দেখতে পেলে, নদী আবার চ'লে গিয়েছে সরল রেখায় এবং মধুর বোট চাঁদের আলোয় কালো রেখার মত ছুটে চলেছে তেমনি পূর্ণবেগে।

সুন্দরবাবু উত্তেজিতস্বরে বললেন, "বিমলবাবু, আরো 'স্পীড্' বাড়ান! মধু-ব্যাটাকে আজ ধরতে হবেই।"

বিমল মাথা নেড়ে বললে, "এ-বোটের 'স্পীড্' আর বাড়াবার উপায় নেই। তবে মনে হচ্ছে, আমরা বোধকরি শেষ পর্যন্ত মধুর বোটের নাগাল ধ'রতে পারব।"

নির্জন ও নিস্তব্ধ সেই বন্য-জগতে নদীর দুই পারের বড় বড় বনস্পতিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন সবিস্ময়ে দেখতে লাগল, যন্ত্রযুগের মনুষ্যদের হস্তে চালিত দু'খানা কলের নৌকোর উল্কাগতির লীলা!

কুমার উৎসাহিতকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে বললে, "নদী আবার বেঁকে গিয়েছে। কিন্তু বোধ হচ্ছে ঐ বাঁকের কাছে গিয়েই আমরা মধুর বোট-খানাকে ধ'রে ফেলতে পারব!"

বিমল প্রাণপণে বোটের যন্ত্র সামলাতে সামলাতে দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "মনে তো হচ্ছে পারব। কিন্তু সামনের বোটখানার অবস্থা দেখছ কি?"

সত্যই তাই!

মধুর বোটখানা বাঁকের কাছে গিয়ে মোড় ফিরলে না, বিদ্যুৎ-বেগে সামনের দিকেই সমানে এগিয়ে চলল।

জয়ন্ত ত্রস্ত-কণ্ঠে বললে, "কি সর্বনাশ! মধু যে-ভাবে বোট চালাচ্ছে,

এখনি যে বিষম দুর্ঘটনা হবার সম্ভাবনা! মধু কি আত্মহত্যা করতে চায়?"

—বলতে বলতে বাঁকের কাছে মোড় না ফিরে মধুর বোটখানা তীব্রবেগে গিয়ে পড়ল নদীর পাড়ের উপরে! ভীষণ একটা শব্দ হ'ল এবং তারপরেই বোটের ভিতর থেকে লক্‌লক্ ক'রে বেরিয়ে পড়ল আরক্ত-অগ্নির সমুজ্জ্বল শিখা!

সুন্দরবাবু বললেন, "মধু-ব্যাটা বোট সামলাতে পারলে না, বোধ-হয় জ্যান্তো অবস্থায় ওকে আর ধরতে পারব না, শেষপর্যন্ত ব্যাটা আমাদের ফাঁকি দিয়েই পালাল!"

বিমল নিজের বোটের গতি ধীরে ধীরে কমিয়ে বাঁকের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। মধুর বোটের উপরে তখনো চলছে অগ্নিদেবের রক্তাক্ত নৃত্য! ··· ··· ···

··· ··· ··· কিন্তু সেই অগ্নিময়-বোটের আগুন যখন নেবানো হ'ল, তখন তার ভিতরে কোন দগ্ধ-বিদগ্ধ মানুষের দেহাবশেষ পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু মাথার টাক চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "কি আশ্চর্য! এরি মধ্যে মধুর দেহ কি পুড়ে ছাই হয়ে গেল?"

বিমল তিক্ত-হাসি হেসে বললে, "সুন্দরবাবু, আমার মনে হচ্ছে, মধু আবার বোধহয় আমাদের ফাঁকি দিলে!"

জয়ন্ত বললে, "আমারও তাই বিশ্বাস। মধু বাঁকের আড়ালে গিয়েই বোট থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে! তারপর সাঁতরে নদীর পারে গিয়ে উঠেছে! আমরা বোকার মত যখন এই শূন্য বোটের পিছনে ছুটে আসছি তখন সে জঙ্গলের কোন নিরাপদ আশ্রয়ের ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছে! আজ আর তাকে আবিষ্কার করা অসম্ভব!"

পঞ্চম

অবলাকান্ত

বিজনবাবুর প্রমোদ-তরণী সেই নদীপথেই অচল হয়ে রইল।

কেবল শশব্যস্ত হয়ে উঠল পুলিশের মোটর-বোটগুলো, তারা সুন্দরবনের এ-অঞ্চলের সমস্ত নদী-নালা দিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। এইভাবে কেটে গেল কয়েক দিন।

সেদিন প্রমোদ-তরণীর একটি কামরার ভিতরে ব'সে ছিল জয়ন্ত, মাণিক, বিমল ও কুমার। সুন্দরবাবু সেখানে ছিলেন না, তিনি চরের মুখে কি খবর পেয়ে মধু-ডাকাতের খোঁজে মোটর-বোটে চ'ড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

মাঝের কয়দিনের ভিতরে কোন ঘটনা যে ঘটেনি তা নয়। যে-রাত্রে মধু-ডাকাত পালিয়ে গিয়েছিল পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে, তারপর থেকে কেউ তার সন্ধান না পেলেও সুন্দরবনের এই অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের নৌকো আক্রান্ত হচ্ছে প্রায়ই। কিন্তু কারা আক্রমণ করছে এবং আক্রমণকারীরা কোথায় যে অদৃশ্য হচ্ছে তার কোন খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না। তবে আক্রমণের পদ্ধতি সেই একই রকমের। বোম্বেটেরা অর্থলুণ্ঠন এবং ব্যবসায়ীদের হত্যা ক'রে নৌকো পর্যন্ত নিয়ে পলায়ন করছে। সুতরাং এইসব উপদ্রবের মূলে আছে যে মধু-ডাকাতই সেটা বুঝতে কারুরই দেরি লাগল না।

সেদিন প্রমোদ-তরণীর কামরায় বসে মাণিক বলছিল, "জয়ন্ত, একটা বিষয় লক্ষ্য করেছ কি?"

—"কি?"

—"যত ডাকাতি হচ্ছে সব চৌদ্দ-পনেরো মাইলের ভিতরে। অথচ দলে দলে পুলিশ-কর্মচারী সুন্দরবনের এ-অঞ্চলের বিশ-পঁচিশ মাইল

জায়গা জুড়ে কোথাও তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজতে বাকি রাখেনি। এর মধ্যে হয়তো একটা টেনিস বল পড়লেও তারা খুঁজে বার করতে পারত। এখনো দশ-পনেরো মাইলের মধ্যে যেসব ডাকাতি হচ্ছে, সবাই বলছে সে-সব মধু-ডাকাতের কীর্তি! কিন্তু এ-কথা সত্য ব'লে মানি কি ক'রে?"

জয়ন্ত দুই চক্ষু মুদে চুপ্ ক'রে বসে রইল, কোন জবাবই দিলে না। মনে হ'ল, যেন সে কোন-একটা বিশেষ কথা নিয়ে নীরবে নাড়াচাড়া করছে। এমন সময়ে সশব্দে সুন্দরবাবুর প্রবেশ।

কামরায় ঢুকেই মাথার টুপিটা খুলে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মহা বিরক্তিভরে তিনি ব'লে উঠলেন, "হুম্! মোধো-ব্যাটার কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না! যত সব বাজে খবর!"

জয়ন্ত হঠাৎ চোখ খুলে চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে ব'সে নিজের রূপোর নস্যদানী বার ক'রে দু'-টিপ্ নস্য গ্রহণ করলে। তারপর হাসতে হাসতে বললে, "বিমলবাবু, সেই 'জেরিণার কণ্ঠহারে'র মামলাটা মনে আছে কি? সে-মামলায় আমরা সকলেই তো একসঙ্গে ছিলুম!"

বিমল ব'সে ব'সে একখানা ইংরেজি সচিত্র সাময়িকের পাতা ওলটাচ্ছিল। জয়ন্তের প্রশ্ন শুনে কাগজ থেকে মুখ তুলে বললে, "সে তো এই গেল-বছরের ব্যাপার! এত-শীঘ্র ভুলে যাবার তো কোন কারণ নেই।"

—"সেই মামলায় আমাদের বিরুদ্ধে প্রধান ভূমিকায় যে অভিনয় করেছিল, তার কথাও মনে আছে তো?"

বিমল কোন জবাব দেবার আগেই সুন্দরবাবু ব'লে উঠলেন, "ও বাবা, সে-কথা কি ভোলবার? মাত্র একখানা বাড়ির ভেতরেই সে-ব্যাটা আমাদের সকলকে রীতিমত ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল! আর শেষপর্যন্ত আমরা তাকে হাতে-নাতে গ্রেপ্তারও করতে পারিনি!"

কুমার বললে, "আপনারা কি অবলাকান্তের কথা বলছেন?"

বিমল হঠাৎ অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "অবলাকান্ত, অবলাকান্ত! জয়ন্তবাবু, আপনি খুব-একটা মস্ত প্রশ্ন করেছেন!"

সুন্দরবাবু বললেন, "এ আর মস্ত প্রশ্ন কি? অবলাকান্তের মামলা তো অনেকদিন আগেই চুকে গিয়েছে! তাকে নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে লাভ কি?"

বিমল বললে, "জয়ন্তবাবু, সেই অবলাকান্ত! যে প্রথমেই করেছিল আমাকে বন্দী, আপনাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল গলায় দড়ি দিয়ে!* আশ্চর্য সেই অবলাকান্ত! অসাধারণ সুদীর্ঘ তার অতি-কৃষ্ণবর্ণ দেহ, মুখের উপরে জেগে থাকে তার একটিমাত্র চক্ষু, কারণ তার অপর চক্ষুটি পাথরে-তৈরি, কিন্তু সেই প্রকাণ্ড পুরুষালি-চেহারার ভিতর দিয়ে নির্গত হয় একেবারেই মেয়েলি-কণ্ঠস্বর!"

জয়ন্ত বললে, "সেই অবলাকান্ত গঙ্গায় বানের টানে ঝাঁপ দিয়েছিল বটে, কিন্তু অনেক সন্ধান ক'রেও আমরা তার দেহ খুঁজে পাইনি।"

সুন্দরবাবু হঠাৎ তাঁর সেই গুরুভার দেহ নিয়ে একটি বৃহৎ লম্ফ

---

*লেখকের 'জেরিণার কণ্ঠহার' দ্রষ্টব্য।

ত্যাগ ক'রে বললেন, "হুম্! এ-সব কথার মানে কি?"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "মানেটা আপনি নিজে-নিজেই বোঝবার চেষ্টা করুন!"

কুমার বললে, "বিজনবাবুর মুখে শুনলুম, মধু-ডাকাতেরও রং হচ্ছে কালো, আর তার দেহ হচ্ছে সুদীর্ঘ। তারও একটা চোখ পাথরের আর সেও কথা কয় একেবারে মেয়েলি-গলায়। মধু-ডাকাতের সঙ্গে অবলাকান্তের চেহারার বিশেষত্ব বড্ড-বেশি মিলে যাচ্ছে!"

সুন্দরবাবু চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, "এ একটা আবিষ্কার। মস্তবড় আবিষ্কার। সেদিনকার সেই অবলাকান্তই যে আজ মধু-ডাকাত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, এ-বিষয়ে আমার আর কোনই সন্দেহ নেই। হুম্!"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, মধুই বলুন আর অবলাকান্তই বলুন, তার টিকির খোঁজ পর্যন্ত এখনো তো পাওয়া গেল না। আপনারা সুন্দরবনের এ-অঞ্চলের বিশ-পঁচিশ মাইল তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে দেখলেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিছুই আবিষ্কার করতে পারলেন না। অতএব আমাদের এখন উচিত হচ্ছে, কলকাতায় আবার ফিরে যাওয়া। বুনো-হাঁসের পিছনে কত দিন ধ'রে ছুটব?"

সুন্দরবাবু ধপাস্ ক'রে একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে প'ড়ে হতাশভাবে বললেন, "কি করব ভাই, এই মধু-ব্যাটা হয়তো ভোজবাজী জানে! সে কাছাকাছিই আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যদিও সে এই 'লঞ্চে'র ত্রিসীমানায় আসে না, তবু নৌকোর উপরে হানা দিচ্ছে দশ-পনেরো মাইলের ভিতরেই! সে কাছেই আছে অথচ তাকে দেখা যাচ্ছে না, বোধহয় সে মায়াবী—ফুস্‌মন্ত্র জানে!"

ঠিক এইসময়েই বিজনবাবুর অনুচররা কামরার ভিতরে এসে ঢুকল কয়েকখানা 'ট্রে' ভরে' খাদ্য ও চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। চমৎকৃত হয়ে গেল যেন সুন্দরবাবুর দেহ ও মুখ! তিনি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, এসেছ বাবা! বড়ই ভালো কাজ করেছ। ক্ষিদেয় পেটের নাড়ী চোঁ-চোঁ করছে!"

বিজনবাবুর অতিথি-সৎকার হচ্ছে চমৎকার। এটা হচ্ছে সুন্দরবাবুর নিজস্ব মত। কিন্তু বিমল ও কুমার এবং জয়ন্ত ও মাণিকের মত হচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টো। তারা বলে, "চমৎকার ব্যাপার যে কতখানি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে, আজ এখানে এসেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।"

প্রভাতী-চায়ের আসরে বিশ-তিরিশ-রকম টুকিটাকি খাবার; মধ্যাহ্নের খাদ্য-তালিকায় পাওয়া যাবে অন্তত পঞ্চাশ-রকম খাবারের নাম; বৈকালী-চায়ের আসরে আবার সেই বিশ-তিরিশ-রকম খাবার এবং রাত্রের ভোজের ব্যাপারটা হচ্ছে রীতিমতো গুরুতর। একদিন খাদ্য-তালিকায় সেখানে নাম পাওয়া গিয়েছিল, পঁচাত্তর-রকম খাবারের।

কুমার বললে, "বড়-মানুষ দেখাচ্ছেন বড়-মানুষী। কিন্তু খাবারের ঠ্যালায় আমাদের মতন ছোট-মানুষের প্রাণ যে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। সত্যি জয়ন্তবাবু, বিজনবাবু আমাদের খাদ্য-পর্বতের তলদেশে একেবারে পিষে মেরে ফেলতে চাইছেন। আমার মনে হচ্ছে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! কুমারবাবু, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন না। খাবারের ভয়ে কেউ যে পালিয়ে যেতে চায় এমন কথা এই প্রথম শুনলুম। কে জানে বাবা, দুনিয়ায় কতরকম লোকই আছে।"

মাণিক বললে, "ঠিক বলেছেন সুন্দরবাবু! আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম।"

সুন্দরবাবু কোনদিনই মাণিকের রসনাকে বিশ্বাস করেন না। তিনি সন্দিগ্ধ-স্বরেই বললেন, "কি রকম, তুমিও ঐ কথাই ভাবছিলে?"

মাণিক বললে, "হ্যাঁ সুন্দরবাবু। দুনিয়ায় কত রকম লোকই আছে! কোন মানুষের পক্ষীর আহার, আবার কেউ পেট ভরায় ঠিক গ্লুটনের মতন।"

সুন্দরবাবু দুই ভুরু কুঞ্চিত ক'রে বললেন, "গ্লুটন মানে?"

—"তা জানেন না বুঝি? গ্লুটন নামে এক চতুষ্পদ জানোয়ার আছে, সে যত পাবে ততই খাবে। এমন কি, যখন খেতে আর পারবে না তখনো

সে গোগ্রাসে উদর পূর্ণ করতে চাইবে।"

—"ক্ষিদে মিটে গেলে কেউ আবার খেতে চায় নাকি?"

—"গ্লুটন রা চায়। তাদের পেট যখন খেয়ে খেয়ে ফোলা-হাপরের মতন হয়ে উঠেছে, অথচ সামনের খাবার যখন শেষ হয়নি, তখন তারা কি করে জানেন?"

সুন্দরবাবু অধিকতর সন্দিগ্ধকণ্ঠে বললেন, "আমি জানি না, আর জানতেও চাই না।"

—"আহা, তবু শুনে রাখুন না! গ্লুটন্ তখন করে কি, বনের ভিতরে খুঁজে এমন দু'টো বড় বড় গাছ বেছে নেয় যাদের মধ্যের ফাঁক দিয়ে তার শরীর একেবারেই গলে না। কিন্তু গ্লুটন্ সেই অল্প ফাঁকটুকুর ভিতরেই নিজের শরীর এমন প্রাণপণে গলিয়ে দেবার চেষ্টা করে যে, দু-দিক থেকে বিষম চাপ পেয়ে তার পেটের খাবার আবার হড়্ হড়্ ক'রে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তারপর পেট যেই খালি হয়ে যায়, তখন সে আবার বাকি-খাবারগুলোকে পাঠিয়ে দেয় জোর ক'রে খালি-করা পেটের ভিতরে।"

সুন্দরবাবু অত্যন্ত মুখভার ক'রে বললেন, "এখানে হঠাৎ তোমার ঐ গ্লুটনের কথাটা মনে পড়ল কেন বল দেখি?"

মাণিক দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, "মনে পড়ল; তাই বললুম। কেন মনে পড়ল, সে কথা নাই বা বললুম।"

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "তোমার মতন হাড়-বজ্জাত ছোক্‌রা জীবনে আমি আর কখনো দেখিনি। আমি এত বোকা নই হে, কাকে লক্ষ্য ক'রে তুমি এ কথা বলছ তা বুঝতে পেরেছি! হুম্!" তিনি রাগে গস্ গস্ করতে করতে উঠে গিয়ে একখানা বড় সোফার উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন—নিজের প্রচণ্ড হজম-শক্তির দ্বারা বৃহৎ উদরের বৃহত্তর ভার খানিকটা কমিয়ে ফেলবার জন্যে।

মাণিক আর কুমার দাবাবোড়ে খেলতে ব'সে গেল। একখানা চেয়ার জানলার দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ব'সে প'ড়ে জয়ন্ত বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, নদীর ঐ তীরে সুন্দরবনের কাঁচা শ্যামলতার উপর দিয়ে

ব'য়ে যেতে যেতে চঞ্চল বাতাস দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আলো আর ছায়ার হিন্দোলা।

খানিকক্ষণ কারুর মুখে কোন কথা নেই।

বিমল হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ ক'রে ডাকলে, "জয়ন্তবাবু!"

—"কি বলছেন বিমলবাবু?"

—"আপনি সুন্দরবনের এখানকার প্রাচীন ইতিহাস জানেন?"

—"বিশেষ কিছুই জানি না।"

—"প্রাচীনকালে এখানে একটি মস্ত-বড় রাজ্য ছিল। তখন কেউ তাকে ডাকত—ব্যাঘ্রতটী ব'লে, আর কেউ ডাকত—সমতট ব'লে। এই সমতট রাজ্য এমন বিখ্যাত ছিল যে, সেকালকার চীন দেশের প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী য়ুয়ান্ চুয়াঙ্ পর্যন্ত এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। সেইসময়ে তিনি এসে দেখেছিলেন, এখানে নানাজাতীয় ধর্মোপাসকরা বাস করেন। তাঁদের কেউ জৈন, কেউ বৌদ্ধ, কেউ হিন্দু। এখানে তিনি তিরিশটি বড় বড় বৌদ্ধ-মঠ আর বিহার দেখেছিলেন, আর দেখেছিলেন হিন্দুদের একশোটি মন্দির। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক শহরে যা যা থাকে এখানেও সে সমস্তের কোনই অভাব ছিল না—অর্থাৎ নাগরিকদের অসংখ্য ঘর-বাড়ি, ধনীদের অট্টালিকা, রাজা-রাজড়াদের প্রাসাদ। কিন্তু সে সব অতীত ঐশ্বর্যের চিহ্ন এখন পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।"

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "তার কারণ?"

—"সুন্দরবনের এখানটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত জায়গা। এখানকার মাটি নাকি ক্রমাগত নিচের দিকে ব'সে যায় আর তার উপরে এসে জায়গা জুড়ে থাকে নতুন মাটি। আজও সুন্দরবনের এই অঞ্চলের অনেক জায়গা খনন ক'রে উপরকার মাটির তলায় পাওয়া গিয়েছে বড় বড় প্রাসাদ, অট্টালিকা আর ঘর-বাড়ির ভগ্নাবশেষ। আবার অনেক জায়গায় মাটি খুঁড়ে দেখা গিয়েছে, বড় বড় গাছগুলো মাটি চাপা প'ড়েও সোজা হয়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। এখানে এসে সন্ধানী-লোক যদি খোঁজ আর চেষ্টা করে, তাহ'লে পৃথিবীর গর্ভ থেকে আবিষ্কার করতে পারে

সেকালকার একাধিক ভূপ্রোথিত অট্টালিকা বা মন্দির প্রভৃতি। অবশ্য আবিষ্কার করবার জন্যে কারুকে বিশেষ সন্ধান করতে হয় না, কারণ পৃথিবীর উপরকার মাটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই অনেক সময় বোঝা যায় যে, লোকের চোখের আড়ালে এখানে লুকিয়ে আছে, অতীতের কোন-না-কোন কীর্তি!"

জয়ন্ত হঠাৎ চেয়ার ঘুরিয়ে ব'সে আগ্রহ-ভরে বললে, "তারপর?"

—"তারপর? ভারতে যখন মোগলদের সাম্রাজ্য, বাংলার মহাবীর প্রতাপাদিত্য যখন স্বাধীনতার তূর্যধ্বনি করছেন, তখনো এখানে আবার নতুন ক'রে মানুষের বসতি—অর্থাৎ শহর বা গ্রাম বসাবার চেষ্টা হয়েছিল। তখনো এখানে সুন্দরবনের কেঁদো-বাঘের হুঙ্কারের চেয়ে ঢের বেশি শোনা যেত নাগরিক মানুষদের মিষ্ট কণ্ঠস্বর। কিন্তু তার পরই এখানে শুরু হয়, পর্তুগীজ-বোম্বেটেদের অমানুষিক অত্যাচার। তারা ডাঙায় নেমে লুট্‌পাট্‌ই করত না, সেইসঙ্গে ধ'রে নিয়ে যেত অগুন্তি মেয়ে, পুরুষ আর বালক-দেরও। পাছে সেই বন্দীরা জলদস্যুদের জাহাজ থেকে জলে লাফিয়ে পালিয়ে যায়, সেইজন্যে তাদের অনেককে কি-রকম ক'রে ধ'রে রাখা হ'ত জানেন?"

এতক্ষণে সুন্দরবাবুর প্রায় ঘুমন্ত আগ্রহ সম্পূর্ণ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। তিনি ধড়্‌মড় ক'রে সোফার উপরে উঠে প'ড়ে বললেন, "বিমলবাবু, আপনার গল্পটি ভারি 'ইন্টারেস্টিং' লাগছে!"

—"এ গল্প নয় সুন্দরবাবু, এ-সব হচ্ছে, ইতিহাসের কথা।"

—"মানলুম। কিন্তু ঐ পাজী পর্তুগীজরা বাঙালী বেচারীদের জাহাজের উপরে নিয়ে গিয়ে কি রকম ক'রে ধ'রে রাখত?"

—"জাহাজের পাটাতনের তলায় যেখানে দশজন লোক ধরে না সেইখানে ঢুকিয়ে দিত হয়তো একশো'জন বাঙালীকে। তারপর তাদের প্রত্যেকের হাত পেরেক বা হুক্ মেরে জাহাজের কাঠের সঙ্গে সংলগ্ন ক'রে দিত। তাদের বাস করতে হ'ত ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে, তাদের কেউ শুতে পেত না—কারণ পা ছড়াবার মতন ঠাঁই সেখানে থাকত না। কিন্তু

তাদের বাঁচিয়ে না রাখলে চলবে না, কেননা দেশ-বিদেশে গোলামরূপে তাদের বিক্রি করবার জন্যেই গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'ত। অতএব তাদের মাঝে মাঝে কিছু জল আর কিছু কিছু ক'রে অসিদ্ধ শুকনো চাউল খেতে দেওয়া হ'ত। বুঝতেই পারছেন, এ-অবস্থায় মানুষ বাঁচতেই পারে না। যাদের নিতান্ত কইমাছের প্রাণ, তারাই বেঁচে থাকত কোন-গতিকে—অর্থাৎ দুইশত জনের মধ্যে হয়তো পঁচিশ কি তিরিশটি প্রাণী।"

কুমার ও মাণিক দাবাবোড়ে খেলা ভুলে গিয়ে শিউরে উঠে একসঙ্গে বললে, "কী ভয়ানক!"

বিমল বললে, "ঐ মহাপাপিষ্ঠ পর্তুগীজ-বোম্বেটেদের অত্যাচারেই শেষটা সুন্দরবন একেবারেই জনশূন্য হয়ে গেল। মানুষের বদলে এই দেশে শেষটা বেড়ে উঠতে লাগল, ব্যাঘ্র আর বন্য জন্তুদের বংশ।"

জয়ন্ত হঠাৎ নিজের আসন ত্যাগ ক'রে উঠে বিমলের সামনে এসে ব'সে বললে, "বিমলবাবু, আজ হঠাৎ আপনি পুরাতন ইতিহাসের কথা তুললেন কেন?"

জয়ন্তের মুখের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিমল হাসতে হাসতে বললে, "আমি নিজের দেশের প্রাচীন ইতিহাস ভালোবাসি। আর অবসর পেলে মাঝে মাঝে একটু-আধটু প্রত্নতত্ত্বের চর্চাও করি। আজ আমার কি ইচ্ছা হচ্ছে জানেন?"

—"বলুন!"

—"আপাতত দেখছি সুন্দরবাবুর হাতে কোনই কাজ নেই। মধু-ডাকাত অদৃশ্য, তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে দলে দলে পুলিশের চর। মধু দশ-পনেরো মাইলের ভিতরে ডাকাতি করছে, অথচ এখনো তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। যদি ইতিমধ্যে মধুর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহ'লে সুন্দরবাবুই তার জন্যে বিজনবাবুর এই 'লঞ্চে' ব'সে অপেক্ষা করুন। এই ফাঁকে আমি আর কুমার আর আমাদের বাঘা, আর আমাদের রামহরি যদি সুন্দরবনের খানিকটা ঘোরাঘুরি ক'রে দেখি, তাতে আপনাদের কিছু আপত্তি আছে কি?"

সুন্দরবাবু বললেন, "হঠাৎ এই বিপদ-ভরা বনে-জঙ্গলে ছুটোছুটি ক'রে আপনাদের কি লাভ হবে ?"

—"লাভ হয়তো কিছুই হবে না। মানুষ বসবার বা দাঁড়াবার বা শুয়ে ঘুমোবার জন্যে ছোটাছুটি করে না। ছোটবার জন্যেই সে ছোটে।"

—"হুম্! ছুটে কোথায় যাবেন ?"

—"কোথাও না। থাকব এই সুন্দরবনেই। তবে আমার কৌতূহল যখন জেগেছে তখন ছুটোছুটি ক'রে একবার দেখবার চেষ্টা করব, এ-অঞ্চলের কোথাও প্রাচীন-কীর্তির কোন চিহ্ন আছে কিনা ?"

—"চিহ্ন মানে ?"

—"চিহ্ন মানে ? আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে যে, এখানকার কাছাকাছি কোন-এক জায়গায় এমন কোন প্রাচীন বৌদ্ধ-বিহার বা প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে, যা খুঁজে বার করতে পারলে বাংলার অতীতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে উঠবে।"

—"পাগলের কথা! অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়াবার জন্যে আমি বাঘ বা অজগরের পেটের ভিতরে ঢুকতে রাজি নই।"

জয়ন্তের দুই চক্ষু জ্ব'লে উঠল। সে বললে, "বিমলবাবু, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।"

মাণিক দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আমিও!"

সুন্দরবাবু বললেন, "বাব্বাঃ! যত পাগলের পাল্লায় এসে পড়েছি! আমি এক পা-ও নড়ছি না, আমি এইখানেই অচল শিব-লিঙ্গের মতন ব'সে থাকব। 'ডিউটি ইজ ডিউটি'! হুম্!"

ষষ্ঠ

অজগরের কুণ্ডলী

সেদিন রাত্রে হঠাৎ এল ঝম্‌ঝম্‌ ক'রে বৃষ্টি।

তখন বর্ষাকাল নয় বটে, কিন্তু সুন্দরবনের এ-অঞ্চলটা হচ্ছে বঙ্গোপ-সাগরের একেবারে পাশেই। এখানে সমুদ্রের উদ্দাম ঝোড়ো-হাওয়া কোথা থেকে কখন যে বিদ্যুতাগ্নি-ভরা জলবর্ষি কালো মেঘকে টেনে আনবে, কেউ তা আন্দাজ করতে পারে না।

প্রায় ঘণ্টা-তিনেক ধ'রে হু হু ঝোড়ো-বাতাসে এই অরণ্য-জগতের চতুর্দিকে প্রলয়-হাহাকার জাগিয়ে সেই জল-ভরা কালো মেঘ চাঁদকে আবার মুক্তি দিয়ে চ'লে গেল কোথায়!

বিমল ও জয়ন্তের দল পরদিন প্রভাতে যখন ধারালো দৃষ্টি দিয়ে সুন্দরবনের শ্যামল দেহকে ব্যবচ্ছেদ করবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল, তখনো চারিদিকে থই থই করছে জল আর জল। যেখানে জল নেই সেখানে কর্দমের রাজত্ব।

মাণিক বললে, "বিমলবাবু, অন্তত আজ আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। দেবতা আমাদের ওপরে বিরূপ। বরুণদেবের অভিশাপে পথ আর বিপথ এত বেশি দুর্গম হয়ে উঠেছে যে, আজ আমাদের অভিযান হয়তো একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

বিমল হেসে বললে, "আমার ঘর পালানো মন যখন অজানা পথের ডাক শুনতে পায়, তখন দেবতা বা দানব কারুর বাধাই আমি মানি না।"

জয়ন্ত বললে, "আমারও মন আজ প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আপনার মনেরই সঙ্গী হবে। ইচ্ছা প্রবল হ'লে জল-কাদা-জঙ্গল মানুষকে কোন বাধাই দিতে পারে না।"

পিছন থেকে রামহরি গজ গজ করতে করতে বললে, "মাণিকবাবু ঠিক কথাই বলেছেন! কিন্তু এই জয়ন্তবাবুটি দেখছি আমাদের খোকা-বাবুরই মতন মাথা-পাগ্‌লা। এক পাগ্‌লাকেই সামলাতে পারি না,

আজ ডবল্-পাগ্লাকে নিয়ে হাড় জ্বালাতন হবে দেখছি। কিগো কুমার-বাবু, তোমার ইচ্ছেটা কি শুনি?"

কুমার হাসতে হাসতে বললে, "রামহরি, তুমি কি জানো না যে, বিমলের ইচ্ছা আর আমার ইচ্ছা এক?"

রামহরি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "তা জানি না আবার। তবু কথার কথা জিজ্ঞাসা করছিলুম। কিন্তু বাঘা-বেচারীকে এখানে মিছিমিছি টেনে এনে কি লাভ হ'ল? হ্যাঁরে বাঘা, এই বিচ্ছিরি জল-কাদা-জঙ্গল তোর কি ভালো লাগবে?"

বাঘা যেন রামহরির কথার প্রতিবাদ করবার জন্যেই বিপুল পুলকে ঘন-ঘন লাঙ্গুল আন্দোলন করতে করতে ঠিক পাশের একটি ছোট্ট নালার জলে ঝম্প প্রদান ক'রে সচিৎকারে ব'লে উঠল, "ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ।"

রামহরি রেগে টং হয়ে বললে, "যেমন মনিব, তেমনি কুকুর। নাঃ, এখানে আর আমার কোন কথা কওয়াই উচিত নয়।"

তারপর আরম্ভ হ'ল যাত্রা। আর সে কী যাত্রা! পদে পদে সে কী বাধা! কোথাও কোমর-ভোর ঘোলা জল, কোথাও হাঁটু-ভোর পুরু কাদা, কোথাও সূর্যালোকে সমুজ্জ্বল দিবসেও অমাবস্যার রাত্রির মতন অন্ধকার-জঙ্গলের অন্তঃপুর, কোথাও কাঁটাঝোপের পর কাঁটাঝোপের সুতীক্ষ্ণ দংশন!

তবু তারা অগ্রসর হয়েছে। তারা জলাভূমি মানলে না, জঙ্গলের যত অদৃশ্য বিভীষিকাকে মানলে না, মনুষ্য-পদচিহ্নহীন অপথ, বিপথ বা কুপথ কিছুই মানলে না। তারা সঙ্গে ক'রে এনেছিল তিনখানা ছোট-ছোট অতিশয় হাল্কা রবারের নৌকো, স্থলপথ শেষ হয়ে গিয়ে যেখানে আসে জলপথের পর জলপথ, সেই নৌকোর উপরে আরোহণ ক'রে তারা এই নদী-বহুল সুন্দরবনের বাধাকে সরিয়ে দেয়।

একাধিক বিষাক্ত সাপেরও দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু তারা গত-রাত্রের ঝড়-বৃষ্টিতে এমন অসহায় হয়ে পড়েছে যে, ঘৃণ্য মানুষদের দেখেও কোন-রকম আক্রমণ এমন কি পালাবার চেষ্টা পর্যন্ত করলে না। কোন

কোন জলপথে দু-চারটে কুমীরের প্রলুব্ধ মুখও দেখা গেল, কিন্তু দলের কারুর-না-কারুর বন্দুকের আওয়াজ শুনেই আবার তারা তলিয়ে গেল অতল তলে।

কিন্তু তাদের সব-চেয়ে জ্বালাতন করছিল সুন্দরবনবিহারী অসুন্দর মশকের দল! তারা স্থলে বা জলে যেখান দিয়েই যাচ্ছে সেইখানেই ঐ মশকেরা হ'তে চাচ্ছে যেন তাদের সহযাত্রী! আর কী যাতনাদায়ক সহযাত্রী তারা! মশক-রাজ্যের জাতীয়-সঙ্গীত গাইতে গাইতে নিষ্ঠুর আনন্দে তারা বিমল ও জয়ন্ত প্রভৃতির দেহের অনাবৃত অংশের উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল এবং সঙ্গে-সঙ্গে সকলের দেহকে ক'রে তুললে স্ফীত, রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত।

এমন কি, বাঘা পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তার রোমশ-দেহও সুন্দর-বনের মশাদের হুলগুলোকে ঠেকাতে পারলে না। সে বারংবার উর্ধ্বমুখে লম্ফত্যাগ ক'রে এক-এক গ্রাসে দলে দলে মশককে গলাধকরণ করলে বটে, কিন্তু তবু এই ভয়াবহ পতঙ্গদের অত্যাচার কিছুমাত্র কমলো ব'লে মনে হ'ল না।

সকাল থেকে বৈকাল পর্যন্ত এইভাবে পথ আর বিপথের ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে কেটে গেল। কিন্তু প্রায় মাইল-পনেরো ঘোরাঘুরি ক'রেও তারা এই অরণ্য-জগতের ভিতর থেকে সেকালকার মানুষের হাতে-গড়া একখানা পুরাতন ইষ্টক পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারলে না। এখানে পৃথিবীর প্রাণীদের মধ্যে সাড়া দিচ্ছে খালি গাছে-গাছে বানর ও নানা-জাতের পাখীরা। সুন্দরবন যে-সব হিংস্র ও চতুষ্পদ জীবের জন্যে বিখ্যাত, তাদেরও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বোধহয় গত-রাত্রের ঝড়-বৃষ্টির তাল সামলাতে সামলাতে তারাও আজ বিব্রত হয়ে আছে।

বৈকাল যখন কেটে গেল তারা উদরের অতি-জাগ্রত অগ্নিদেবকে তুষ্ট করবার জন্যে এক-জায়গায় ব'সে পড়তে বাধ্য হ'ল। সঙ্গে ছিল 'স্যাণ্ড্‌উইচ্', সিদ্ধ ডিম, মর্তমান কদলী আর 'ফ্লাস্ক্'-ভরা গরম চা!

আহার-পর্ব যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, জয়ন্ত হঠাৎ সচমকে ব'লে

উঠল, "একি ব্যাপার বিমলবাবু?"

—"কি?"

—"নীচের দিকে তাকিয়ে দেখুন।"

বিমল কর্দমাক্ত-পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে নির্বাক হয়ে গেল ক্ষণকালের জন্যে। তারপরে বিস্মিতস্বরে বললে, "এযে দেখছি নতুন মানুষের পায়ের দাগ! এতক্ষণ পর্যন্ত এই গভীর অরণ্যে একজন মানুষকেও দেখতে পেলুম না, কিন্তু এখানে এই পায়ের দাগ এল কেমন ক'রে? এ-পায়ের দাগ তো পুরানো নয়! কাল রাতে উচ্ছল-ধারায় যে বৃষ্টি হয়ে গেছে, মাটির উপরকার যে-কোন পুরানো পায়ের দাগ তাতে বিলুপ্ত না হয়ে পারে না! এ হচ্ছে এমন-কোন মানুষের পায়ের দাগ, যে একটু আগেই এখানে ছিল বিরাজমান!"

জয়ন্ত বললে, "এ-পায়ের দাগ যে আমাদের নয়, সে-কথা বলাই বাহুল্য। কারণ আমাদের সকলেরই পায়ে আছে জুতো, আর এই পদ-চিহ্নের অধিকারী এখানে এসেছে পাদুকাহীন শ্রীচরণ নিয়ে! সে যে আমাদের পরে এসেছে, এ-বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। কারণ, প্রায় সব জায়গাতেই তার পায়ের ছাপ পড়েছে আমাদের পদচিহ্নের উপরেই! কে সে?"

কুমার দু-চারবার এদিকে-ওদিকে ঘুরে বললে, "এই নগ্নপদের মালিক ঢুকেছে পাশের ঐ বনের ভিতরে, কারণ পদচিহ্নগুলো হঠাৎ বেঁকে ঐ জঙ্গলের ভিতর গিয়ে অদৃশ্য হয়েছে।"

ইতিমধ্যে বাঘা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সচেতন! সে যেন সকলকার কথা বুঝতে পারলে! এতক্ষণ সে থেবড়ি খেয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ব'সেছিল এই বৈকালী-ভোজের 'স্যাণ্ডউইচ্' বা সিদ্ধ ডিমের দু-এক টুকরো লাভ করবার জন্যে। কিন্তু এখন হঠাৎ এই নতুন পদচিহ্নের আঘ্রাণ নিয়ে দুই কান খাড়া ক'রে গর্র্ গর্র্ চাপা গর্জন ক'রে উঠল! তারপর অতি-লোভনীয় 'স্যাণ্ডউইচ্' প্রভৃতির কথা একেবারে ভুলে গিয়ে সেই নগ্ন-পদের চিহ্ন শুঁকতে শুঁকতে ঢুকে গেল পাশের একটা অন্ধকার জঙ্গলের

ভিতরে।

কুমারও ছুটল তার পিছনে পিছনে। এবং দলের বাকি সকলেই বিনা বাক্যব্যয়ে বাধ্য হ'ল তারই পশ্চাৎ অনুসরণ করতে।

কিন্তু জঙ্গলের ভিতরে কারুকেই পাওয়া গেল না। সেখানে পদচিহ্ন দেখেও অগ্রসর হবার উপায় নেই, কারণ, মাটির উপরটা আচ্ছন্ন ক'রে আছে সুদীর্ঘ আগাছার দল।

সকলে আবার জঙ্গলের বাইরে এসে দাঁড়াল।

জয়ন্ত বললে, "ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এই বনের ভিতরে চোখের সামনে আমরা কোন মানুষকে দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু আমাদের পিছনে পিছনে নিশ্চয়ই এসেছে কোন লোক। নিশ্চয়ই সে আমাদের গতিবিধির ওপরে লক্ষ্য রাখছিল, কিন্তু হঠাৎ আমরা বৈকালী-ভোজের জন্যে এইখানে ব'সে পড়েছি দেখে, ধরা পড়বার ভয়ে পাশের জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।"

বিমল বললে, "কিন্তু মাটির উপরে তাকে পা ফেলে আসতে হয়েছে। সে যে কোথা থেকে এসেছে এই মাটির উপরেই তার চিহ্ন লেখা আছে। তাকে যখন পেলুম না তখন দেখা যাক্, সে আমাদের পিছনে পিছনে এসেছে কোন্ অন্তরাল থেকে।"

জয়ন্ত আগেই দাঁড়িয়ে উঠেছিল। সে বললে, "বিমলবাবু, ঠিক বলেছেন। আসুন, এইবার সেই চেষ্টাই করা যাক্।"

মাণিক বললে, "আমরা এসেছিলুম সুন্দরবনের ভিতর থেকে কোন পুরাকীর্তির সন্ধান করতে। কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে উঠেছে এখন গোয়েন্দা-কাহিনীর মতন।"

জয়ন্ত বিরক্তকণ্ঠে বললে, "মাণিক, তুমি মূর্খের মতন কথা কয়ো না।"

—"আমি কি মূর্খের মতন কথা কয়েছি? তাহ'লে ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দাও।"

—"ছিঃ! মাণিক, এতকাল আমার সঙ্গে থেকেও তুমি যে এমন বোকার মত কথা কইবে, তা আমি জানতুম না। বোঝাবুঝির কথা হবে

পরে, এখন আগে দেখতে হবে এই নগ্নপদের চিহ্নগুলো এসেছে কোথা থেকে !”

সকলে আবার ফির্‌তি-পথে অগ্রসর হ'ল। পুরু কাদার উপরে পায়ের চিহ্নগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। সকলে তাই দেখে এগুতে-এগুতে প্রায় দেড়-মাইল পথ পার হয়ে গেল। তারপরই দেখা গেল পদচিহ্নগুলো প্রবেশ করেছে এমন-এক প্রচণ্ড অরণ্যের মধ্যে, যেখানে কোন জীবের পক্ষে যাতায়াত করবার কল্পনা করাও অসম্ভব !

কী অন্ধকার অরণ্য ! সূর্যের আলোক এখনো নির্বাপিত হয়ে যায়নি, কিন্তু সে-অরণ্যের মধ্যে দৃষ্টি চালনা করতে গেলেও চক্ষু যেন নিরন্ধ্র-অন্ধকারের নিরেট প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে পালিয়ে আসতে চায় ! তবু সকলেই টর্চের আলো জ্বেলে সেই নিস্তব্ধ ও নির্জন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলে।

আশ্চর্য ব্যাপার। অমন যে দুর্গম বন-জঙ্গল, তার ভিতরেও গাছ-পালা ও কাঁটা-ঝোপ কেটে কারা যেন পথ তৈরি ক'রে নিয়েছে ! সুদীর্ঘ তৃণ ও আগাছা-ঢাকা মাটির উপরে আর কারুর পদচিহ্ন দেখা যায় না বটে, কিন্তু ভুল হবার কোনই উপায় নেই। কারণ এই গভীর অরণ্যের বাধাকে সরিয়ে দিয়ে একটা সংকীর্ণ পথের রেখা বরাবরই চ'লে গিয়েছে সামনের দিকে ! সে-পথের এ-পাশে অন্ধকার, ও-পাশে অন্ধকার, তার উপরদিকেও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ! সকলের মনে হ'ল, এই তিমিরাবগুণ্ঠিত অদ্ভুত পথ দিয়ে অগ্রসর হ'লে একটু পরেই যেন প্রবেশ করা যাবে, রহস্যময় অন্ধকারের নিজস্ব অন্তঃপুরের মধ্যে !

কিন্তু হঠাৎ শেষ হয়ে গেল পথ। পাওয়া গেল একটি ছোট ময়দানের মতন জায়গা। সেখানে মাথার উপরকার আকাশে তখনো জেগে আছে অস্তোন্মুখ সূর্যের আলোক-আশীর্বাদ !

আচম্বিতে সেই মহা নির্জন ও মহা নিস্তব্ধ অরণ্য-ভূমির গভীর নিদ্রা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল যেন উপর্যুপরি ভীষণ দুই শব্দে !

—গুড়ুম ! গুড়ুম !

গর্জন ক'রে উঠেছে রামহরির বন্দুক। সঙ্গে সঙ্গে রামহরির এক প্রচণ্ড পদাঘাত খেয়ে বিমল পাঁচ-ছয় হাত দূরে ঠিক্‌রে গিয়ে পড়ল।

ততক্ষণে আর সকলেই সচেতন হয়ে সভয়ে দূরে স'রে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। রামহরি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বিমলের হাত ধ'রে টেনে তুলে কাতরকণ্ঠে বললে, "খোকাবাবু, তোমাকে আমি লাথি মেরে যে পাপ করেছি, ভগবান আমাকে তার জন্যে ক্ষমা করুন! ঐ গাছটার ওপর থেকে মস্ত-বড় একটা অজগর তোমার ওপরে ঝাঁপ খেতে আসছিল! বন্দুকের দুই গুলিতে আমি তার মাথা গুঁড়ো ক'রে দিয়েছি! অজগরটা ছট্‌ফট্ করতে করতে ঐ বড় ঝোপটার ভেতরে গিয়ে পড়েছে।"

তখন সেই ঝোপ্‌টাও হয়ে উঠেছে আশ্চর্যরূপে জীবন্ত। তার অনেক গাছ-আগাছা তীব্র বেগে ছট্‌কে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ছে—যেন তার মধ্যে অভিনীত হচ্ছে এক ভয়াবহ বিরাটের নাটকীয় লীলা!

বাঘা মহা ক্রোধে গর্জন ক'রে ছুটে যাচ্ছিল সেইদিকে। কুমার একলাফে তার উপরে গিয়ে প'ড়ে তাকে দুই-হাতে জড়িয়ে ধ'রে বললে, "ওরে বাঘা, তুই কি জানিস্ না, অজগরের মৃত্যু-যন্ত্রণা? তার দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেলেও তার সর্বাঙ্গ কুণ্ডলিত হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে? সেই মৃত-অজগরের জীবন্ত দেহের কুণ্ডলের ভিতরে গিয়ে পড়লে যে-কোন গণ্ডার বা হাতী পর্যন্ত পরলোকে যাত্রা করতে পারে?"

ইতিমধ্যে বিমল সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। রামহরির একটা কথাও আমলে না এনে চিৎকার ক'রে সে বললে, "কোন কথা না ব'লে সবাই এখান থেকে পালিয়ে এস! চল, আমরা ও-পাশের ঐ ঝোপ্‌টার ভিতরে গিয়ে ঢুকি।"

একটা অতি অন্ধকার জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে সবাই যখন আত্ম-গোপন করলে মাণিক তখন সুধোলে, "বিমলবাবু, অজগরের মাথা তো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে, সে তো আমাদের আর তেড়ে এসে আক্রমণ করতে পারত না? তবে তাড়াতাড়ি আমাদের এখানে পালিয়ে আসতে বললেন কার ভয়ে?"

জয়ন্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "মাণিক, তোমার নির্বুদ্ধিতা দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাব বলে মনে হচ্ছে! তুমি কি এটুকু বুঝতে পারছ না যে, আমরা এক পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতরে এসে ঢুকেছি, মানুষের হাতে-কাটা এক অভাবিত পথ দিয়ে? নিশ্চয়ই আমরা এসে পড়েছি শত্রুপুরীতে। এখান থেকেই কোন চর গিয়েছিল আমাদের পিছনে-পিছনে! চর যারা পাঠিয়েছিল তারা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে নেই! যদিও বা ঘুমিয়ে থাকল, দু-দু'বার বন্দুকের গর্জনে ভেঙে গিয়েছে তাদের ঘুম! এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে কোনদিন কোন মানুষ আসে না, অথচ এখানে বন্দুক গর্জন ক'রে উঠল দু-দু'বার! বন্দুকের গর্জন জানায় মানুষের অস্তিত্ব! তুমি কি মনে করছ যারা আমাদের পিছনে চর পাঠিয়েছিল তারা এখনো অন্ধকার থেকে আলোকে এসে হাজির হয় নি? তারা অজগরেরও চেয়ে ভয়ানক! বিমলবাবু ঐজন্যেই বলছিলেন তোমাদের লুকিয়ে পড়তে!"

কুমার বললে, "জয়ন্তবাবু, আমি আপনাদের সব-শেষে এই জঙ্গলে এসে ঢুকেছি। কিন্তু ঢোকবার আগেই কি দেখলুম জানেন? ডানদিকে

খানিক দূরে জেগে আছে একটা পাহাড়—পাহাড়ই বা বলি কেন, খুব-উঁচু ঢিপির মতন একটা জায়গা, আর তারই তলা থেকে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা মানুষ! বোধহয় একটা নয়, তারও পিছনে পিছনে যেন দেখলুম আরো দু-চারটে মাথা!"

হঠাৎ মাণিক বললে, "চুপ্! জঙ্গলের বাইরে যেন কাদের গলা পাওয়া যাচ্ছে।"

দু-তিনজন লোকের অস্ফুট কণ্ঠস্বর শোনা গেল বটে।

কিন্তু তার পরেই জাগ্রত হয়ে উঠল এক ভয়ঙ্কর, বীভৎস আর্তনাদ! রাত্রির নিস্তব্ধ আকাশ যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

বিমল বললে, "জয়ন্তবাবু, কিছু বুঝতে পারছেন কি? অভাবিতরূপে এখানে বন্দুক গর্জন ক'রে উঠল কেন তাই জানবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে কেউ কেউ ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়েছে। তারপর একটা জঙ্গল ঘন ঘন আন্দোলিত হ'চ্ছে দেখে তারা ঢুকেছিল ঐ জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে। তার ভিতরে পাক্‌সাট্ খাচ্ছিল মৃত অজগরের দেখ্‌তে-জীবন্ত সুদীর্ঘ দেহ! তারই দেহের পাকের ভিতরে গিয়ে প'ড়ে কোন নির্বোধ হতভাগ্যকে এখন ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছে!"

সেই জঙ্গলের বাইরে দূর থেকে শোনা গেল অনেকগুলো মানুষের কণ্ঠস্বর। তারা যে কি বলছে তা বোঝা গেল না বটে, কিন্তু তারা যে উপকারী বন্ধু নয় এইটুকু বুঝে বিমল ও জয়ন্ত প্রভৃতি একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইল। পাছে বাঘা পশু-বুদ্ধির উত্তেজনায় আচম্‌কা চিৎকার ক'রে ওঠে, সেই ভয়ে কুমার দুই হাত দিয়ে তার মুখ ভালো ক'রে চেপে রইল।

সকলে অপেক্ষা করতে লাগল রুদ্ধশ্বাসে। যেন কোন বিপদ এখনি এসে পড়বে তাদের স্কন্ধের উপরে।

কিন্তু তাদের সৌভাগ্যক্রমে কোন বিপদেরই সূচনা হ'ল না। বাইরের কণ্ঠস্বরগুলো নীরব হয়ে গেল ধীরে ধীরে। তারপরে জাগ্রত হয়ে রইল শুধু সুন্দরবনের বনস্পতিদের অনন্ত মর্মর ভাষা এবং চন্দ্রপুলকিত রজনীর ঝর ঝর জ্যোৎস্না-ধারা।

কেউটের জঙ্গলে

জয়ন্ত হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গলের ভিতর থেকে খুব ধীরে ধীরে বাইরের দিকে এগিয়ে এল। তারপর একটা ঝোপ্ একটু ফাঁক্ ক'রে মুখ বাড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বললে, "কোনদিকে কেউ নেই। একটু আগে এখানে যে একটা মস্ত-বড় ট্রাজেডি হয়ে গেছে, সেটাও আর বোঝবার উপায় নেই। কেবল অজগর সাপের জঙ্গলটা এখনো তেমনি ছট্‌ফটিয়ে দুলে দুলে উঠছে।"

রামহরি বললে, "ও বাবা, তাহ'লে মরাকেও ভয় করতে হয়!"

মাণিক বললে, "জয়ন্ত আর আমি যখন কাম্বোডিয়ায় ওঙ্কারধামের জঙ্গলে গিয়েছিলুম, তখনও এর চেয়ে দু-গুণ বড় একটা ভয়ঙ্কর অজগর আমাদের আক্রমণ করেছিল। সেই অজগরটা মরবার চব্বিশ ঘণ্টা পরেও পাক্‌সাট্ খেতে ছাড়েনি।"*

হঠাৎ পিছন থেকে ফোঁস ক'রে একটা তীব্র গর্জন শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে চম্‌কে বিদ্যুৎ-বেগে পিছন ফিরে সকলেই ত্রস্তনেত্রে দেখলে, কুমার ছিট্‌কে একদিকে গিয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে মাটির উপরে আছড়ে পড়ল এবং বাঘা প্রচণ্ড এক লাফ্ মেরে আক্রমণ করলে প্রকাণ্ড একটা কেউটে সাপকে! এ সাপুড়েদের রুগ্ন, কৃশ, প্রায়-অনাহারী পোষ-মানা সাপ নয়, এ হচ্ছে একেবারে স্বাধীন সর্প। লম্বায় প্রায় সাত-আট হাত আর তার দেহের বেড়ও প্রায় আট-দশ ইঞ্চি! বাঘা অত্যন্ত জোয়ান ও বৃহৎ কুকুর। সে একেবারে গিয়ে কেউটেটার গলা কামড়ে ধ'রেছিল বটে, কিন্তু সাপটা ঠিক অজগরের মতই বাঘার সর্বাঙ্গকে নিজের দেহের পাক্ দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলে যে, সে-বেচারী দেখতে দেখতে সাপের গলা কামড়ে ধ'রেই মাটির উপর শুয়ে প'ড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। দেখেই বোঝা গেল, কেউটে মরলেও বাঘার বাঁচবার কোন উপায়ই নেই!

* লেখকের "পদ্মরাগ বুদ্ধ" দ্রষ্টব্য।

কুমার পাগলের মত মাটির উপর থেকে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই সর্পের মারাত্মক আলিঙ্গনে বদ্ধ তার প্রিয়তম বাঘার দেহের উপরে। তারপর অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একখানা বৃহৎ ছুরি বার ক'রে সাপটার দেহকে নানা জায়গায় আঘাত ক'রে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে দিলে।

রামহরি ব'লে উঠল, "খবরদার বাঘা, সাপটার মুণ্ডু এখনো ছাড়িস্ নে! শুনেছি কেউটেদের কাটা মুণ্ডুও লাফ্ মেরে মানুষদের কামড়ে দেয়!"

বাঘা মানুষ-রামহরির ভাষা হয়তো বুঝলে না, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর জীবদের যে সহজাত বুদ্ধি থাকে বাঘার ঘটে সেটুকুর অভাব ছিল না। কুমার যখন কেউটের দেহের পাক্ কেটে তাকে মুক্তিদান করলে, তখনো সে সাপের মুণ্ডটাকে ত্যাগ করতে রাজি হ'ল না। এবং সত্য-সত্যই সেই দেহহীন মুণ্ডটা তখনো তাকে দংশন করবার চেষ্টা করছিল।

কুমার আবার তার সেই সুদীর্ঘ ও তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়ে সাপটার মুণ্ডটাকে কুচিকুচি ক'রে প্রায় আট-দশ খণ্ডে বিভক্ত ক'রে দিলে। বাঘা তখন সর্প-মুণ্ডের অবশিষ্ট অংশ ত্যাগ ক'রে থেব্ড়ি খেয়ে ব'সে রক্তাক্ত জিহ্বা বার ক'রে হা-হা ক'রে হাঁপাতে লাগল।

মাণিক ত্রস্তকণ্ঠে বললে, "বাবা, কেউটে আবার এত বড় হয়! এ যে প্রায় একটা ময়াল সাপ!"

জয়ন্ত বললে, "বাঘা দেখছি অদ্ভুত এক সাহসী কুকুর। ও না থাকলে আজ বোধহয় কেউটের বিষে আমাদের দু-তিনজনকে মরতেই হ'ত!"

রামহরি বাঘাকে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে বললে, "খোকাবাবু, এ সর্বনেশে জঙ্গলের ভিতরে আর থাকা নয়। তাড়াতাড়ি খোলা-জায়গায় বেরিয়ে পড়ি চল।"

বিমল বললে, "আমারও সেই মত। অজগর এলেন, কেউটে এলেন, অতঃপর আবার কে আসবেন কিছুই বলা যায় না। মানুষ-শত্রুকে আমি ভয় করি না, কিন্তু এই বুকে-হাঁটা হিল্‌বিলে জীবদের কাছ থেকে যত তফাতে থাকা যায়, ততই ভালো।"

সকলে একে একে জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায়

এসে দাঁড়াল।

কুমার একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বললে, "জয়ন্তবাবু, ঐ দেখুন সেই মস্ত-বড় মাটির স্তূপটা। ওটা বোধহয় পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু। প্রায় ছোট-খাটো একটা পাহাড় বললেই চলে।"

জয়ন্ত বিস্মিতকণ্ঠে বললে, "এমন সমতল জমির উপরে হঠাৎ অত বড় একটা মাটির স্তূপের সৃষ্টি হ'ল কেমন ক'রে?"

বিমল বললে, "এ-রকম মাটির স্তূপ সুন্দরবনের আরো কোন কোন জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। আপনি কি 'ভরত-ভায়নার' স্তূপের নাম শোনেন নি?"

—"না।"

—"ঐ 'ভরত-ভায়নার' স্তূপ এ অঞ্চলে খুবই বিখ্যাত। এখনো তা খনন করা হয়নি বটে, কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের বিশ্বাস, ওখানে খনন করলে প্রাচীন বৌদ্ধ-যুগের কোন সৌধ বা বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।"

কুমার বললে, "জঙ্গলের ভিতরে ঢোকবার আগে দূর থেকে আমি ওখানেই দেখেছিলুম, যেন মাটি ফুঁড়েই উঠে আসছে মনুষ্য-মূর্তি!"

বিমল উৎসাহিতকণ্ঠে বললে, "জয়ন্তবাবু, এতক্ষণ ধ'রে যা খুঁজছিলুম, এইবারে বোধহয় তারই সন্ধান পাওয়া গেল!"

মাণিক বললে, "আমরা তো দেখতে এসেছি এখানে কোন পুরাকীর্তি-চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা।"

বিমল বললে, "সে-কথা সত্য। কিন্তু আমরা এখানে প্রত্নতত্ত্ববিদের কর্তব্য পালন করতে আসিনি। আমাদের এই অনুসন্ধানের আসল উদ্দেশ্য কি জানেন মাণিকবাবু?"

জয়ন্ত বললে, "আমি জানি। আমি প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ পাইনি, তাই এ অঞ্চলের অরণ্য-রাজ্যের মধ্যে যে প্রাচীন প্রাসাদ, মঠ আর বৌদ্ধ-বিহার প্রভৃতির অস্তিত্ব আছে, এটা আমার একেবারেই অজানা ছিল। বিজনবাবুর 'লঞ্চ' এ ব'সে প্রায়ই শুনছিলুম,

মধু-ডাকাতের দল মাত্র দশ-পনেরো মাইলের ভিতরে ডাকাতি ক'রে সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দলে দলে পুলিশের লোক এই দশ-পনেরো মাইল জায়গা জুড়ে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছে, তবু এত-বড় একটা ডাকাতের দলের কোনই পাত্তা পাওয়া যায় না! যারা দশ-পনেরো মাইলের ভিতরেই বাস করে, এত চেষ্টাতেও তাদের আস্তানা খুঁজে পাওয়া যায় না কেন? রোজ আমি ব'সে ব'সে কেবল এই কথাটাই ভাবতুম। তারপর বিমলবাবুর কথা শুনে আমি যেন পেলুম একটা মস্ত সম্ভাবনার ইঙ্গিত। তিনি বললেন, 'সুন্দরবনের মাটি নাকি যুগে যুগে ক্রমাগতই নিচের দিকে অবনত হয়ে যাচ্ছে, আর সেই মাটি ফুঁড়ে মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে সেকালকার ঘর-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ।' তৎক্ষণাৎ আমার মন সচকিতে জেগে উঠল। ভাবলুম, মধু কি তাহ'লে দল-বল নিয়ে এই রকম চোখের আড়ালে অদৃশ্য কোন ধ্বংসাবশেষের ভিতরে গিয়ে আত্ম-গোপন করে? আরো আন্দাজ করলুম, খুব সম্ভব বিমলবাবুর মনেও জেগেছে সেই-রকম কোন সন্দেহ! তাই তিনি যখন নতুন-কোন পুরাকীর্তি আবিষ্কারের অছিলায় সুন্দরবনের এ অঞ্চলটায় বেড়াবার জন্যে বেরিয়ে পড়তে চাইলেন, আমি তখনি সাগ্রহে তাঁর প্রস্তাবে সায় দিলুম। কেমন বিমলবাবু, কথাটা কি ঠিক নয়?"

বিমল কোন জবাব দিলে না, মুখ টিপে-টিপে কেবল হাসতে লাগল।

কুমার অধীরকণ্ঠে বললে, "এ-সব আলোচনা পরে করলেও ক্ষতি হবে না! আমার এ সর্বনেশে বন মোটেই ভালো লাগছে না, যদি কিছু করবার থাকে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন!"

রামহরি বললে, "যা বলেছ কুমারবাবু! ঐ দেখ না, ওখান দিয়ে আবার একটা মস্ত গোখ্‌রো সাপ আমাদের দেখেই ফণা তুলে ভয় দেখিয়ে বোঁ বোঁ ক'রে ছুটে পালিয়ে গেল! আমি ডাকাতের সঙ্গে, বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে, হাতী আর গণ্ডারের সঙ্গেও লড়তে রাজি আছি, কিন্তু ঐ সাপ-টাপের সঙ্গে কিছুতেই আমার পোষাবে না! কোথাও কিচ্ছু নেই, হঠাৎ দিলে ফোঁস্ ক'রে এক কামড়! তারপরে সঙ্গে সঙ্গেই হ'ল

অক্কালাভ। এমন হতচ্ছাড়া জায়গাকে যত শীগ্‌গির ছাড়তে পারি, ততই ভালো।"

জয়ন্ত বললে, "সত্যি, এ হচ্ছে একটা অভিশপ্ত ঠাঁই। বিমলবাবু, এখানে দেখছি গোয়েন্দাগিরির চেয়ে অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গন্ধই বেশি। এদিকে আপনি হচ্ছেন বহুদর্শী, আপনিই বলুন, এখন আমাদের কি করা উচিত।"

বিমল বললে, "আপনার মতন বুদ্ধিমান লোককে আমি আর কি বলব বলুন? তবে এতদূর যখন এসেছি, তখন ঐ স্তূপটার কাছে গিয়ে একবার উঁকিঝুঁকি মারলে মন্দ হয় কি?"

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, "আপনি যে এই কথাই বলবেন, তা আমি আগে থাকতেই জানি। ঐ স্তূপটার কাছে যাবার জন্যে আমার মনও আগ্রহে অধীর হয়ে উঠেছে।"

বিমল বললে, "বেশ, তবে তাই চলুন। কিন্তু সকলকেই বলছি—হুঁশিয়ার! প্রত্যেকেই নিজের নিজের বন্দুক আর রিভলভার প্রস্তুত ক'রে রাখো। ঐ মৃত্তিকা-স্তূপের কাছে গেলে যে-কোন মুহূর্তেই ছুটতে পারে রক্তনদীর বন্যা। ভগবান জানেন, সে-রক্ত হবে কাদের? আমাদের? না শত্রুদের?"

অষ্টম

ফাঁপা কোটরে সুড়ঙ্গ-পথ

কোন্ দিকে যেতে হবে এটা আর দেখিয়ে দিতে হ'ল না। কারণ কর্দমাক্ত পৃথিবীর উপরে যে-পদচিহ্নগুলোর স্পষ্ট চিত্র লেখা আছে, তারাই মৌন-ভাষায় যেন চিৎকার ক'রেই ব'লে দিতে লাগল, কোন্ দিক থেকে এসেছে এবং কোন্ দিকে ফিরে গিয়েছে শত্রুর দল।

কুমার বললে, "বাঘা রে, ঐ পায়ের দাগগুলো একবার শুঁকে ছাখ্।

তারপর যে কি করতে হবে তোকে আর নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিতে হবে না। তারপর আজ তোকেই মহাজন ক'রে আমরা করব তোরই পদাঙ্ক অনুসরণ!"

যাঁরা নিয়মিতভাবে কুকুর পোষেন তাঁরা সকলেই জানেন, কুকুর তার মানুষ-মনিবের অনেক ভাষাই বুঝতে পারে। বিশেষত, আমাদের বাঘা— জাতে দিশী হ'লেও শিক্ষা ও লালনপালনের গুণে সে হয়ে উঠেছিল কুকুর-সমাজের মধ্যে রীতিমত অসাধারণ!

বাঘা থেব্‌ড়ি খেয়ে মাটির উপরে ব'সে পৃথিবীর উপরে পটাপট্‌ শব্দে ল্যাজ আছ্‌ড়াতে আছ্‌ড়াতে ঊর্ধ্বমুখে জিভ বার ক'রে কুমারের কথা-গুলো সানন্দে শ্রবণ করলে। তারপরেই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মুখ নামিয়ে পদচিহ্ন-আঁকা মাটির উপরটা ভালো ক'রে বারকয়েক শুঁকে নিলে।

তারপর সে আর কোনই ইতস্তত করলে না, মাটির উপরটা শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে চলল অত্যন্ত তাড়াতাড়ি!

বিমল ও জয়ন্ত প্রভৃতি অগ্রসর হ'ল বাঘার পিছনে পিছনে।

চতুর্দিকে যে স্তব্ধতা, তাকে ভয়াবহ বললেও অত্যুক্তি হবে না। শহরের বাসিন্দারা—গভীর রাত্রে নগর যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন যে নীরবতাকে অনুভব করেন, তার সঙ্গে এখানকার নীরবতা কিছুই মেলে না। এ যেন মৃত্যুলোকের একান্ত নিস্তব্ধতা, এর মধ্যে জীবনের এতটুকু শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত নেই। এমন কি বন্য-বাতাসেরও যেন দম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গাছের একটা পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। সেই সমাধি-জগতের মধ্যে মৃতের মতন পাণ্ডুর চাঁদের চোখের আলো পর্যন্ত যেন মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে আছে!

সকলে সেই স্তূপটার কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানেও জীবনের কোন চঞ্চলতাই নেই। খানিক আলো আর খানিক কালো মেখে সেই উঁচু মাটির ঢিপিটা দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন সেই সমতল জগতে একটা অসম্ভব বিস্ময়ের মত!

স্তূপের অনেকখানি পর্যন্ত ঢেকে খাড়া হয়ে ছিল একটা বিরাট বটবৃক্ষ। সেই একটিমাত্র বনস্পতিই সেখানে সৃষ্টি করেছে যেন একটি ছোট-খাট

অরণ্য। তার নানা শাখা-প্রশাখার তলা থেকে নেমে এসেছে এমন মোটা মোটা ঝুরি যে দেখলেই মনে হয় সেগুলো কোন বড় বড় গাছের গুড়ি।

বাঘা সেই বিরাট বটগাছের তলায় যেখানে গিয়ে হাজির হ'ল তার চারিদিকেই রয়েছেন এমন ঘন ঝোপঝাপ্ যে, দলে দলে মানুষও তার ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালে একেবারে অদৃশ্য হয়ে হারিয়ে যেতে পারে। বিমল পিছন ফিরে ডাকলে, "রামহরি!"

রামহরি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে বললে, "কি খোকাবাবু?"

—"তোমার মোটমাটের ভিতরে গোটা-তিনেক পেট্রলের লণ্ঠন আছে। চট্‌পট্ সেগুলো বার ক'রে জ্বালিয়ে ফ্যালো! এই অতিকায়-গাছের তলায় যে নিবিড় অন্ধকার, অন্ধের মত এগিয়ে শেষকালে কি কোন অজগরের পেটের ভেতরে গিয়ে হাজির হ'ব?"

তিনটে পেট্রলের সমুজ্জ্বল আলোকের আঘাতে সেই মস্ত-বড় বট-গাছের তলা থেকে সমস্ত অন্ধকার ছুটে পালিয়ে গেল যেন মুহূর্তের মধ্যে।

বাঘা তখন হাজির হয়েছে বটগাছের প্রধান গুড়িটার কাছে। তার-পরই সে যেন হতভম্বের মতন 'কুঁই কুঁই' শব্দে কেমন একটা করুণ আর্তনাদ করতে লাগল!

জয়ন্ত এদিক-ওদিক পরীক্ষা ক'রে বিস্মিতস্বরে বললে, "এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! পায়ের চিহ্নগুলো শেষ হয়ে গিয়েছে একেবারে এই গাছের গুড়ির তলায় এসে!"

পেট্রলের লণ্ঠনগুলোর উজ্জ্বল আলোকের উপরেও উজ্জ্বলতর আলোক সৃষ্টি ক'রে সেখানে জ্ব'লে উঠল সকলকার হাতে বৈদ্যুতিক টর্চ। সেই ঝুপ্‌সি-গাছের তলাটা দিনে-দুপুরেও নিশ্চয়ই কখনো পায়নি তেমন দীপ্তির আভাস।

বৃহৎ বটগাছটার প্রধান গুড়ির বেড় হয়তো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাতের কম হবে না!

তারই উপরে হাত বুলিয়ে এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে কুমার বললে, "বিমল, বিমল! এখানে একটা খুব সূক্ষ্মভাবে-কাটা দরজার চিহ্ন রয়েছে!

গাছের গুড়িতে দরজার চিহ্ন! এমন ব্যাপার কল্পনাতেও আনা যায় না!"

সত্য কথা!

জয়ন্ত একটা ধাক্কা মারলে, সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষের দেহের খানিকটা ঢুকে গেল ভিতর দিকে—ঠিক যেন একটা দরজার পাল্লার মত!

তারপর সে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। এদিকে, ওদিকে, উপরে ও নিচে টর্চের আলোকপাত ক'রে বিস্মিতকণ্ঠে বললে, "বিমলবাবু, একি অদ্ভুত ব্যাপার! এই গাছের গুড়িটা একেবারে ফাঁপা! তবে এত-বড় গাছটা জ্যান্ত হয়ে আছে কেমন ক'রে?"

রামহরি বললে, "আপনারা বাবু শহুরে-মানুষ! আপনারা তো দেখেন নি, এমন অনেক বড় বড় বটগাছ আছে যাদের আসল গুড়ি ম'রে গিয়ে একেবারে ফাঁপা হয়ে যায়! তবু সে-সব গাছ জ্যান্ত হয়েই থাকে। চারিদিকে এই-যে সব ঝুরি দেখছেন, মাটি থেকে রস শুষে নিয়ে এরাই বাঁচিয়ে রাখে বটগাছদের।"

উজ্জ্বল পেট্রলের আলোকে চারিদিকে তাকিয়ে বোঝা গেল, সেই বৃক্ষ-কোটরের ভিতরটাকে একখানি বড়-সড় ঘর বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেবল সেই ঘরের উপরদিকে ছাদের আবরণ নেই, উর্ধ্বমুখে তাকালে দেখা যায় চাঁদের আলোমাখা এক টুকরো আকাশ।

ইতিমধ্যে আর একটা নতুন আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে জয়ন্ত! কোটরের একপ্রান্তে মাটির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে একখানা মাঝারি-আকারের দরজার পাল্লা। খুব বড় একটা কড়া ধ'রে উপরদিকে টানবা-মাত্র দরজাটা বাইরের দিকে খুলে এল বেশ সহজেই।

জয়ন্ত নিচের দিকে উঁকি মেরে দেখে বললে, "একসার সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গিয়েছে দেখছি। এখন আমাদের কি করা উচিত?"

বিমল বললে, "এখন আমাদের পাতাল-প্রবেশ করা ছাড়া উপায় নেই।"

রামহরি বললে, "তোমার কি গোঁয়াতুর্মি করবার বয়স এখনো গেল না খোকাবাবু? পাতালে প্রবেশ করব বলছ যে, কিন্তু দলে-ভারি ডাকাতরা যদি আমাদের আক্রমণ করে?"

—"আমরাও আত্মরক্ষা আর প্রতিআক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি। আমাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে আছে অটোমেটিক বন্দুক আর অটোমেটিক রিভলভার—খুব সম্ভব ডাকাতদের কারুর কাছেই যা নেই। আমরা পাঁচজনে দু'শো জন ডাকাতকে বাধা দিলেও দিতে পারি।"

জয়ন্ত বললে, "আপনারা এইখানে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করুন। আগে আমি একলা চুপি চুপি নিচে নেমে গিয়ে এখানকার হালচালটা কিছু কিছু বোঝবার চেষ্টা ক'রে আসি গে।" ব'লেই পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নেমে অন্ধকারের ভিতরে মিলিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ উপরকার কারুর মুখেই কোন কথা নেই। কেবল গাছের কোটরের কোন্‌খান থেকে একটা তক্ষক বিশ্রীকণ্ঠে বার-কয়েক ডেকে উঠল।

মিনিট ছয়-সাত পরে জয়ন্ত আবার সিঁড়ির উপরকার ধাপে এসে দাঁড়াল। বললে, "বিশেষ-কিছুই পাওয়া গেল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই পেলুম একটা বেশ লম্বা আর চওড়া সুড়ঙ্গ-পথ। তার চারিদিকটাই বাঁধানো। পরীক্ষা ক'রে বুঝলুম এ-সুড়ঙ্গটা নতুন তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তার ভিতরে জনপ্রাণীর সাড়া নেই, বিরাজ করছে ঠিক সমাধির স্তব্ধতা। সুড়ঙ্গের শেষ-প্রান্তে গিয়ে পেলুম আর একটা দরজা, কিন্তু তার পাল্লাদুটো ওধার থেকে বন্ধ। দরজার উপরে কান পেতেও জীবনের কোন লক্ষণই আবিষ্কার করতে পারলুম না। ঐ দরজার ওধারে কি আছে জানিনা, কিন্তু আপাতত আমরা এই সুড়ঙ্গের ভিতরে বোধহয় নিরাপদেই প্রবেশ করতে পারি।"

বিমল বললে, "বেশ, তাহ'লে আপনি পথ দেখান।"

জয়ন্ত আগে আগে আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল এবং তার পশ্চাৎ-অনুসরণ করলে বিমল, কুমার, মাণিক, রামহরি ও বাঘা। সুড়ঙ্গের ভিতরে গিয়ে হাজির হয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে কুমার বললে, "বাঃ, এরা যে এখানে বেশ পাকা বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছে দেখছি। কিন্তু সুড়ঙ্গটার ভিতর দিয়ে এগুলে আমরা কোথায় গিয়ে পড়ব?"

বিমল বললে, "আমার বিশ্বাস, উপরে যে স্তূপটা দেখে এসেছি, মাটির তলা দিয়ে সুড়ঙ্গের সাহায্যে আমরা হয়তো তারই ভিতরে প্রবেশ করতে পারি। হয়তো ঐ স্তূপের তলায় পুরানো ঘর-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আছে। হয়তো ধ্বংসাবশেষের কোন কোন জায়গা অল্পবিস্তর মেরামত ক'রে নিলে এখনো সেখানে মানুষ বাস করতে পারে। দৈবগতিকে এটা জানতে পেরেই মধু-ডাকাত এখানে এসে গেড়েছে তার গোপন আস্তানা!"

মাণিক বললে, "কিন্তু পাতালের ভিতরে ডাকাতরা আলো-বাতাস পাবে কেমন ক'রে?"

বিমল বললে, "যারা পৃথিবীর চোখে ধুলো দেবার জন্যে এত আয়োজন করতে পেরেছে, তারা কি আর ওদিকে দৃষ্টি দেয়নি? হয়তো তারা উপর থেকে স্তূপের স্থানে স্থানে খুঁড়ে ভিতরে আলো আর বাতাস যাবার পথ ক'রে নিয়েছে।"

এমনি কথাবার্তা হচ্ছে, হঠাৎ পিছন দিকে একটা উচ্চ শব্দ হ'ল। সবাই একসঙ্গে চম্‌কে ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, সুড়ঙ্গের যে-মুখ দিয়ে তারা ভিতরে প্রবেশ করেছে সেই মুখটার উপর থেকে নিচে পর্যন্ত জুড়ে আছে অনেকগুলো বিষম মোটা-মোটা লোহার গরাদে। আবার তাদের পিছনদিকে সেইরকম আর-একটা শব্দ এবং আবার তারা চম্‌কে ফিরে অবাক হয়ে দেখলে, সুড়ঙ্গের অন্যদিকেও মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত জুড়ে এসে পড়েছে তেমনি মোটা মোটা কতকগুলো লোহার গরাদে!

তাদের পিছু হঠবার বা সামনে এগুবার দুই পথই বন্ধ! তারা যেন পশুশালার লোহার খাঁচার মধ্যে বন্দী!

অকস্মাৎ সেই সুড়ঙ্গ-পথ এক অতি তীব্র, তীক্ষ্ণ ও রোমাঞ্চকর হা-হা-হা-হা অট্টহাসির রোলে পরিপূর্ণ হয়ে গেল! সত্যি কথা বলতে কি, সে বীভৎস হাসির বর্ণনা তার ঐ হা-হা-হা-হা রবের দ্বারা বোঝানো যায় না—কারণ, সে যেন চামুণ্ডারূপিণী প্রচণ্ড কোন নারীর খল খল খল খল অট্টহাসি!

তিন-তিনটে প্রদীপ্ত পেট্রলের লণ্ঠন সেই সুড়ঙ্গ-পথের শেষ-প্রান্তকেও দিয়েছিল অন্ধকারের কবল থেকে মুক্তি।

দেখা গেল, সুড়ঙ্গ-পথের অন্য-প্রান্তের বন্ধ দরজাটা খুলে গিয়েছে এবং সেই দরজার সামনে এসে আবির্ভূত হয়েছে পনেরো-কুড়িটা সুদীর্ঘ মূর্তি। এতদূর থেকেও লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোতেও তাদের কারুর চেহারা স্পষ্ট ক'রে দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু এটা বেশ আন্দাজ করতে পারা যাচ্ছিল যে, সেই মূর্তিগুলোর প্রত্যেকটাই রীতিমত যমদূতের মতই দেখতে।

কে যে হাসছে বোঝা যাচ্ছিল না তাও। হঠাৎ সেই নারীকণ্ঠের তীব্র হাসি থেমে গিয়ে জেগে উঠ্‌ল, খন্‌খনে মেয়ে-গলায় একটা কৌতুকপূর্ণ স্বর—"ওরে পুঁচ্‌কে বিমল! আমার গলা শুনে তুই কি আমাকে চিনতে পারছিস্?"

বিমল শান্ত অথচ অবিচলিতকণ্ঠে বললে, "চিন্‌তে পারছি বৈকি অবলাকান্ত! অমন বিরাট দেহে অমন কুৎসিত নারীকণ্ঠ ভগবান বোধ-হয় পৃথিবীর দ্বিতীয় কোন পুরুষকে দান করেন নি! তুমি মধু-ডাকাত ব'লেই আত্মপরিচয় দাও কিংবা বৃদ্ধের ছদ্মবেশই ধারণ কর, কিন্তু তোমার অস্তিত্ব আমি এখানে আসবার আগেই অনুমান ক'রে নিয়েছি। সেই 'জেরিণার কণ্ঠহারে'র মামলায় শেষপর্যন্ত হেরে গিয়েও তুমি আমাদের ফাঁকি দিয়ে লম্বা দিয়েছিলে, এ-কথা কি আমি কোনদিন ভুলব? আজ যে আবার তোমাকে মুঠোর ভেতরে পেয়েছি, এটা জেনে আমার মন আনন্দে নেচে উঠছে!"

আবার সেই খন্‌খনে গলায় খল খল অট্টহাসি! তারপরই হঠাৎ হাসি থামিয়ে অবলাকান্ত চিৎকার ক'রে বললে, "বলিস্ কি রে? তুই আমাকে মুঠোর ভেতর পেয়েছিস্? না আমি তোকে আর তোর স্যাঙাতদের বুনো কুকুর-শেয়ালের মতন লোহার খাঁচায় বন্দী ক'রে ফেলেছি? খালি তুই কেন, মস্ত-বড় গোয়েন্দা ব'লে যে নাম কিনতে চায়, সেই জয়ন্ত-গাধাকে তোর মতন আগেও আমি একবার নিজের

হাতের মুঠোর ভেতরে পেয়েছিলুম, আজও আবার পেয়েছি। এক ঢিলে আজ আমি দুই পাখী মারতে চাই। তোদের দু'জনের সঙ্গে আর যারা আছে তাদের আমি উল্লেখযোগ্য ব'লে মনেই করি না। তবে এইসঙ্গে সেই হোঁতকা পুলিশ-কর্মচারী সুন্দরটাকে জালে ফেলতে পারলে আমার প্রতিহিংসা আজ একেবারে সার্থক হ'ত।"

জয়ন্ত বললে, "অবলাকান্ত, তোমার বাজে তড়পানি শোনবার জন্যে আমরা প্রস্তুত নই। তুমি কি করতে চাও, তাই বল।"

—"আমি কি করতে চাই? আমি কি করতে চাই? তা শুনলে তোদের দেহের রক্ত হিম হয়ে যাবে। বিজন-জমিদারের 'লঞ্চ্' আক্রমণ করবার আগে যদি আমি তোদের খবর জানতে পারতুম, তাহ'লে আগে-থাকতে সেইখানেই ব্যবস্থা করতুম তোদের টিপে মেরে ফ্যালবার জন্যে। তারপরেই যখন হঠাৎ তোদের দেখা পেলুম, তখনই বুঝলুম যে, তোদের মতন ছিনে-জোঁক্ শেষপর্যন্ত না দেখে ছাড়বে না। তারপর আজ এই বিপথে আমার আড্ডার এত কাছে বন্দুকের শব্দ শুনেই আমার জানতে বাকি রইল না যে, এখানেও হয়েছে তোদেরই অশুভ আবির্ভাব। আমি বুদ্ধিমানের মতন তখন আর কোন গোলমাল না ক'রে তোদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করবার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ক'রে রাখলুম। আমি জানতুম, তোরা এখানে আসবি, আসবি, আসবি! হা-হা-হা-হা-হা-হা!"

জয়ন্ত অধীরকণ্ঠে বললে, "তোমার প্রলাপের উচ্ছ্বাস আর আমাদের ভালো লাগছে না। তুমি এখন কি করতে চাও তাই বল!"

—"আমি কি করতে চাই? আমি কী করতে চাই? আমি যা করতে চাই, সেটা তোদের কাছে একটুও ভালো লাগবে না। আমার প্রতি-হিংসা সর্বদাই দৌড়োয় উল্‌টো পথে। আমি তোদের হাতে মারব না, ভাতে মারব। বুঝেছিস্?"

জয়ন্ত বললে, "ভাতে মারবার কথা কি বলছ? তোমার কাছে আমরা ভাত খেতে আসিনি!"

আবার অট্টহাসি হেসে অবলাকান্ত বললে, "তাই নাকি? তাহ'লে

সংক্ষেপেই শোন্, আমি কি করতে চাই। তোরা ঐ লোহার খাঁচাতেই বন্দী হয়ে থাকবি—দিনের পর দিন—যতদিন না পটল তুলিস। তোদের একফোঁটা জল খেতে দেব না, এককণা খাবারও দেব না। ঐ খাঁচার ভেতরেই ছট্‌ফট্ করতে করতে অনাহারে তোরা ম'রে থাকবি! ওখান থেকেই সবাই মিলে তোরা যতখুশি চ্যাঁচাতে পারিস, তোদের গলার আওয়াজ এই পাতাল ফুঁড়ে পৃথিবীর উপরে জেগে ওঠবার কোন পথই নেই। হা-হা-হা-হা-হা।"

দাঁতে দাঁত চেপে কুমার নিম্নস্বরে বললে, "বিমল। জয়ন্তবাবু! মাণিকবাবু! রামহরি! শয়তানের আস্ফালন আর সহ্য হচ্ছে না! মরতে হয় মরব, কিন্তু এখন শত্রুনিপাত করবার সুযোগ ছেড়ে দেব কেন?"

বিমল বললে, "ঠিক বলেছ! ছোঁড়ো সবাই একসঙ্গে অটোমেটিক বন্দুকগুলো!"

পর-মুহূর্তেই একসঙ্গে পাঁচ-পাঁচটা অটোমেটিক বন্দুক গর্জন করতে লাগল বারংবার। কেবল বন্দুকগুলোর শব্দে নয়, অনেকগুলো মনুষ্য-কণ্ঠের ভয়াবহ আর্তনাদে সুড়ঙ্গ-পথের সেই বদ্ধ আবহাওয়া যেন বিষাক্ত হয়ে উঠল।

জয়ন্ত উন্মত্তের মত চিৎকার ক'রে বলল, "তোরা যদি যুদ্ধ করতে চাস্, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্! লড়াই ক'রে মরতে আমরা রাজি আছি! আয়, দেখি কাদের বন্দুকের প্রতাপ বেশি?"

মনুষ্য-কণ্ঠ থেকে আর কোন উত্তর শোনা গেল না, অল্পক্ষণ খানিক ঝটাপটি ও হুড়োহুড়ি শব্দের পর শোনা গেল কেবল একটা দরজা সজোরে বন্ধ ক'রে দেওয়ার আওয়াজ।

জয়ন্ত আবার প্রাণপণে চিৎকার ক'রে বললে, ফের যদি তোরা ঐ দরজা খুলিস্, আমাদের কাছ থেকে এইরকম অভ্যর্থনাই লাভ করবি! আমরা মরতে মরতেও তোদের মেরে তবে মরব!"

কিন্তু আর কারুর কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল না। সেই বন্ধ দরজা বন্ধ হয়েই রইল, কেবল দেখা গেল, দরজার সামনে মাটির উপরে নিশ্চল হয়ে

প'ড়ে আছে চারটে মনুষ্য-মূর্তি। নিশ্চয়ই তারা কেউ আর বেঁচে নেই! হয়তো আহত হয়েছে আরো অনেকগুলো মানুষ, কিন্তু তারা কোনগতিকে আশ্রয় নিয়েছে ঐ বন্ধ দরজার নিরাপদ অন্তরালে!

খানিকক্ষণ কেটে গেল নীরবতার মধ্য দিয়ে। হয়তো সকলেই তখন নিজের নিজের ভীষণ পরিণামের কথা চিন্তা করছিল।

কেবল রামহরি বিমলকে সম্বোধন ক'রে বললে, "খোকাবাবু, তুমি যখন সঙ্গে আছ, তখন আমি জানি যে, আমাদের কারুর কোনই ভয় নেই। এখন কেমন ক'রে এই খাঁচার বাইরে যাই বল দেখি? এর লোহার ডাণ্ডাগুলো এত মোটা যে, হাতী এলেও এদের কিছুই করতে পারবে না। হে বাবা বিশ্বনাথ! বুড়ো বয়সে অন্নজল না খেয়ে মরবার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। তুমি আমাদের একটা উপায় ক'রে দাও বাবা!" ব'লেই সে দুই হাত জোড় ক'রে বাবা বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে বারংবার প্রণামের পর প্রণাম করতে লাগল।

বিমল হাসতে হাসতে সহজস্বরেই বললে, "ভাই রামহরি, বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছায় এখান থেকে পালাবার উপায় আমাদের সঙ্গেই আছে।"

জয়ন্ত বিস্মিতকণ্ঠে বললে, "কি-রকম?"

বিমল বললে, "খুব সোজা উপায়। কিন্তু সবাইকে আমার কথামত কাজ করতে হবে।"

—"বলুন।"

—"সকলে মিলে এখানে চিৎকার ক'রে কথা বলতে থাকুন আর মাঝে মাঝে প্রাণপণে গলা ছেড়ে গান শুরু ক'রে দিন। আর নিবিয়ে দেওয়া হোক্ পেট্রলের আলোগুলো। আমি এখন চাই খালি অন্ধকার আর কোলাহল!"

—"আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না!"

—"আমি সব জায়গাতেই প্রস্তুত হয়েই যাই। অনেক দেখে দেখে আমার যথেষ্ট শিক্ষালাভ হয়েছে। হঠাৎ কেউ আমাকে বিপদে ফেলতে পারবে না। আমার সঙ্গে কি আছে জানেন? একটি অতি-সূক্ষ্ম প্রথম-

শ্রেণীর উকো। এই উকো দিয়েই লোহার ডাণ্ডা কেটে আমি এখান থেকে সকলকার পালাবার পথ আবার খুলে দেব। কিন্তু বলা তো যায় না, এই অদ্ভুত সুড়ঙ্গ-পথের কোন্ অজানা রন্ধ্রের পিছনে আছে কোন্ দুরাত্মার সাবধানী-চক্ষু। আর লোহার উপরে উকো ঘষলেই একটা শব্দের সৃষ্টি হবে। সেই শব্দটা ঢাকবার জন্যেই সকলকে গোলমাল করতে অনুরোধ করছি। তারপর যদি সেই শব্দ শুনে অন্ধকারে ওদিককার দরজা খোলার আওয়াজ হয়, তখন কেউ যেন একসঙ্গে বন্দুক ছুঁড়তে একটুকুও ইতস্তত না করেন।"

সেই পাতালপুরীর ভিতরে ব'সে রাত্রি কি দিন কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। আসলে তখন হচ্ছে, শেষ রাত্রি।

বিমল তার উকোর সাহায্যে একটা মোটা লোহার ডাণ্ডা একেবারে কেটে ফেললে। তারপরে মুখ তুলে বললে, "জয়ন্তবাবু, এইবারে কিন্তু দয়া ক'রে আমার কয়েকটি উপদেশ শুনতে হবে। অবশ্য এই উপদেশ মানা আর না-মানা, সে হচ্ছে আপনাদের অভিরুচি।"

জয়ন্ত বললে, "বিমলবাবু, দেখছি আজকের নাটকের নায়ক হচ্ছেন আপনিই। এখানে হয়তো আমাদের অনাহারেই ম'রে প'ড়ে থাকতে হ'ত —যদি আপনাকে আজ সঙ্গে না পেতুম। আপনি আজ যা বলবেন, সেটা হবে আমাদের কাছে আদেশের মতন।"

বিমল বললে, "জয়ন্তবাবু, আপনার এতটা বেশি বিনয় প্রকাশ করবার কোনই দরকার নেই। আমি যা বলব তা হবে সোজা কথাই। ......দেখুন, পালাবার জন্যে আমরা এখানে আসিনি, আমরা এখানে এসেছি একদল দুর্দ্ধর্ষ বোম্বেটে গ্রেপ্তার করতে। পালাতে আমরা এখনি পারি, কারণ পথ আমি সাফ্ ক'রে দিয়েছি। কিন্তু আপনারা এখান থেকে পালাতে চান, না এই দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করতে চান।"

জয়ন্ত বললে, "বিমলবাবু, ঐ অবলাকান্তর ওপরে আমার অনেক-দিনের ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। ও আমাদের বারংবার ফাঁকি দিয়ে

পালিয়ে গিয়েছে। ওকে আর ওর দলকে যদি গ্রেপ্তার করতে পারি, তাহ'লে সে সুযোগ আমি নিশ্চয়ই ছাড়ব না। তবে ব্যবস্থা যা দেখছি, এখান থেকে আমাদের পালাবার পথ খোলা রয়েছে, কিন্তু অবলাকান্তদের গ্রেপ্তার করবার কোনই সুযোগ নেই।"

জয়ন্তের কথার কোন জবাব না দিয়ে বিমল বললে, "কুমার, আজ একটুখানি জাগ্রত হ'তে পারবে?"

কুমার, হাসতে হাসতে সেলাম ক'রে বললে, "যো-হুকুম, মহারাজ।"

বিমল বললে, "শোনো কুমার! এখান থেকে বিজনবাবুদের 'লঞ্চ্' বোধহয় বেশি দূরে নেই। তোমাকে সেইখানে যেতে হবে। আমাদের পালাবার পথ খোলা থাকলেও আমরা এইখানেই আপাতত অচল শিবের মতই ব'সে রইলুম। এখন হয়তো বাইরে গিয়ে দেখবে, ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। কিন্তু তোমার কুকুর-বন্ধু বাঘাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও—সে তোমাকে নিশ্চয়ই পথ চিনিয়ে দেবে।"

কুমার বললে, "আমাকে কী যে করতে হবে এখনো সেটা বুঝতে পারছি না।"

বিমল বললে, "তোমাকে বিশেষ কিছুই করতে হবে না। বাঘাকে ইঙ্গিত করলেই সে তোমাকে নিশ্চয়ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, 'লঞ্চ্' যেখানে আছে সেইখানেই। 'লঞ্চ'-এর উপরে তিন-ডজন বন্দুকধারী পুলিশের সেপাই আছে! তার উপরেও আছে আরো পনেরো-বিশজন লোক। তুমি সমস্ত কথা ব'লে তাদের সবাইকে সশস্ত্র হয়ে এইখানে আসবার জন্যে অনুরোধ করবে।"

মাণিক বললে, "কিন্তু বিমলবাবু, পথ যখন খোলা রয়েছে, তখন আপাতত সবাই তো আমরা এখান থেকে স'রে পড়তে পারি! তারপর 'লঞ্চ্' থেকে লোকজন নিয়ে এসে আবার আমরা চেষ্টা ক'রে দেখব এই শয়তানদের গ্রেপ্তার করতে পারি কিনা?"

জয়ন্ত রুক্ষস্বরে বললে, "মাণিক, তোমার আজ হ'ল কি বল দেখি? তুমি আজ বারবার নির্বোধের মতন কথা কইছ! এখান থেকে আমরা

সবাই যদি স'রে পড়ি, তাহ'লে এই পাতালপুরীর বাসিন্দারা তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়ে উঠবে, সেটা কি আন্দাজ করতে পারছ না? তারপর ফিরে এসে আর কি তাদের কোন পাত্তা পাবে?"

বিমল বললে, "ঠিক বলেছেন জয়ন্তবাবু! আমি কি চাই জানেন? আমরা এইখানেই ব'সে থাকব, বেশি বিপদ দেখলেই এখান থেকে সেই মুহূর্তেই স'রে পড়ব—কারণ আমাদের পালাবার পথ খোলাই আছে। কিন্তু আমরা তো পালাবার জন্যে এখানে আসিনি, আমরা এসেছি মধু-ডাকাত বা অবলাকান্ত আর তার দলবল গ্রেপ্তার করতে। কুমার চ'লে যাক্ বাঘাকে নিয়ে। সে 'লঞ্চ'-এর উপরে গিয়ে খবর দিক, আমাদের কী অবস্থা! তারপর কেউ যথাসময়ে আসতে পারে ভালোই, না পারে, আমরা নিজেদের পথ নিজেরাই ক'রে নেব-অখন।"

জয়ন্ত বিমলকে আলিঙ্গন ক'রে বললে, "দাদা, তুমি তো গোয়েন্দা নও, আমিই হচ্ছি ডিটেক্‌টিভ। কিন্তু তুমি ভাই আজকে আমাকেও হারিয়ে দিলে।"

বিমল বললে, "কে যে হেরে যাবে আর কে যে হারবে না, সে-কথা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। তুমি হ'চ্ছ আমার বন্ধু, তুমি যদি হুকুম কর, আমি সব-কিছু করতে পারি।"

জয়ন্ত বললে, "আপনি যদি হুকুমের কথা বলেন, সেটা অত্যন্ত অন্যায় হবে। আপনি আমাদের চেয়ে কত বেশি দেখেছেন! যে-লোক মঙ্গলগ্রহে গিয়ে ফিরে এসেছে তাকে আমরা কী-ই বা হুকুম করব?"

নবম

তারপর কি হ'ল?

চারিদিকে প্রখর দিবালোক ছড়িয়ে সূর্য তখন উঠেছে আকাশের অনেকখানি উপরে।

কিন্তু সূর্যের আলোকের এককণাও সুড়ঙ্গ-পথের মধ্যে প্রবেশ করেনি। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে তারা উৎকর্ণ হয়ে বসেছিল একেবারে নীরবে। তাদের প্রত্যেকেরই হাতের বন্দুক যে-কোন মুহূর্তে অগ্নি উদ্গার করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে। সুড়ঙ্গ-পথের ওদিককার দরজাটা যদি কেউ খোলবার চেষ্টা করে কিংবা ওদিকে যদি কোন সন্দেহজনক শব্দ শোনা যায়, তাহ'লে প্রত্যেকেই একসঙ্গে বন্দুক ছুঁড়তে একটুও বিলম্ব করবে না।

কিন্তু অবলাকান্ত বা তার কোন অনুচর একবারও দরজা খোলবার বা উঁকিঝুঁকি মারবার চেষ্টা করলে না। দরজা খুললেই যে কি-রকম বিপদের সম্ভাবনা, একটু আগেই তারা তার যে নমুনা পেয়েছে তাদের পক্ষে তাই-ই হয়েছে যথেষ্ট। আর এ-কথাও তারা বোধহয় ভাবছে, বন্দীরা যখন লোহার খাঁচার ভিতরে, তাদের পালাবার কোন উপায়ই যখন নেই এবং অন্ন ও জল থেকে বঞ্চিত ক'রে তাদের যখন হত্যাই করা হবে, তখন আর দরজা খুলে পাহারা দিতে গিয়ে যেচে বিপদকে ডেকে আনবার দরকার কি?

...হঠাৎ সুড়ঙ্গ-পথের মুখে একটা শব্দ শোনা গেল। সাবধানী-পায়ের শব্দ! তারপরই একটা চাপা কণ্ঠস্বরে শোনা গেল— "হুম্! এ যে বেজায় অন্ধকার বাবা!"

মাণিক উৎফুল্লকণ্ঠে ব'লে উঠল, "আমাদের সুন্দরবাবু এসেছেন! পায়ের শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে সুন্দরবাবু একলা আসছেন না!"

ইতিমধ্যে বিমল সুড়ঙ্গের ভিতর-দিকে প্রবেশ করবার জন্যে ওদিককারও একটা লোহার ডাণ্ডা উকো ঘ'ষে কেটে ফেলেছে। সেই পথ দিয়ে বেরুতে বেরুতে বিমল বললে, "জয়ন্তবাবু, এইবারে পেট্রলের লণ্ঠনগুলো জ্বালিয়ে ফেলুন।"

আলোকের ধাক্কায় অন্ধকার যখন অদৃশ্য হ'ল তখন দেখা গেল, সিঁড়ি দিয়ে নেমে সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন সুন্দরবাবু। তারপর আবির্ভূত হ'ল কুমার ও বাঘা। তারপর পদশব্দের পর পদশব্দ তুলে

ভিতরে নেমে আসতে লাগল দলে-দলে সশস্ত্র পুলিশের লোক।

খাঁচার ভিতরকার বন্দীরাও তখন বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জয়ন্ত মৃদুকণ্ঠে বললে, "সুন্দরবাবু, আপাতত কোন কথা বলবার বা গোলমাল করবার চেষ্টা করবেন না। খাঁচার কাটা-ডাণ্ডার ফাঁক দিয়ে গ'লে চুপি-চুপি আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসুন।"

জয়ন্ত ও বিমল সর্বাগ্রে অগ্রসর হ'ল। তারপর তারা সুড়ঙ্গ-প্রান্তের সেই বন্ধ-দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে তখনো পড়েছিল কতকগুলো মৃতদেহ। সেদিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে দরজার উপরে কান পেতে তারা শুনতে লাগল, কিন্তু দরজার ওদিকে নেই কোন-রকম ধ্বনির অস্তিত্ব।

জয়ন্ত ধীরে ধীরে ঠেলা দিতে দরজা গেল খুলে।

দেখা গেল একখানা বেশ বড় ঘর। ঘরখানা যে বহুকালের পুরাতন প্রথম দৃষ্টিতেই সেটাও অনুমান করা যায়।

কিন্তু ঘরের মধ্যেও জনপ্রাণী নেই।

বিমল ঘরের ভিতরে ঢুকে বললে, "জয়ন্তবাবু, ওদিককার দেওয়ালে কি-একখানা কাগজ মারা রয়েছে দেখছেন?"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কাগজখানার উপরে টর্চের আলোক নিক্ষেপ ক'রে উত্তেজিত ও উচ্চস্বরে পড়তে লাগল: "ওহে জয়ন্ত-গাধা, ওরে বিমল-শেয়াল! তোরা কি ভেবেছিস্ আমি অভিমন্যুর মতন নির্বোধ? এই পাতাল-পুরীতে ঢোকবার পথ রেখেছি আর পালাবার পথ রাখিনি? এখান থেকে বাইরে বেরুবার খালি একটা নয়, অনেকগুলো পথই আছে। পাহারাওয়ালা খালি তোদেরই নেই, আমারও আছে। আমার পাহারা-ওয়ালারা দিনে-রাতে বনে বনে পাহারা দিয়ে বেড়ায়। তাদেরই মুখে খবর পেলুম, সুন্দর-ছুঁচো একদল ছাতুখোর লাল-পাগড়ী নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আমার এই আড্ডার দিকে ছুটে আসছে। এ-যাত্রা আবার তোরা আমাকে ফাঁকি দিলি বটে, কিন্তু এত সহজে ধরা পড়বার ছেলে নই আমিও। তোরা যখন এই শূন্য পাতালপুরীতে ব'সে হা-হুতাশ করবি,

আমি তখন থাকব বহুদূরে—বহুদূরে। আমার ঠিকানা যদি চাস্ তাহ'লে আবার তোরা আমার সঙ্গে দেখা করিস্। তখন তোদের আমি খুব ভালো করেই অভ্যর্থনা করবার চেষ্টা করব। আর আমার সঙ্গে আবার আলাপ করবার সখ যদি তোদের মিটে গিয়ে থাকে, তাহ'লেও জেনে রাখিস্, কম্‌লী তোদের ছাড়বে না। আজ থেকে আমি রইলুম তোদের পিছনে পিছনে মূর্তিমান শনির মত। ইতি অবলাকান্ত।" শেষ-দিকটা পড়তে পড়তে জয়ন্তের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল অত্যন্ত করুণ।

বিমল সকৌতুকে উচ্চকণ্ঠে হাসতে লাগল।

রামহরি বললে, "কী যে হাসো খোকাবাবু, গা যেন জ্বলে যায়!"

মাণিক বললে, "সুন্দরবাবু, এখন আপনি কি করবেন?"

সুন্দরবাবু ফোঁস্ ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেবল বললেন, "হুম্।"

কুমার বললে, "বাঘা, তুই কিছু বলবি না?"

বাঘা মুখ তুলে বললে, "ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!"

সুন্দর বনের মানুষ-বাঘ

গোড়াপত্তন

বাংলাদেশে তখনও ইংরেজ-রাজের প্রতিষ্ঠা হয়নি এবং মোগল রাজশক্তিও হয়ে পড়েছে তখন নিতান্ত দুর্বল। দিল্লীতেও বাদশা আছেন এবং বাংলাতেও নবাব আছেন; কিন্তু তাঁদেরও নাগালের বাইরে তখন ছিলেন এমন সব রাজা-রাজড়া, যাঁদের স্বাধীন ছাড়া আর কিছুই বলা চলত না। নিজের নিজের এলাকায় তাঁরা ছিলেন নিরঙ্কুশ দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। আমাদের গল্প আরম্ভ হবে এই সময়েই।

সুন্দরবন আজ বাঘের জন্মস্থান ব'লেই বিখ্যাত; কিন্তু এমন এক সময় গিয়েছে, যখন সুন্দরবনে নানাদিকেই ছিল বড় বড় জনবহুল নগর ও গ্রাম। তখনও সেখানে অরণ্য ছিল বটে, কিন্তু সে হচ্ছে, লোকারণ্য। আজও শিকারীরা বন্দুক হাতে ক'রে গভীর জঙ্গলে ঢুকে সেইসব জনপদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার ক'রে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান। ভগ্ন প্রাসাদ, দুর্গ, মন্দির—তাদের ভিতরে হয়তো আজ আশ্রয় নিয়েছে ব্যাঘ্র ও সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর দল। ইতিহাস-বিখ্যাত রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের অনেক অংশই এইভাবে সুন্দরবনের কবলগত হয়েছে। আসলে সুন্দরবন তখনও ছিল বটে, কিন্তু তার আকার এখনকার মত এতটা বৃহৎ ছিল না।

এই অঞ্চলে এক সময় একটি মস্ত বড় রাজ্য ছিল, তার রাজধানীর নাম—পুষ্পপুর। এখানে সিংহাসনে ব'সে রাজ্যশাসন করতেন মহারাজা ইন্দ্রদমন।

ইন্দ্রদমন ছিলেন সর্বগুণে গুণী মহারাজা, তাঁর শাসনে থেকে প্রজাদের সুখ-সৌভাগ্যের সীমা ছিল না। প্রজারা পুষ্পপুরের সঙ্গে পুরাণ-বিখ্যাত রামরাজত্বের তুলনা করত সগৌরবে।

একদিন সকালবেলায় উঠে মহারাজা ইন্দ্রদমন তাঁর প্রধান মন্ত্রীকে স্মরণ করলেন।

মন্ত্রী এসে দেখলেন, মহারাজের কপালে চিন্তার রেখা। একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মহারাজ, এমন অসময়ে হঠাৎ আমাকে স্মরণ করলেন কেন?"

মহারাজা মৃদু হেসে বললেন, "কারণ আছে, মন্ত্রিবর! কাল থেকে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে।"

—"মহারাজ, আপনার মন ব্যাকুল? কেন, বহিঃশত্রু কি আমাদের রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে?"

মহারাজা বললেন, "না মন্ত্রীমশাই, ও-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! রাজ্য আমার নিরাপদ, প্রজাদের দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই, কিন্তু ব্যাকুলতা জেগেছে আমার মনের ভিতরেই।"

—"এ ব্যাকুলতা কিসের মহারাজ?"

—"মন্ত্রী, ইহকালে আমার তো কোন অভাবই নেই, কিন্তু পরকালের জন্যে কিছুই যে সঞ্চয় করতে পারিনি! এই রাজত্ব কাঁধে ক'রে আমি তো বৈতরণীর পরপারে যেতে পারব না! সেইজন্যেই ব্যাকুল হয়েছি।"

—"মহারাজ, আপনি কি করতে চান?"

—"আমি যদি কিছুদিন তীর্থে গিয়ে ধর্মাচারণ ক'রে আসি, তা'হলে হয়তো পরকালের একটা উপায় হ'তে পারে। আপনার মত কি মন্ত্রী?"

মন্ত্রী একটু ভেবে বললেন, "আপনি হচ্ছেন এ-রাজ্যের মাথা। আপনি না থাকলে রাজকার্যে অনেক বাধা উপস্থিত হতে পারে। আপনাকে আমরা ছাড়তে পারব না।"

মহারাজা দৃঢ়স্বরে বললেন, "চিরকালটাই আপনারা আমাকে ইহকালের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বলেন? তা হয় না মন্ত্রী! তীর্থপর্যটন করা হিন্দুরাজাদের একটি প্রধান কর্তব্য কাজ; আপনারা আমাকে আর কর্তব্য পালনে বাধা দেবেন না। আমি মন স্থির ক'রে ফেলেছি।"

প্রধান মন্ত্রী বললেন, "কিন্তু মহারাজ, আপনার অবর্তমানে রাজ্যের ভার নেবে কে ? যুবরাজ এখনও সাবালক হননি।"

মহারাজ বললেন, "কেন, রাজ্যচালনা করবেন আমার ছোট ভাই রুদ্রনারায়ণ।"

রুদ্রনারায়ণের নাম শুনেই প্রধান মন্ত্রীর মুখ গম্ভীর হয়ে পড়ল। কিন্তু তাঁর গাম্ভীর্য মহারাজাকে বাধা দিতে পারলে না। তিনি যথা-সময়ে তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়লেন।

কিন্তু মন্ত্রীর দুর্ভাবনার কারণও আছে। রাজা না হয়েই রুদ্রনারায়ণ দেশময় এমন সুনাম কিনেছিলেন যে, প্রত্যেক লোকই করত তাঁকে যমের মত ভয়। লোকের উপরে অত্যাচার করা—কারুর হাত, কারুর পা কেটে নেওয়া—প্রজাদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া—এইসব ছিল তাঁর কাছে মজার খেলা! তাঁর নিষ্ঠুরতায় কত প্রজাই যে শহর ও গ্রাম ছেড়ে প্রাণের ভয়ে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছে, তার আর সংখ্যা নেই। মহারাজা তাঁর এই অবাধ্য ভাইটিকে ভালো-বাসতেন; কারণ, শিশুকাল থেকেই তিনি পুত্রাধিক স্নেহে তাঁকে লালন-পালন ক'রে আসছেন। রুদ্রনারায়ণের অত্যাচার কাহিনী শুনলে তিনি ক্ষুব্ধ হ'তেন, ক্রুদ্ধও হ'তেন এবং ভাইকে সৎ উপদেশও দিতেন, কিন্তু কোন কঠোর শাস্তির কথা তাঁর মনে আসত না। সবদিকে গুণ-বান্ মহারাজ ইন্দ্রদমনের দুর্বলতা ছিল এইটুকুই।

মহারাজের তীর্থগমনের পর এই রুদ্রনারায়ণেরই হাতে পড়ল এত-বড় রাজ্যচালনার ভার এবং দুদিন যেতে না যেতেই তাঁর কঠিন রাজদণ্ড-পরিচালনায় দিকে দিকে উঠল প্রজাদের মর্মভেদী আর্তনাদ!

মন্ত্রীরা সর্বদাই ভয়ে তটস্থ,—একটু এদিক-ওদিক হ'লেই রাজভ্রাতার মুখের কথায় কাঁধের উপর থেকে মুণ্ড খোয়া যাবার সম্ভাবনা! দেশের কোন সাধু লোকই সুপরামর্শ দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন না, রাজ-ভ্রাতার চারিপাশে এসে জুটল যত-সব অত্যাচারী দুষ্ট জমিদার। প্রতি-দিনই হ'তে লাগল নতুন নতুন কড়া আইন জারি!

হঠাৎ একদিন শোনা গেল, রাজভ্রাতার হুকুম হয়েছে, বনের ভিতরে কেউ হরিণ শিকার করতে পারবে না, হরিণ বধ করলেই প্রাণদণ্ড হবে।

রুদ্রনারায়ণের সমস্ত অত্যাচার ও খেয়ালের কথা এখানে উল্লেখ না করলেও চলবে। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ছয়মাস যেতে না যেতেই প্রজারা সর্বদাই প্রার্থনা করতে লাগল, "হে মা কালী, হে মা দুর্গা, আমাদের দয়াল রাজা ইন্দ্রদমনকে আবার ফিরিয়ে আনো!"

কিন্তু ইন্দ্রদমনের তাড়াতাড়ি ফেরার কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না। তিনি যে এখন ভারতের কোথায়, কোন তীর্থে পর্যটন করছেন—সে খবরও কেউ জানে না।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিধিরামের হরিণ-শিকার

পুষ্পপুর শহর থেকে মাইল-পঞ্চাশ তফাতে একখানি গ্রাম ছিল। গ্রামের নাম হচ্ছে ময়নাপুর। রবীন্দ্র চৌধুরী ছিলেন সেখানকার জমিদার।

এ-অঞ্চলে এইখানিই হচ্ছে শেষ গ্রাম। কারণ, এই গ্রামের পরই খানিকটা চাষ-জমি ও মাঠ, এবং তারপরই আরম্ভ হয়েছে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল।

তখন বর্ষা নেমেছে, সবুজ বনের উপরে আকাশ মেলে দিয়েছে তার কাজল-কালো মেঘের আঁচল। মাঠের উপরে এবং জঙ্গলের ভিতরে কোথাও থৈ থৈ জল, কোথাও দুই ইঞ্চি পুরু আঠার মতন কাদার প্রলেপ। এ-বছরের বর্ষা এখানে এসেছে একটা দুর্ভাগ্যের মতন; কারণ, অতিরিক্ত জল-ঝড়ে ক্ষেতের সমস্ত ফসলই প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং চাষীদের ঘরে ঘরে উঠেছে হাহাকার।

সেদিন সকালে জঙ্গলের ভিতরে দেখা গেল একজন লোককে। তার পরনে ময়লা ছেঁড়া কাপড়, মুখে ভয় ও উদ্বেগের চিহ্ন এবং হাতে ধনুক-বাণ। ঝোপ-ঝাপের ভিতর দিয়ে চোরের মতন এগুতে এগুতে মাঝে মাঝে সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ছে; সতর্ক চোখে একবার এদিকে-ওদিকে ও পিছনদিকে তাকিয়ে দেখছে, তারপর আবার অগ্রসর হচ্ছে পা টিপে টিপে সামনের দিকে।

জঙ্গল সেখানে ঘন নয়। মাঝে মাঝে গাছপালা ঝোপঝাপ্, মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘাসজমি।

এই-রকম ছোট্ট একটি সবুজ জমির উপরে দেখা গেল একদল হরিণকে। তাদের দেখেই লোকটির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ধনুকে বাণ লাগিয়ে লক্ষ্য স্থির ক'রে বাণ ত্যাগ করলে। একটা হরিণ তখুনি মাটির উপরে প'ড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল এবং বাকি হরিণগুলো পালিয়ে গেল।

লোকটি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে একখানা বড় ছুরি বার ক'রে আহত হরিণটাকে বার-কয়েক আঘাত করলে। হরিণটার দেহ থেকে বাকি প্রাণটুকুও বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ হ'ল। লোকটা চম্‌কে এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠল, তার মুখ মড়ার মতন সাদা!

তখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে একটি যুবক। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ গঠন। তাকে দেখলেই বোঝা যায় সে বড়-ঘরের ছেলে।

আগন্তুক গম্ভীর স্বরে বললে, "তোমার ছোরা নামাও নিধিরাম! তুমি কি আমাকেও মারতে চাও?"

নিধিরামের হাত থেকে ছোরাখানা প'ড়ে গেল, এবং সেও তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে ব'সে প'ড়ে কাতর স্বরে ব'লে উঠল, "হুজুর, হুজুর! আমাকে মাপ করুন, তিনদিন আমি খেতে পাইনি! আজ এই হরিণটাকে না মারলে আমাকে মারা পড়তে হ'ত।"

—"হরিণটা মেরেও আজ তো তোমাকে মারা পড়তে হবে নিধিরাম।

তুমি কি জাননা এ-রাজ্যে হরিণ-শিকারের শাস্তি হচ্ছে শূলদণ্ড?"

নিধিরাম হতাশভাবে বললে, "জানি কর্তামশাই, জানি! না খেয়ে মরার চেয়ে, খেয়ে মরাই কি ভালো নয়? জমিদারবাবু আমাকে আজ পথের ভিখারী করেছেন। আমার আর মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই।"

যুবক বললে, "তুমি তো রাঘব রায়ের প্রজা?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তামশাই, কিছুদিন আগেও আমি তাই ছিলুম! কিন্তু আজ আমি ভগবানের প্রজা—যদিও তিনিও আমার দিকে মুখ তুলে তাকাতে রাজি নন্।"

—হ্যাঁ নিধিরাম, রাঘব রায় যে বড় কঠিন লোক, সে-কথা এ-অঞ্চলে সবাই জানে। কিন্তু তিনি তোমার কি করেছেন?"

—"তিনি? কর্তামশাই, তিনি আমার সর্বনাশ করেছেন। এবারের বর্ষায় আমার ক্ষেতে ফসল হয়নি, তাই খাজনা দিতে পারিনি। সেই দোষে জমিদারবাবু আমার ঘর-বাড়ি দখল ক'রে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। বৌ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাকে গাছতলায় এসে বসতে

হয়েছিল। কিন্তু কর্তামশাই, গাছতলায় ব'সে মানুষ কি আর বাঁচতে পারে? বৌ আর মেয়েটা গেল-হপ্তায় ওলাউঠায় মারা পড়েছে, এখন ছেলেটাকে নিয়ে বেঁচে আছি খালি আমি। কিন্তু আজ তিনদিন আমাদেরও পেটে অন্ন পড়েনি, আজ সকালে ছেলেটা ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট ক'রে কাঁদছিল; তাই আর আমি সইতে না পেরে, বনের ভিতরে এসে মেরেছি এই হরিণটাকে। এর জন্যে যদি মরতেও হয়, তাহ'লে অন্তত আমি ছেলেকে খাইয়ে আর নিজেও খেয়ে-দেয়ে ভরা-পেটে মরতে পারব।"

যুবকের দুই চোখে জাগল দয়ার আভাস। সে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার ছেলে কোথায় নিধিরাম?"

নিধিরাম আঙুল তুলে বনের বাইরের দিকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, "ঐখানে একটা গাছতলায় কাঁথামুড়ি দিয়ে তাকে শুইয়ে রেখে এসেছি।"

যুবক অল্পক্ষণ নীরবে কি ভাবলে। তারপর বললে, "আচ্ছা নিধিরাম, তোমার ছেলেকে নিয়ে তুমি আমার বাড়িতে চল। তারপর দেখা যাবে, তোমার কোন ব্যবস্থা করতে পারি কি না।"

নিধিরাম যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলে না; খানিকক্ষণ সে হাঁ ক'রে যুবকের পানে তাকিয়ে রইল। তারপর বিস্মিত স্বরে বললে, "কর্তামশাই, আমি যাব আপনার বাড়িতে! আমি যে রাজার হরিণ মেরেছি!"

যুবক হাসতে হাসতে বললে, "নিধিরাম, হরিণের পাল যখন আমার প্রজাদের ক্ষেতে এসে অত্যাচার করে, তখন আমাকেও মাঝে মাঝে দু-চারটে মারতে হয় বৈকি! এসো নিধিরাম, ছেলেকে নিয়ে সঙ্গে এসো; অন্তত আমার গোয়ালঘরের কোণেও তোমাদের জন্যে একটুখানি জায়গা হ'তে পারে।"

নিধিরাম যুবকের সঙ্গে অগ্রসর হ'ল। এই যুবকের নাম, রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, ইনিই ময়নাপুরের তালুকদার।

তিন বছর আগে, রবীন্দ্রনারায়ণের পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন

রঘুনাথপুরের জমিদার রাঘব রায় এই তালুক থেকে তাকে বঞ্চিত করবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। তবু আজ ময়নাপুর-তালুকের উপরে তার শনির দৃষ্টি হয়ে আছে সর্বদাই জাগ্রত।

দুপুরবেলায় বনের চারিদিকে তদারক করতে করতে পাইক হরু-সর্দার এক জায়গায় এসে সবিস্ময়ে দেখলে, মাটির উপর লেগে রয়েছে অনেকখানি রক্তের দাগ।

হরু-সর্দার নিজের মনে মনেই বললে, "হুঁ, দেখছি এখানে হরিণ-টরিণ মারা হয়েছে।...কিন্তু মারলে কে? আর ব্যাটা গেলই-বা কোন্ দিকে?"

তাকে বেশিক্ষণ খুঁজতে হ'ল না। এদিকে-ওদিকে দু-একবার চোখ বুলিয়ে সে দেখতে পেলে, কাদার উপরে দু জোড়া পায়ের ছাপ। পরীক্ষা ক'রে বুঝলে, এখানে যে-দুজন লোক এসে দাঁড়িয়েছিল, তাদের এক-জনের পায়ে জুতো আছে, আর একজনের খালি পা।

সেই দু-জোড়া পায়ের ছাপ কাদার উপর দিয়ে বরাবর বনের বাইরে চ'লে গেছে, হরু-সর্দার তার অনুসরণ ক'রে অগ্রসর হ'তে লাগল। তারপর সেই চিহ্ন ধ'রে সে একেবারে হাজির হ'ল গিয়ে ময়নাপুর গ্রামের চৌধুরী-বাড়ির ফটকের কাছে। এবং সেইখান থেকেই সে দেখতে পেলে, চৌধুরী-বাড়ির বাইরেকার উঠানে ব'সে নিধিরাম একমনে একটা মৃত-হরিণের গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে দিচ্ছে।

হরু আর সেখানে দাঁড়াল না, সিধে চলল একেবারে রঘুনাথপুরে, রাঘব রায়ের কাছে। ময়নাপুর থেকে রঘুনাথপুর বেশি দূর নয়। আর, ময়নাপুরের মতন রঘুনাথপুরের গ্রামখানিও আকারে ছোট-খাট নয়; তাকে একখানি মস্ত গ্রাম বা ছোট নগর বলা চলে। চারিদিকে অনেক লোক আসা-যাওয়া করছে, প্রকাণ্ড জমিদার-বাড়ি—দেখতে প্রায় কেল্লার মতনই, ফটকে ব'সে আছে, নাদা-পেট, ইয়া গাল-পাট্টাওয়ালা দারোয়ানের দল!

ফটকের ভিতর দিয়ে ঢুকে হরু-সর্দার একেবারে সেইখানে হাজির

হ'ল, যেখানে বৈঠকখানায় ব'সে রাঘব রায় জমিদারী কাজ-কর্মের তত্ত্বাবধান করছে। এই রাঘব রায় হচ্ছে এ-অঞ্চলের একজন জবরদস্ত মস্ত জমিদার। তার উপরে সে হচ্ছে, রাজভ্রাতা রুদ্রনারায়ণের একজন বিশেষ বন্ধু এবং এইজন্যে সকলে—বিশেষ ক'রে গরীবরা তাকে ভয় করত মূর্তিমান যমের মত! ভয় করবার কারণও ছিল যথেষ্ট, এখানকার লোকজনের উপরে সে এত নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছে যে, ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না।

হরু-সর্দার ঘরে ঢুকেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে বললে, "হুজুর, রাজার হরিণ সাবাড়!"

রাঘব রায়ের মুখ থেকে আল্‌বোলার নল খ'সে পড়ল। চম্‌কে, চোখ পাকিয়ে তিনি ব'লে উঠলেন, "হরিণ সাবাড় মানে কি রে? কে সাবাড় করলে?"

হরু সর্দার বললে, "হুজুর, ময়নাপুরের রবীন চৌধুরী! আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, রবীন চৌধুরীর উঠোনে ব'সে সেই ব্যাটা নিধিরাম হরিণের ছাল ছাড়াচ্ছে।"

রাঘব গর্জন ক'রে ব'লে উঠল, "হুঁ, রবীন চৌধুরী, বটে? এতদিন পরে হতভাগাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি! ক্ষুদে তালুকদার রবীন চৌধুরী, আর পথের ভিখিরী নিধিরাম—এখুনি আমি মোহান্ত রামগিরির কাছে চললুম! দেখি, রবীন চৌধুরীর চোখ দু'টো উপড়ে আর তার হাত-দু'টো কেটে নিতে পারা যায় কিনা।" সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

হরু-সর্দার আবার একবার নমস্কার ক'রে জোড়-হাতে বললে, "হুজুর, আপনাকে এত-বড় একটা খবর এনে দিলুম, আমাকে পুরস্কার দেবার হুকুম হোক্!"

রাঘব বললে, "পুরস্কার? হ্যাঁ, পুরস্কার তুমি পাবে বৈকি! আগে মোহান্ত-মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রবীন চৌধুরীর মুণ্ডপাত ক'রে আসি, তারপর হবে তোমার পুরস্কারের ব্যবস্থা।" এই ব'লেই সে ফিরে চেঁচিয়ে হুকুম দিলে, "ওরে, কে আছিস্ রে, শীগগির একদল পাইক্ আর তীরন্দাজ নিয়ে আমার সঙ্গে চল্! হরু, তুইও আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়্!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রবীনের সুন্দরবনে যাত্রা

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম ক'রে রবীন একবার দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

বাড়ির সামনে একটা বড় মাঠ। বৈকালের সূর্য তখন পশ্চিম-আকাশের দিকে এগিয়ে গিয়েছে এবং মাঠের উপরে বড় বড় গাছের ছায়াগুলো হয়ে পড়ছে ক্রমেই দীর্ঘতর।

দূরে মাঠে হঠাৎ একটি দৃশ্য রবীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। মাঠের উপর দিয়ে আসছে একদল সশস্ত্র লোক এবং তাদের আগে আগে ঘোড়ায় চ'ড়ে রঘুনাথপুরের রাঘব রায়।

দুপুরে পাইক হরু-সর্দার যে তার বাড়ির উঠানের ভিতরে উঁকি মেরে গিয়েছিল, এ-খবরটা তিনি পেয়েছিলেন যথা সময়েই। তারপর এখন তাঁর চিরশত্রু রাঘব রায়কে সদলবলে এদিকে আসতে দেখে আসল ব্যাপারটা তিনি খুব সহজেই বুঝে ফেললেন। কিন্তু রবীন চৌধুরী ভয় পাবার ছেলে নন্। গলা তুলে হাঁক্ দিলেন, "সুন্দরলাল!"

সুন্দরলাল হচ্ছে তাঁর পাইকদের সর্দার। সে এসে সেলাম ঠুকে বললে, "কি হুকুম, কর্তামশাই?"

রবীন বললেন, "সুন্দরলাল, শীগ্‌গির জন-কয় লোক নিয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে পথ আগ্‌লে দাঁড়াও। সঙ্গে হাতিয়ার নিতে ভুলো না। রঘুনাথপুরের রাঘব রায় আসছে আমার বাড়িতে হানা দিতে।"

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে আর-এক ছোক্‌রা বেরিয়ে এসে বললে, "কর্তামশাই, আমিও তীর-ধনুক ছুঁড়তে পারি, আমিও সুন্দরদাদার সঙ্গে যাব।"

রবীন একটু ঘাড় নেড়ে হেসে সায় দিলেন।

ছোক্‌রা আহ্লাদে আটখানা হয়ে লাফাতে লাফাতে চ'লে গেল। সে হচ্ছে সামু, রবীনের প্রজা বিষ্ণুলালের ব্যাটা। দুপুরবেলায় বাপকে ফাঁকি দিয়ে সুন্দরলালের কাছে এসেছিল আড্ডা মারতে।

এমন সময়ে নিধিরাম কোথা থেকে ছুটে এসে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "কর্তামশাই, কর্তামশাই! আমার জন্যে কেন আপনি বিপদে পড়বেন? তার চেয়ে ওদের কাছে গিয়ে আমিই নিজের দোষ স্বীকার ক'রে আসি। আমাদের কপালে যা আছে, তাই হবে।"

রবীন বললেন, "চুপ করো নিধিরাম, বাজে বক্‌বক্‌ কোরো না! রবীন চৌধুরী যাকে আশ্রয় দেয়, তাকে কখনো ত্যাগ করে না। তার জন্য সে সব বিপদ সইতে প্রস্তুত! যাও, তুমি লুকিয়ে থাকগে! আজ আমি রাঘব রায়ের বিষ-দাঁত ভাঙ্‌ব, তবে ছাড়্‌ব!"

খানিক পরে দলবল নিয়ে রাঘব রায় যখন চৌধুরী-বাড়ির কাছে এসে পড়ল, তখন সে একটু বিস্মিতভাবেই দেখলে, তার পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে প্রথমেই রবীন চৌধুরী, তারপর সুন্দরলাল ও রামু, তারপরে ছয়জন পাইক! রবীনের হাতে ধনুক, কোমরে তরবারি, রামু ও সুন্দরলালেরও সেই হাতিয়ার এবং পাইক ছ'জনের হাতে বড় বড় লাঠি ও কাঁধে ঝোলানো ধনুক।

তীর-ধনুকে রবীনের দক্ষতা ছিল এ-অঞ্চলে বিখ্যাত। লাঠি খেলাতেও তাঁর জুড়ি পাওয়া যেত না; এবং তাঁর কাছ থেকে রীতিমত শিক্ষালাভ ক'রে এইসব পাইকও হয়ে উঠেছিল লাঠি-খেলায় ও অস্ত্র-চালনায় যথেষ্ট নিপুণ।

রাঘব রায় ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রবীন তাঁর ধনুকে তীর যোজনা করলেন। সুন্দরলাল ও রামুও করলে তাদের প্রভুর দৃষ্টান্তের অনুকরণ।

ঘোড়ার উপর থেকে রাঘব গম্ভীরস্বরে বললে, "ওহে ময়নাপুরের রবীন চৌধুরী! এখুনি অস্ত্র ফেলে দিয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর!

মোহান্ত-মহারাজ রামগিরির কাছে আমাদের সঙ্গে তোমাদের যেতে হবে।"

ধনুকে তীর লাগিয়ে রবীন ছিলা টেনে ধরলেন—যেন এখনই তিনি অস্ত্র ত্যাগ করবেন। তাই দেখে রাঘবের পাইক্‌রা পিঠ থেকে বাঁধন আল্‌গা ক'রে ঢালগুলো হাতে নিলে।

রবীন হাসতে হাসতে বললেন, "রায়-মশাই, আপনি যে এসেই বড় শক্ত শক্ত কথা শুরু করেছেন। ব্যাপার কী? কী আমি করেছি? আত্ম-সমর্পণ করব কেন?"

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে রাঘব বললে, "কী তুমি করেছ? তোমরা রাজার হরিণ মেরেছ। এর শাস্তি কি জানো তো? তোমার তালুক হবে বাজেয়াপ্ত আর তোমার ডান হাত যাবে কাটা।"

রবীন বললেন, "এখনো বিচার হ'ল না, তার আগেই শাস্তির ব্যবস্থা হয়ে গেল?"

ঘৃণাভরে রাঘব বললে, "ওরে গাধা! তোর আবার বিচার কিরে? তুই নিজেকে একটা কেউকেটা ব'লে মনে করিস্ না কি? না, না, বিচার-টিচার তোর হবে না—"

রবীনও খাপ্পা হয়ে বললেন, "ওরে বদ্‌মাইস্ চোর! জানি, বিচার আমার হবে না! মহারাজ ইন্দ্রদমন তীর্থে যাবার পর থেকেই এ-রাজ্য হয়েছে অরাজক! কিন্তু আমার তালুকে, বাইরের লোকের গোলমাল আমি সহ্য করব না! আর এক পা কেউ যদি এগিয়ে আসে, তাহ'লে কাল আর সূর্যের মুখ দেখতে পাবে না।"

রাঘব তার ঘোড়ার উপরে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল। তারপর নিজের একজন পাইক্‌কে সে কাছে আসবার জন্যে ইঙ্গিত করলে। পাইক্ ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়ালে পর, রাঘব চুপি চুপি তার কানে কানে বললে, "ঢালের আড়ালে দাঁড়িয়ে রবীন চৌধুরীকে টিপ্ ক'রে একটা বাণ ছোঁড়ো।"

পাইক্ পিছিয়ে গিয়ে তখনি করলে প্রভুর হুকুম্ তামিল। একটা

তীর সশব্দে বাতাস কেটে শূন্যে ছুটে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তীর-বিদ্ধ মস্তকে রবীনের একজন পাইক্ লুটিয়ে পড়্ল মাটির উপরে।

রবীন গর্জন ক'রে বললেন, "তাহ'লে তোরাই করলি প্রথম রক্তপাত! ওরে রাঘব রায়, হুঁশিয়ার! নইলে আমার তালুকে ঢুক্‌বে তোর মৃতদেহ।" ব'লেই তিনি তাঁর ধনুক তুলে তীর ত্যাগ করলেন।

তীর এমন বেগে গিয়ে রাঘবের বর্মের উপরে আঘাত করলে যে, সে তখনি ঘোড়া থেকে প'ড়ে যেতে যেতে কোনরকমে নিজেকে সামলে নিলে। বর্ম না থাক্‌লে সেদিন তাকে আর বাঁচতে হ'ত না! তারপরেই চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই রবীনের ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত আর-একটা তীর সেই লোকটার উপরে গিয়ে পড়ল, সর্বপ্রথমে যে করেছিল অস্ত্রত্যাগ! সেও তখনি হ'ল 'পপাত ধরণীতলে'। দেখতে দেখতে তার রক্তে সেখানকার মাটি রাঙা হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যেই রবীনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরলাল ও রামুও আরো কতকগুলো তীর ছুঁড়েছে। এবং তার ফলে রাঘবের দলের আরো একজন লোক মারা পড়ল ও আর-একজনের পায়ের ডিম হয়ে গেল এফোঁড়-ওফোঁড়!

রবীন বললেন, "তিন্‌টে আপদ্ গেল।" বলেই তিনি দেখতে পেলেন, শত্রুপক্ষের একজন তীরন্দাজ ধনুক তুলে তাঁর দিকে লক্ষ্য স্থির করছে। পর-মুহূর্তেই রবীনের ধনুকের ছিলা বেজে উঠল এবং একটা বাণ ছুটে গিয়ে লোকটার কব্জী ক'রে দিলে ছ্যাঁদা!

রবীন চিৎকার ক'রে বললেন, "চারটে আপদ গেল! ওহে রাঘব রায়, আমার অভ্যর্থনা কেমন লাগছে তোমার?" বলেই আবার টানলেন ধনুকের ছিলা এবং আবার আর-একটা বাণ গিয়ে আঘাত করলে রাঘবের বর্মকে! এবারে আর টাল সামলাতে না পেরে মাটির উপরে ঠিক্‌রে প'ড়ে রাঘব গড়াগড়ি খেতে লাগল।

ঠিক এই সময়েই কোথা থেকে পাগলের মতন ছুটে এল নিধিরাম—জ্বলন্ত তার দুই চক্ষু, জ্বলন্ত তার হাতের ছোরা!

সকলকে এড়িয়ে একলাফে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল হরু-সর্দারের ঘাড়ের উপরে এবং এক ধাক্কায় তাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেলে, তার দেহের উপরে ছোরার আঘাত করতে করতে বললে, "ওরে গুপ্তচর! তোর জন্যেই আজ আমি সর্বহারা! তুই আমার বৌকে মেরেছিস, এই নে,—খা এক ঘা; এই নে,—খা আরও এক-ঘা! তুই আমার মেয়েকে মেরেছিস্, এই নে,—খা আরও-এক ঘা!"—আঘাত সইতে সইতে মরণোন্মুখ হরু-সর্দারও ছোরা তুলে নিধিরামের বুকের উপরে বসিয়ে দিলে! হরু-সর্দারের মৃতদেহের উপরে লুটিয়ে পড়ল নিধিরামের মৃতদেহ!

সকলের দৃষ্টি যখন নিধিরাম ও হরু-সর্দারের দিকে আকৃষ্ট, সেই অবসরে রাঘব রায় তার এক অনুচরের সাহায্যে মাটি থেকে আবার উঠে পড়ল। এবং রাগে আগুন হয়ে চিৎকার ক'রে বললে, "আক্রমণ কর! আক্রমণ কর!"

কিন্তু আক্রমণ করবে কি, রাঘবের সাঙ্গোপাঙ্গরা রবীনের দলের তীর এড়াবার জন্যেই শশব্যস্ত হয়ে উঠল।

রাঘব জানে তার দেহে আছে কঠিন বর্ম, কোন তীরই তা সহজে ভেদ করতে পারবে না। সুতরাং সাহসে ভর ক'রে সে তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে এল।

রবীনও তখন ধনুকের বদলে তরবারি নিয়ে রাঘবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং দু'জনের মধ্যে আরম্ভ হ'ল বিষম এক দ্বন্দ্বযুদ্ধ!

দু'পক্ষের লোকই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখতে লাগল।

কিন্তু ঘোড়ার উপর থেকে প'ড়ে গিয়েই রাঘব তখনো কাবু হয়ে আছে, তার উপরে দেহে তার রীতিমত ভারি বর্ম; কাজেই রবীনের ক্ষিপ্র-গতিকে সে বেশিক্ষণ বাধা দিতে পারলে না—বর্মের উপর তরবারির চোট খেয়ে আবার হ'ল পপাত ধরণীতলে!

কঠিন বর্ম লেগে রবীনের তরবারি ভেঙে দু'খান হয়ে গেল, তিনি তাড়াতাড়ি শত্রুর আল্‌গা মুঠোর ভিতর থেকে তরবারিখানা টেনে নিয়ে বললেন, "ওহে রাঘব রায়, বর্মের দৌলতে এ-যাত্রা তুমি বেঁচে গেলে

বটে, কিন্তু এখন আত্মসমর্পণ করবে কিনা বল!"

দাঁতে দাঁত চেপে রাঘব বললে, "কখনো না!"

রবীন ফিরে বললেন, "সুন্দরলাল, তুমি এসে রাঘবকে ধর। দড়ি দিয়ে ওকে খুব ক'ষে বেঁধে ফ্যালো। এইবারে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া হবে।"

সুন্দরলাল প্রভুর হুকুম তামিল করলে। রাঘব বিফল আক্রোশে ফুলতে ফুলতে অশ্রান্তভাবে গালাগালি বৃষ্টি করতে লাগল।

রবীন বললেন, "চুপ কর রাঘব, চুপ কর! তোমার মন আর মুখ দুইই সমান খারাপ। জানো, এখন তোমার মাথার ওপরে খাঁড়া ঝুলছে?"

রাঘব বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ অপমানের চেয়ে মৃত্যুও ভালো! মারো আমাকে!"

—"না রাঘব, আজ এরি মধ্যে মারা পড়েছে অনেকে, আর রক্তপাত নয়! শোনো রাঘব, আজ যে ব্যাপারটা হ'ল, তার ফলে আমাকে যে লোকালয় ছাড়তে হবে, একথা আমি জানি। তোমাদের প্রভু মোহান্ত রামগিরি আমাকে আর কখনই ক্ষমা করবে না। সে যখন এ-অঞ্চলের সর্বেসর্বা, তখন তার কাছে আমি একজন দূত পাঠাতে চাই!...সুন্দরলাল, রাঘবকে ধরাধরি ক'রে আবার ঘোড়ার ওপরে তুলে দাও তো!... হ্যাঁ, রাঘবের মুখ ফিরিয়ে দাও ঘোড়ার ল্যাজের দিকে!"

রাঘব বাধা দেবার জন্যে প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল, কিন্তু তার কোন জারিজুরিই খাটল না। সুন্দরলাল তাকে টেনে তুললে ঘোড়ার উপরে এবং রাম তার পা দুটোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলে ঘোড়ার পেটের তলায়।

রবীন বললেন, "ভালো ক'রে শুনে রাখো রাঘব! আজ তুমিই হ'লে আমার দূত! মোহান্ত রামগিরিকে বলবে, তিনি আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ যত ডাকাতের দলকে আমি থোড়াই কেয়ার করি! আজ আমি তোমাদের হাতে ময়নাপুরকে ছেড়ে চললুম বটে, কিন্তু আজ থেকে আমি হলুম তোমাদের চিরশত্রু! তোমাদের মত যত ডাকাত আছে এ-অঞ্চলে, আজ থেকে আমি তাদের সকলের বিরুদ্ধে করব যুদ্ধ-ঘোষণা! হ্যাঁ,

আর-এক কথা ! ময়নাপুর জমিদারী হাতিয়ে ভেবোনা খুব দাঁও মারলুম ! কারণ, ও-জমিদারীর দাম আমি শীগ্গিরই তোমাদের ঘাড় ধ'রে আদায় ক'রে নেব !—যাও !" ব'লেই তিনি নিজের তরবারির উল্টো পিঠ দিয়ে রাঘবের ঘোড়ার দেহে আঘাত করলেন এবং পর-মুহূর্তেই ঘোড়াটা তীরবেগে ছুটে চলল।

রবীন ফিরে নিজের দলের লোকদের ডেকে বললেন, "ভাই সব, ঐ রাঘব আর রামগিরি যখন রাজার সৈন্যদের নিয়ে ফিরে আসবে, তখন আমাদের অবস্থা কি হবে জানো ?"

সুন্দরলাল বুক ফুলিয়ে বললে, "প্রভু, যা হবার তা হবেই, কিন্তু আমরা সবাই শেষপর্যন্ত থাকব আপনার পাশেই।"

—"হুঁ, আমার পাশে থাকবে বটে, কিন্তু কোথায় ? কারাগারে ? না, আমার সঙ্গে তোমরাও যাত্রা করবে সুন্দরবনে ? সুন্দর সেই সুন্দর-বন ! সেখানে বাতাস বেড়ায় ফুলের গন্ধ বিলিয়ে আর মাথার উপরে সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সুনীল আকাশ ! সেখানকার পথ ঘাট সব আছে আমার নখদর্পণে ! শুয়ে থাকব নরম ঘাসের বিছানায়, ভোর হ'লে জেগে উঠব পাখিদের গানে, ক্ষিধে পেলে করব আমরা হরিণ-শিকার ! আর যখনি সুবিধা পাব, বন থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করব অত্যাচারী দস্যুদলকে ! স্বাধীন জীবন, উদ্দাম আনন্দ ! কে আমার সঙ্গে যাবে ?"

সকলে সমস্বরে ব'লে উঠল, "আমরা সবাই যাব—সবাই যাব !"

রবীন বললেন, "ভাই সব, বহুৎ-আচ্ছা ! এখন তাড়াতাড়ি দরকারি জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও ! আর রামু, বেচারা নিধিরামের ছেলেকে তোমার বাপের জিম্মেয় রেখে এস !"

সেইদিন দুপুর-রাত্রের মধ্যেই ময়নাপুরের জমিদার-বাড়ি একেবারে খালি হয়ে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রবীনের নতুন নাম

যেখানে সুন্দরবন মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পায় না, যেখানে গাছের মাথায় মাথায় উড়ে বেড়ায় গান-গাওয়া পাখির ঝাঁক, আর তলায় তলায় ঘুরে বেড়ায় বনের হরিণরা, যেখানে চারিধারে আছে অরণ্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর আর তাদের পদতল ধুয়ে ব'য়ে যায় কলধ্বনি তুলে ছোট-বড় নদীরা, সেইখানে গিয়ে দলবল নিয়ে বাসা বাঁধলেন ময়নাপুরের পলাতক-জমিদার রবীন চৌধুরী।

রবীনের এই নতুন আড্ডার খোঁজ রাখে না কেউ। কোন্ পথ দিয়ে কেমন ক'রে এখানে আসতে হয়, তাও কেউ জানে না। স্বচ্ছ নদী সকলের তেষ্টা মেটায়, জলখাবার দরকার হ'লে আছে নানান্ গাছের ফল, আর উদর-পূর্তির জন্যে নধর হরিণের বা নানা পাখির নরম মাংস। ভারি আমোদেই কয়েকটা দিন কেটে গেল।

একদিন রবীন বললেন, "ভাই সব, আমরা সবাই সমান। আমাদের মধ্যে কেউ মনিবও নেই, কেউ চাকরও নেই। দুনিয়ায় আমরা কারুর তোয়াক্কা রাখব না। আমরা হচ্ছি সুন্দরবনের মানুষ-বাঘ, এইবার আমাদের বিক্রম দেখাবার সময় এসেছে। কিন্তু মনে রেখো, আমরা চতুষ্পদ-পশু বাঘ নই, আমরা মানুষ-বাঘ,—মনুষ্য-ধর্ম ভুলব না। আমরা নিরীহ গৃহস্থ, গরীব চাষাভুষো আর ধার্মিক দয়ালু ধনীর ওপরে কোন অত্যাচারই করব না—আমাদের একমাত্র কর্তব্য হবে দুষ্টের দমন।"

দলের সবাই একবাক্যে ব'লে উঠল, "হ্যাঁ সর্দার, হ্যাঁ সর্দার।"

রবীন বললেন, "বেশ! আপাতত শিকারে বেরুনো যাক্।"

সেদিন শিকার করতে করতে তারা বনের প্রান্তে এসে পড়ল।

সেখান দিয়ে একটা বড় রাস্তা গেছে রাজধানী পুষ্পপুরের দিকে।

রবীনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখলে, সারি-সারি ছয়খানা গরুর গাড়ি ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং প্রথম গাড়িখানার ভিতরটা জুড়ে ব'সে আছে একটা গেরুয়া-পরা, পেট-মোটা, ন্যাড়া-মাথা মূর্তি। গাড়িগুলোর আগে-পিছনে যাচ্ছে কয়েকজন পাইক।

রবীন দলবল নিয়ে পথ জুড়ে দাঁড়াতে দেরি করলেন না।

গেরুয়া-পরা মূর্তিটা ভিতর থেকে ফোলা ফোলা গোল মুখখানা বার ক'রে ক্যাঁক্-কেকে গলায় বললে, "তোরা কে রে?"

রবীন হা হা ক'রে হেসে উঠে বললেন, "আমরা হচ্ছি, সোঁদরবনের মানুষ-বাঘ। তুমি কে ঠাকুর?"

—"সে খোঁজে তোর দরকার কি?—ওরে, কে আছিস রে, আপদ-গুলোকে গলাধাক্কা মেরে বিদেয় ক'রে দে তো!"

কিন্তু কে বিদায় ক'রে দেবে? ইতিমধ্যেই রবীন ও তাঁর সাঙ্গো-পাঙ্গদের ভাবভঙ্গি ও সাজপোশাক দেখেই বুদ্ধিমান্ পাইকরা গতিক সুবিধে নয় বুঝে চট্‌পট্ কোথায় স'রে পড়েছে।

রবীন বললেন, "ঠাকুর, ভালো চাও তো পরিচয় দাও

গেরুয়াধারী মুষড়ে প'ড়ে বললে, "আমি চন্দ্রনগরের মঠাধ্যক্ষ।"

—"যাচ্ছ কোথায়?"

—"পুষ্পপুরের মোহান্ত-মহারাজা রামগিরির কাছে।"

—"গাড়িগুলোর ভেতরে কি আছে?"

—"এমন কিছু নেই বাপু, যত আজে-বাজে জিনিস!"

—"মিথ্যে কথা। আমি জানি, বছরের এই সময়ে নানান্ মঠ থেকে রামগিরির কাছে নজর পাঠানো হয়।...সুন্দরলাল, গাড়ির মালগুলো নামিয়ে নাও তো!"

মঠাধ্যক্ষ ক্ষাপ্পা হয়ে বললে, "দেবতার জিনিসে হাত দিও না, সর্বনাশ হবে— নিপাত যাবে!"

—"দেবতার জিনিস? ওরে মিথ্যুক সন্ন্যাসী, রামগিরির ভুঁড়ি ভরিয়ে

তোরা দেবতাকে খুশি করতে চাস্? দেবতা কি এতই বোকা?"

সুন্দরলাল ও অন্যান্য সকলে মিলে গরুরগাড়ির ভিতর থেকে একে একে বার ক'রে ফেললে চার ঘড়া বাদশাহী মোহর, অনেক রূপোর বাসন ও ঝুড়ি ঝুড়ি মণ্ডা, মিঠাই আর মেওয়া প্রভৃতি!

মঠাধ্যক্ষ বললে, "মহারাজা রামগিরির সম্পত্তিতে হাত দাও, কে তুমি পাষণ্ড?"

রবীন আবার হো হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, "আমি পাষণ্ড নই ঠাকুর, আমি হচ্ছি, পাষণ্ডেরই যম! দেবতার নামে তোমরা যে-গরিবদের অন্নজল কেড়ে নাও, আমি হচ্ছি তাদেরই বন্ধু! আমার নাম, রবীন চৌধুরী!"

—"ও, ময়নাপুরের রবীন চৌধুরী? জানো, রাজা হুকুম জারি করেছেন—যে তোমাকে ধরতে পারবে, তাকে পঞ্চাশ মোহর পুরস্কার দেওয়া হবে?"

—"দুঃখের বিষয় ঠাকুর, সে পুরস্কার তোমার কপালে নেই!"

"সুন্দরলাল, ঠাকুর আর তার সঙ্গের লোকজনকে গাড়ির সঙ্গে পিছ্‌মোড়া ক'রে বেঁধে ফেল তো! এইভাবেই ওরা পুষ্পপুরে যাত্রা করুক্!"

"সুন্দরলাল তখনি আদেশ-পালনে নিযুক্ত হ'ল। মঠাধ্যক্ষ অনেক প্রতিবাদ করলে, অনেক অভিশাপ দিলে, অনেক হাত-পা ছুঁড়লে এবং টিকিও নাড়লে বারংবার, কিন্তু কোনই ফল হ'ল না!

সেইদিন থেকে রবীনের নাম হ'ল, রবি-ডাকাত!

ক্ষুদে জনার্দনের বাঁশের লাঠি

ময়নাপুরের জন্যে রবীনের একদিন মন কেমন করতে লাগল। তিনি আর থাকতে পারলেন না, ছদ্মবেশ প'রে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লেন।

কিন্তু ময়নাপুরে গিয়ে দেশের হাল-চাল দেখে তাঁর চোখে এল জল! এরি মধ্যে ক্ষেতে-ক্ষেতে চাষ বন্ধ হয়েছে, চাষারা ঘর-দোর ছেড়ে পালিয়েছে, গ্রাম প্রায় খাঁ-খাঁ করছে, বহু প্রজা পৈতৃক ভিটে ছেড়ে অন্য জমিদারের আশ্রয় নিয়েছে, অনেকের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আকাশের দিকে মুখ তুলে রবীন বললেন, "ভগবান, তুমি যদি থাকো, আমাকে এর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দিও! রাঘব রায় আর রামগিরি, এদের উচিতমত শাস্তি না দিয়ে আমাকে যেন মরতে না হয়।"

ভারাক্রান্ত প্রাণে রবীন আবার বনের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

ফেরবার পথে পড়ে একটা ছোট নদী। বিজনে গহনবনের কানে কানে যেন গানের তানে গল্প বলতে বলতে নদীটি এঁকেবেঁকে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে।

এক জায়গায় মস্ত-বড় একটা আস্ত গাছ কেটে নদীর বুকের উপরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বনবাসীরা তারই উপর দিয়ে এপার-ওপার করে। সেই বন্য সাঁকোর উপর দিয়ে একসঙ্গে দুজন লোক আনাগোনা করতে পারে না।

রবীন সাঁকোর একমুখে এসে দেখলেন, নদীর ওপার থেকে আসছে আর-একজন বিষম ডাগর মানুষ। মাথায় সে পাঁচ হাতেরও বেশী লম্বা এবং চওড়াতেও বড় কম নয়! পরণে মালকোঁচা-মারা কাপড়, হাতে ইয়া-মোটা তেলপাকা বাঁশের লাঠি।

সাঁকোর ও-মুখে পা দিয়েই দানবের মতন সেই লোকটা বাজখাঁই-গলায় বললে, "হট্ যাও, হট্ যাও, আমাকে আগে পার হ'তে দাও।"

রবীনও কম একগুঁয়ে নন। মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহু। তা হয় না হে ভুঁদোরাম। আগে পার হব আমি।"

দানব বললে, "গরিবের বাচ্ছা, ধাক্কা খেয়ে জলে প'ড়ে কেন দুঃখু পাবি?"

রবীন হেসে বললেন, "আমি না সাঙাত, আমার সঙ্গে লাগলে জলে ডুবে নাকানি-চোবানি খেতে হবে তোমাকেই।"

সাঁকোর মাঝখানে এগিয়ে এসে, হাতের লাঠির ডগাটা রবীনের নাকের কাছে নাড়তে নাড়তে দানব বললে, "স'রে পড়্, স'রে পড়্! নইলে তোর মুখে আর নাকের চিহ্নই থাকবে না।"

রবীন দুই পা পিছিয়েই নিজের ধনুকে বাণ যোজনা করলেন।

দানব বললে, "ধনুকের ছিলে টেনেছ কি লাঠির বাড়ি দিয়ে তোমার মাথা গুঁড়িয়ে ধুলো করেছি।"

রবীন বললেন, "ওরে হাঁদারাম, তুই লাঠি তোল্‌বার আগেই যে আমার বাণ গিয়ে তোর বুক ছ্যাঁদা ক'রে দেবে!"

লাঠির উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দানব বললে, "তুই হচ্ছিস্ মহা কাপুরুষ, আমার হাতে ধনুক থাকলে তোকে শিখিয়ে দিতুম কি ক'রে বাণ ছুঁড়তে হয়।"

রবীন বললেন, "আমার হাতে তোর মতন লাঠি থাকলে, আমিও তোকে লাঠি-খেলা শেখাতে পারতুম!"

দানব হেসে গড়িয়ে প'ড়ে বললে, "তাই নাকি, তাই নাকি? বেশ, তাহ'লে বাঁশঝাড় থেকে এখুনি একটা বাঁশ কেটে নিয়ে আয় না।"

রবীন বললেন, "তোমার মতন লড়ায়ে লোক আমি ভারি পছন্দ করি। দাঁড়াও, এখুনি বাঁশ কেটে আনছি!"

একটু পরেই বংশধারী রবীন আবার সাঁকোর উপরে এসে দাঁড়ালেন। সেইখানেই যষ্টিযুদ্ধ শুরু হ'ল।

দানবের বুঝতে বেশিক্ষণ লাগল না যে, রবীন হচ্ছেন পাকা খেলোয়াড় ; কারণ, দুম্‌ ক'রে লাঠির এক ঘা এসে পড়ল তার কাঁধের উপরে। চ'টেম'টে সে ষাঁড়ের মতন গাঁক্‌ ক'রে চেঁচিয়ে উঠল। এবং সরু সাঁকোর উপরে এত-বেশি পাঁয়তারা কষতে লাগল যে, প্রতি মুহূর্তেই মনে হ'তে লাগল, এই বুঝি সে ঝপাং ক'রে নদীর জলে ঝাঁপ খায়।

দানব হাঁক্‌লে, "শাবাশ! কিন্তু এই তো সবে শুরু! হুঁশিয়ার! মাথা সাম্‌লাও!"

রবীনের মাথা ঘেঁষে বোঁ ক'রে দানবের লাঠি চ'লে গেল! তিনিও মারলেন লাঠি, কিন্তু দানব নিজের লাঠি আড়্‌ ক'রে ধ'রে তাঁর আঘাত ঠেকিয়ে দিলে। পরমুহূর্তেই দানব প্রচণ্ড লাঠি চালিয়ে তাঁর পা ভেঙে দিয়েছিল আর কি! কিন্তু রবীন লাফ মেরে সে আঘাত এড়িয়ে গেলেন। দুজনেরই তখন হাঁপ ধরেছে।

রবীন বললেন, "ব্যাস্‌, যথেষ্ট হয়েছে—এইবারে শান্তি।"

দানব হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "আমারও তাই ইচ্ছে! এইবারে হাত-পা ছড়িয়ে ভালো ক'রে হাঁপ ছাড়া দরকার! কিন্তু আগে আমিই সাঁকো পার হব!"

রবীন মাথা নেড়ে বললেন, "আরে রামঃ! তাও কি হয় দাদা?"

—"তাহ'লে এস ভায়া, আবার খেলা শুরু হোক্‌!"

আবার শুরু হ'ল লাঠালাঠি। প্রথমেই রবীনের লাঠি পড়ল গিয়ে দানবের টাকের উপরে, ঠকাং ক'রে! অন্য কারুর কমজোরী টাক হ'লে তখনি ফটাং ক'রে ফেটে চুরমার হয়ে যেত।

আবার রাগে অজ্ঞান হয়ে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দানব বললে, "অ্যাঁ! টাকে লাঠি? ছাখ্‌ তবে মজাটা!"

তার লাঠি পড়ল গিয়ে রবীনের পায়ের উপরে এবং টাল্‌ সামলাতে না পেরে তিনিও ঝুপ্‌ ক'রে ঝাঁপ খেলেন নদীর জলে!

একগাল হেসে দানব বললে, "এই আমি প্রথমেই নদী পার হলুম! কিন্তু, তুমি কোথায় হে?"
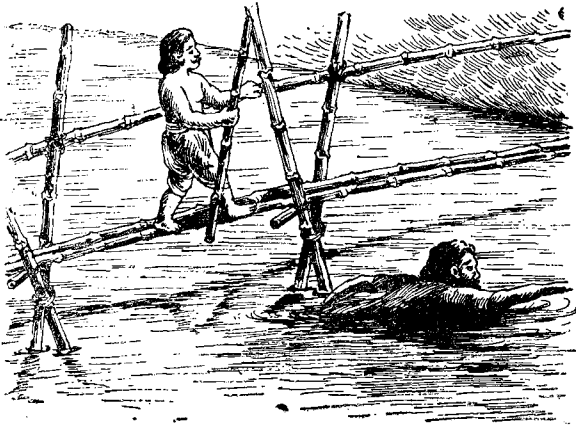
—"আমিও তোমার সঙ্গেই নদী পার হয়েছি, তবে হেঁটে নয়, সাঁৎরে।" নদীর ও-পারে দাঁড়িয়ে রবীন হাসতে হাসতে বললেন।

দানব বললে, "বহুৎ আচ্ছা। তোমার সঙ্গে লড়াই ক'রেও সুখ।"

রবীন বললেন, "দানব, আমিও তোমার মতন খেলোয়াড় দেখিনি। বাহাদুর।"

দানব বললে, "আমার নাম, দানব নয়। লোকে আমাকে ক্ষুদে জনার্দন ব'লে ডাকে।"

—"তুমি ক্ষুদেই বটে। থাকা হয় কোথায়?

—"এতদিন থাকতুম রঘুনাথপুরেই। কিন্তু রাঘব রায়ের অত্যাচারে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি।"

—"তোমার অবস্থা দেখছি আমারই মত। কোথায় যাবে ঠিক করেছ?"

—"আপাতত রবি-ডাকাতের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

—"কেন?"

—"আমি তার দলে নাম লেখাব।"

—"বেশ, তবে আমার হাতে হাত দাও।"

—ক্ষুদে জনার্দন চম্‌কে বললে, "তার মানে?"

—"তার মানে, আমিই হচ্ছি রবি-ডাকাত।"

—"বল কি হে?"

—"হ্যাঁ গো ছোট্ট মানুষটি! রাজি আছ?"

—"রাজি। কিন্তু আমার রসদ জোগাতে পারবে তো? রোজ আমি একটা পাঁঠা, আড়াই সের চালের ভাত, এক সের আটার রুটি, দু-বেলায় পাঁচ সের দুধ আর এক সের গাওয়া ঘী খাই! তার ওপরে টুকিটাকি জলখাবার তো আছেই!"

বিস্ফারিত-চোখে রবীন বললেন, "বল কি হে ক্ষুদে জনার্দন? তবে কি কেবল তোমার পেট ভরাবার জন্যেই আমাদের দিন রাত শিকার আর ডাকাতি করতে হবে?"

ক্ষুদে জনার্দন হেসে ফেলে বললে, "ভয় পেও না রবি, ভয় পেও না! আচ্ছা, নিজের খোরাক আমি নিজেই জোগাড় ক'রে নেব। আজ থেকে আমি তোমারই। আমাকে বিশ্বাস করবে তো?"

—"সেটা দুদিনেই বোঝা যাবে! রাঘব রায় শীঘ্রই আমাদের আক্রমণ করতে আসবে, তখন দেখব তুমি কেমন বাহাদুর!"

—"রবি, আমি খালি লাঠি খেল্‌তেই জানি না, ধনুক টানতেও আমি তোমার চেয়ে কম-মজ্‌বুৎ নই!···কিন্তু ভায়া, খুব দূর থেকে মাংস-রাঁধার গন্ধ ভেসে আসছে না? আহা, কি ভুর্‌ভুরে গন্ধ!" ক্ষুদে জনার্দন শূন্যে নাক তুলে গন্ধ শুঁকতে লাগল সশব্দে,—নিঃশ্বাস টেনে-টেনে!

রবীন হেসে বললেন, "আশ্চর্য তোমার ঘ্রাণশক্তি! আমাদের আড্ডা এখান থেকে প্রায় দু-পোয়া পথ—মাংস রাঁধা হচ্ছে সেইখানেই!"

ক্ষুদে জনার্দন বললে, "তাহ'লে আর দেরি কোরো না রবি, আমাকে তাড়াতাড়ি তোমাদের আড্ডায় নিয়ে চল!"

এইভাবে দিন দিন নতুন নতুন লোক এসে রবীনের দলে যোগ দিতে লাগল। দেশে ধনীদের অত্যাচার যত বাড়ে, রবীনের দল ততই ভারি

হয়ে ওঠে। এবং রবীনও সুবিধা পেলেই বন থেকে বেরিয়ে অত্যাচারীদের উপরে হানা দেন। কিন্তু ডাকাতির টাকা তিনি নিজের জন্যে জমিয়ে রাখতেন না, যত সব অত্যাচারিত দীন-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

মোহান্ত রামগিরি আর জমিদার রাঘব রায় দেখলে, ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে, অবিলম্বে রবি-ডাকাতকে বন্দী বা হত্যা করতে না পারলে দেশ থেকে তাদের প্রভুত্ব একেবারেই লুপ্ত হয়ে যাবে!

তারা তখন দলবল নিয়ে প্রস্তুত হ'তে লাগল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছুটন্ত তরবারি ও অদৃশ্য চক্ষু

মোহান্ত রামগিরি অনেক ভেবে-চিন্তে বললেন, "রাঘব, আর দেরি করা ভালো নয়। তুমি আজ্‌কেই পঞ্চাশজন সেপাই নিয়ে গিয়ে রবি-ডাকাতের দর্পচূর্ণ ক'রে এস।"

রাঘব রায় বললে, "যে আজ্ঞে প্রভু!"

কিন্তু দেশের সর্বত্রই ছিল রবীনের চর। শত শত গরীব, রবীনের কাছ থেকে পায় নানা-রকম সাহায্য। সুতরাং, তাঁর কাছে গিয়ে রাঘব রায়ের খবর পৌঁছলো—রাঘব রায় আসবার ঢের আগেই।

সুন্দরবনের এ-অঞ্চলের সমস্ত পথ-ঘাট ছিল রবীনের নখদর্পণে। তিনি স্থির করলেন, এবারে রাঘবকে এমন মজার ফাঁদে ফেলবেন, জীবনে সে যা কখনো ভুলতে পারবে না!

তাঁর দলে তখন ত্রিশজন লোক ভর্তি হয়েছে। সকলকে নিয়ে তিনি এক জায়গায় গিয়ে বললেন, "দেখ, বনের ভেতরে আসবার পথ এই একটি ছাড়া আর নেই। সুন্দরলাল, পথের ওপরে তুমি একখানা তরোয়াল রেখে দাও। তারপর এস, আমরা লুকিয়ে পড়ি।"

ওদিকে অশ্বারোহী রাঘব রায়ের সঙ্গে পঞ্চাশজন সেপাই বনের ভিতরে

প্রবেশ করলে। সেপাইদের পরোনে সাঁজোয়া-পোশাক, রাঘব রায়েরও মাথায় শিরস্ত্রাণ, দেহে বর্ম। সবাই যেন রীতিমত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

গহন বন। চারিধারে সুঁদরী গাছের ভিড়, উপরে জড়ানো লতা-পাতা, নিচে দুইপাশে অন্ধকার ঝোপঝাপ, জঙ্গল।

আগে-আগে আসছে রাঘব। হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে সে বললে, "পথের ওপরে ওটা কি চক্‌চক্ করছে, ছাখ্ তো রে।"

একজন সেপাই এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে দেখে বললে, "হুজুর, এক-খানা তরোয়াল!"

—"ওখানা তুলে আন্ তো।"

সেপাই যত হাত বাড়ালে, অমনি বনের কোথা থেকে কথা শোনা গেল, "তরোয়াল নিও না। মরা লোক তরোয়াল নিয়ে কি করবে?"

সেপাই আঁৎকে উঠে পিছিয়ে গেল—তরোয়ালখানা যেন জ্যান্তো কেউটে!

রাঘব চিৎকার ক'রে বললে, "শীগ্‌গির নিয়ে আয় তরোয়ালখানা। আরে মোলো, গলার আওয়াজ শুনে তুই ভয় পাস্?"

সেপাই আবার হেঁট হয়ে হাত বাড়ালে—আবার কে বললে, "ও তরোয়াল ছুঁয়েছ কি মরেছ—ছুঁয়েছ কি মরেছ!"

সেপাই কাঁপতে কাঁপতে বললে, "হুজুর, আমি পারব না! ও ভুতুড়ে তরোয়াল!"

রাঘব বললে, "ভীতু গাধা! ধর্ আমার ঘোড়াটাকে! আমি নিজেই নেমে ওখানা তুলে আনছি ছাখ্!" ঘোড়া থেকে নামবার জন্যে রাঘব যেমন একখানা পা তুললে, অমনি কোথা থেকে একটা তীর এত জোরে তার শিরস্ত্রাণের উপরে এসে লাগল যে, সে একেবারে ঠিকরে ধপাস্ ক'রে মাটির উপরে লম্বা হয়ে পড়ল।

ঠিক সেই সময়ে তরোয়ালখানা আচম্বিতে জীবন্ত হয়ে সাঁৎ ক'রে একটা ঝোপের ভিতরে ঢুকে মিলিয়ে গেল। সেপাইরা হাউ-মাউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি পালাতে শুরু করলে।

চট্‌পট্‌ উঠে দাঁড়িয়ে রাঘব চেঁচিয়ে বললে, "এ-সব হাতের চালাকি, হাতের চালাকি! ওরে গাড়োলের দল, ফিরে আয়! তরোয়ালে নিশ্চয় সুতো বাঁধা ছিল! ঐ ঝোপে, ঐ ঝোপে! ঐখানে কেউ লুকিয়ে আছে!"

জন দশ-বারো সেপাই নিয়ে রাঘব ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল—কিন্তু কেউ সেখানে নেই। তারা তরোয়াল বার ক'রে এ-ঝোপে ও-ঝোপে আঘাত করতে লাগল।

সেখানে আলো খুব কম। হঠাৎ কোথা থেকে বিকট স্বরে জাগল এক অট্টহাসি—হা হা হা! হা হা হা হা হা!

কে হাসছে, কোথায় হাসছে, কিছু বোঝা গেল না।

এমন বিশ্রী সেই হাসি যে, রাঘবও মনে মনে 'দুর্গা দুর্গা' না ব'লে থাকতে পারলে না।

একজন সেপাই কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, "ভূত, ভূত! ভূতে হাসছে!"

রাঘব বললে, "ভূতের নিকুচি করেছে! এ-সব সেই রবি-ডাকাতের চালাকি! ব্যাটাকে একবার যদি ধরতে পারি!

সকলে পায়ে পায়ে এগিয়ে আরো-ঘন বনে গিয়ে ঢুকল—দিনের বেলাতেই সেখানে যেন ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যার ছায়া।

হঠাৎ একটা গাছের উপর থেকে একটা ফাঁশ্‌কল নেমে এসে একজন সেপাইয়ের গলার উপরে পড়ল এবং পর-মুহূর্তেই দেখা গেল, তার দেহ ঝুলছে গাছের টঙে!

অন্যান্য সেপাইরা ভয়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাঘব ঘোড়ায় চ'ড়ে এগিয়ে গিয়ে তরোয়াল দিয়ে দড়ি কেটে দিলে, ঝুলন্ত দেহটা মাটির উপরে প'ড়ে আধ-মরার মত হয়ে রইল।

রাঘব হাঁক্‌লে, "শীগ্‌গির তোরা ঐ গাছের উপরে ওঠ্‌! ছাখ্‌—ওখানে কে আছে?"

কিন্তু সেখানেও কারুকে পাওয়া গেল না।

খুঁজতে-খুঁজতে সবাই এক নদীর ধারে গিয়ে পড়ল। ছোট নদী,

কিন্তু খুব গভীর, প্রখর স্রোত। নদীর উপরে রয়েছে দুটো বড় বড় গাছের গুঁড়ি। তাদের মাঝখানে আড়াআড়ি বাঁশের পর বাঁশ বেঁধে আনাগোনার সুবিধা ক'রে দেওয়া হয়েছে।

রাঘব দলবল নিয়ে সাঁকোর উপরে গিয়ে উঠল। তারা যখন মাঝ-বরাবর এসেছে, হঠাৎ আড়াল থেকে কে চ্যাচালে—"হেঁইও জোয়ান! মারো দড়িতে টান।"

অমনি গাছের গুঁড়ি দুটো স'রে গেল দুইদিকে, বাঁশগুলোর সঙ্গে-সঙ্গে রাঘব ও তার দলের আর-সবাই ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে জলে প'ড়ে ডুবে গেল এবং তারপর ভেসে উঠল।

রাঘবের ঘোড়া প্রভুকে নিয়ে তীরে উঠল তাই, নইলে এ-যাত্রা আর তার রক্ষা ছিল না। কারণ, সাঁতার জানত না সে। একজন সেপাই জলের টানে কোথায় ভেসে গেল, বাকি সবাই হাবুডুবু খেতে খেতে কোন-রকমে ডাঙ্গায় এসে উঠে পড়ল।

এমন সময় দেখা গেল নদীর ওপারে রবীনকে, তার ডানপাশে ক্ষুদে জনার্দ। ও বাঁ-পাশে সুন্দরলাল। হাসতে হাসতে তারা যেন গড়িয়ে পড়ছে!

রাঘব চিৎকার ক'রে উঠল, "ঐ সেই শয়তান, ঐ সেই শয়তান! হাতে নে ধনুক, ছোঁড়্ বাণ!"

রবীন বললেন, "ওরে হতভাগা রাঘব-বোয়াল! কেউ ধনুকে হাত দিলেই প্রাণে মারা পড়বি! তোদের চারিদিকের জঙ্গলে আমার লোকেরা ধনুকে বাণ জুড়ে অপেক্ষা করছে!...এখন শোন্ আমার কথা। জ্যান্তো অবস্থায় এই বন থেকে বেরুতে চাস্ তো, তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যা।"

রাঘব দাঁত খিঁচিয়ে বললে, "কী! ফিরে যাব? কখনো নয়! আগে তোকে ধ'রে শূলে চড়াই, তারপর ফিরে যাবার কথা!"

রবীন বললেন, "বটে? ফিরে যাবি না? বেশ! সন্ধ্যার পরেও যদি তোদের এই বনের ভেতর দেখি, তাহ'লে আর আমি কারুর ওপরে দয়া করব না।"

রাঘব বললে, "বাণ ছোঁড়্, বাণ ছোঁড়্। কুকুর তিনটেকে মেরে ফ্যাল্।"

কিন্তু ধনুকে বাণ জোড়বার আগেই তিন মূর্তি আবার জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হ'ল। তাদের পিছনে যাবারও উপায় নেই, কারণ মাঝে রয়েছে খরস্রোতা নদী।

চারিদিক নির্জন। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। যদিও রাঘব বেশ অনুভব করতে পারলে যে, দিকেদিকে অদৃশ্য সব চক্ষু তাদের সকলের উপরে দিচ্ছে সতর্ক পাহারা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অরণ্যের বিভীষিকা

ব্যাপার-স্যাপার দেখে ছু-জন সেঁপাই জঙ্গল ছেড়ে লম্বা দিলে। একজন সেপাই জলে ভেসে গিয়েছে। বাকি সাতচল্লিশ জনকে নিয়ে রাঘব এক জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিলে।

শীতকালের কুয়াশাময় সন্ধ্যা। সূর্য ডুবতে-না-ডুবতেই বনের ভিতরটা অন্ধকারের চাদরে মুড়ে দিলে। মাথার উপরে শোনা গেল প্যাঁচাদের চিৎকার, বাদুড়দের ডানা-ঝট্‌পট্,—দূর থেকে জেগে উঠল বাঘেদের গর্জন।

অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে, শীত ক্রমেই বেড়ে উঠছে। বনে পাতায় পাতায় কাঁদুনি তুলে শীতার্ত বাতাস ফেলছে কন্‌কনে দীর্ঘশ্বাস। সেপাইরা কাঁপতে কাঁপতে শুক্‌নো ডাল-পাতা-ঘাস কুড়িয়ে এনে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বাললে।

জনকয় লোককে পাহারায় নিযুক্ত ক'রে রাঘব বললে, "ডাকাত ব্যাটাদের আর কোন সাড়া নেই, ব্যাটারা আমাদের ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। আমরা কিন্তু তাদের না ধ'রে ছাড়ব না।"

যাঁহাতক্ এই কথা বলা, অমনি খুব কাছ থেকেই স্তব্ধতার ঘুম ভাঙিয়ে ব্যঙ্গ-হাসি জাগল—"হা হা হা হা হা! হি হি হি হি হি!"

সেপাইদের বুকের ভিতরে শীতের কাঁপুনির চেয়ে ভয়ের কাঁপুনি বেড়ে উঠল। যারা পাহারা দিচ্ছিল, তারা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একজন বললে, "সোঁদরবনের ভূতরা সবাই জেগে উঠেছে!"

আর-একজন বললে, "বাঘরা যাদের ঘাড় ভেঙেছে, এ হাসি তাদেরই! ঐ শোনো!"

চারিদিকে, দূরে কাছে কারা সব কাঁদছে—কেউ ফুঁপিয়ে, কেউ চেঁচিয়ে। সেপাইদের যারা শুয়েছিল তারা ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। তার-পরেই আবার হো হো হা হা অট্টহাস্য!

একজন সেপাই বললে, "প্রাণ নিয়ে যদি ফিরতে পারি, মা-কালীকে জোড়া পাঁঠা দেব!"

রাঘব বললে, "থাম্ পাজী, থাম্! এ-সবই ডাকাতদের চালাকি!"

মুখে এই কথা বললে বটে, কিন্তু তারও গলার আওয়াজ কাঁপছিল।

আরো ঘণ্টাদুই কাটল। কিন্তু আর হাসি-কান্নার শব্দ শোনা গেল না।

রাঘব কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছে, এমন সময়ে এক প্রহরী এসে বললে, "হুজুর, দাঁড়িয়ে উঠে দেখুন, খুব দূরে বড় একটা আগুন জ্বলছে!"

রাঘব দেখে, খানিকক্ষণ ভেবে বললে, ঠিক হয়েছে! ব্যাটাদের এই-বারে হাতের মুঠোয় পেয়েছি! নিশ্চয় ওখানেই আছে ডাকাতদের আড্ডা! ওরা এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। এই হচ্ছে আমার সুযোগ!"

তখন সেপাইদের জাগানো হ'ল। তারা হাতিয়ার নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

রাঘব বললে, "সবাইকে আমার সঙ্গে আসতে হবে না, তাহ'লে গোলমাল হ'তে পারে। কেবল জন-পঁচিশ বাছা বাছা লোক পা টিপে টিপে এগিয়ে চলুক, বাকি সবাই এখানে থাক্।"

পঁচিশজন লোক নিয়ে রাঘব খুব সাবধানে অগ্রসর হ'ল। খানিক দূর থেকে উঁকি মেরে দেখে বোঝা গেল, একটা অগ্নিকুণ্ডকে চক্রাকারে

ঘিরে অনেকগুলো মূর্তি কাপড়-মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে। মূর্তিগুলোকে আগুনের ম্লান আভায় ভালো ক'রে দেখা যায় না; কিন্তু সেগুলো যে মানুষের মূর্তি, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই!

সেপাইরা যখন আগুনের কাছ থেকে হাত-পঞ্চাশ তফাতে এসে পড়েছে, রাঘব তখন হুকুম দিলে, "এইবার দৌড়ে গিয়ে ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ো! "সবাইকে কুচি কুচি ক'রে কেটে ফ্যালো।"

জঙ্গল ভেদ ক'রে সেপাইরা তীরবেগে ছুটতে আরম্ভ করলে এবং তার পরেই সবাই হুড়মুড়্ ক'রে হ'ল পপাত ধরণীতলে। অন্ধকারে কেউ দেখতে পায় নি যে, রবীন সেখানে ঝোপের ভিতরে হাঁটু-সমান-উঁচু ক'রে বেঁধে রেখেছিলেন খুব-লম্বা এক কাছি! রাঘবের লোকেরা পরস্পরের ঘাড়ের উপরে গিয়ে পড়ল, পরস্পরকে গালাগালি দিতে ও পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করতে লাগল, কারণ, অন্ধকারে অন্ধ হ'য়ে তারা ধ'রে নিলে যে, রবি-ডাকাতের দলই তাদের আক্রমণ করছে!

তারপর সত্যসত্যই রবীন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সেপাইদের ঘাড়ের উপরে দুইদিক থেকে লাফিয়ে পড়লেন—প্রত্যেকেরই এক-গাছা মোটা লাঠি!

রবীনের হাতে বেদম মার খেয়ে রাঘব প্রায় বেহুঁস হয়ে পড়ল। যখন ভালো ক'রে সব বুঝতে পারলে তখন দেখলে, তার ও সেপাইদের হাত-পা শক্ত ক'রে বাঁধা।

রবীন বললেন, "ক্ষুদে জনার্দন, সুন্দরলাল, রামু! এ হতভাগারা কেউ যদি টুঁ শব্দ ক'রে, তাহ'লে তোমরা ডাণ্ডা চালাতে কসুর কোরো না! আর সবাই আমার সঙ্গে এস, বাকি সেপাইগুলোকে শিক্ষা দিতে হবে।"

বাকি বাইশজন সেপাইও অতর্কিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, রবীনের দল তাদের উপরে গিয়ে পড়ল বিনা-মেঘে বজ্রের মত! তারাও হ'ল বন্দী।

রবীন বললেন, "এদের সাঁজোয়া পোশাক আর অস্ত্রশস্ত্রগুলো কেড়ে

নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের পাশে জমা ক'রে রাখো! কি রাঘব, ওদিকে অমন ক'রে তাকিয়ে আছ কেন? ভাবছ, আমাদের দলের অনেকে এখনো আগুন পোয়াতে-পোয়াতে আরামে ঘুমোচ্ছে? মোটেই নয়, মোটেই নয়! ওগুলো মানুষ নয়, কাপড়-জড়ানো খড়ের আঁটি! তুমি এসেছিলে এদেরই আক্রমণ করতে!"

রাঘব দাঁত কিড়্‌মিড়্‌ ক'রে বললে, "বুনো শেয়াল, গর্তের ছুঁচো, হতভাগা জোচ্চোর!"

রবীন বললেন, "চুপ ক'রে থাক্! ফের যদি কথা কইবি, গাছে তুলে তোকে ফাঁসিতে লট্‌কে দেব!…হ্যাঁ, ভালো কথা! সুন্দরলাল, রাঘব আর সেপাইদের পোশাকগুলোও খুলে নাও! সবাইকে পরিয়ে দাও খালি একটা ক'রে নেংটি। কন্‌কনে শীতে ওদের ভারি আরাম হবে!"

সেপাইরা বাধা দেবার চেষ্টা করলে না, বাধা দেবার শক্তিও তাদের ছিল না। নেংটি প'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা হি হি ক'রে কাঁপতে লাগল—তাদের হাতগুলো পিছমোড়া ক'রে বাঁধা!

রাঘবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রবীন বললে, "গরিবের যম রাঘব রায়! এখন তোমার কেমন লাগছে? কথা কইছ না যে বড়? জানি, তুমি যদি আমাদের আজ ধরতে পারতে, তাহ'লে আমাদের প্রত্যেকেরই হ'ত শূলদণ্ড! কিন্তু আমি তোমাদের প্রাণভিক্ষা দিলুম, আর কোন ক্ষতি করলুম না! এখন বেরোও এই বন থেকে—সুন্দরবনে অসুন্দর কুৎসিতের ঠাঁই নেই! রামগিরির কাছে জানাও-গে যাও, রবি-ডাকাত তোমাদের কি-রকম অভ্যর্থনা করেছিল!"

আগে আগে পালের গোদা জমিদার রাঘব রায়, পিছনে পিছনে সাতচল্লিশ জন সেপাই—সকলেরই হাত বাঁধা, পরোনে নেংটি, পায়ে জুতো নেই! চলল তারা গুটি গুটি!

সেখান থেকে পুষ্পপুর পনেরো ক্রোশ! শীতে কাঁপতে কাঁপতে, হিমে ভিজতে ভিজতে, দুরু দুরু প্রাণে বাঘের গাঁ গাঁ শুনতে শুনতে কালো রাত পুইয়ে গেল—তখনো তারা চলেছে, চলেছে, আর চলেছে।

যে গাঁয়ের ভিতর দিয়ে তারা যায়, আবাল-বৃদ্ধবনিতা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে। রঘুনাথপুরের বাঘা-জমিদার, হোম্‌রা-চোম্‌রা রাজার সেপাই,—এ কী হাল এদের!

দেশে দেশে এই অদ্ভুত কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল—চারিদিকেই এক গল্প! কোথাও আর রাঘব রায়ের মুখ দেখাবার উপায় রইল না!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বামী ভোজানন্দ

একদিন রবীন, ক্ষুদে জনার্দন ও সুন্দরলাল বেড়াতে বেড়াতে বনের বাইরে গিয়ে হাজির। তারপরেই দেখা গেল, ছোট্ট এক নদীর ধারে ব'সে মাছ ধরছে ভীষণ হৃষ্টপুষ্ট একটি লোক। এমন মোটা মানুষ দুনিয়ায় বোধহয় দুটি নেই—তাকে অনায়াসেই নরহস্তী বলা চলে।

তার পাশে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা গাম্‌লা এবং তার ভিতরে রয়েছে একরাশ বড়া—যা দশজন লোকে মিলে খেয়ে সাবাড় করতে পারে না। লোকটির পরোনে সন্ন্যাসীর পোশাক। একমনে বাঁ-হাতে ছিপ্ ধ'রে সে ডানহাত বাড়িয়ে এক একখানা বড়া নিয়ে মুখের ভিতরে ফেলে দিচ্ছে।

রবীন বললেন, "মৎস্য-শিকারী সন্ন্যাসী! আশ্চর্য! একেই বলে কলিকাল! ওহে, তোমরা এই ঝোপে গা-ঢাকা দাও, লোকটাকে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখে আসি।"

রবীন পায়ে পায়ে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বললেন, "তোমার নাম কি হে?"

সন্ন্যাসী ছিপ থেকে চোখ না তুলেই বললে, "স্বামী ভোজানন্দ।"

—"সন্ন্যাসী হয়ে তুমি মাছ ধরছ?"

—"খালি মাছ ধরছি না, মাংসের বড়াও খাচ্ছি।"

—"চমৎকার!"

—"এক সময়ে সন্ন্যাস নিয়ে আমি মঠে বাস করতুম বটে। কিন্তু পালে-পর্বে উপোস ক'রে-ক'রে আমার দেহ হয়ে পড়েছিল নেংটি ইঁদুরের মত। তাই মঠ ছেড়েছি বটে, কিন্তু এই গেরুয়া কাপড়-চোপড়-গুলো ছাড়তে পারি নি—বহুকালের বদ্-অভ্যাস কিনা!"

রবীন হঠাৎ তরোয়াল বার ক'রে তার ডগাটা ভোজানন্দের বুকের কাছে ধ'রে বললেন, "এখন ছিপ ছেড়ে উঠে দাঁড়াও তো বাপু! পাছে আমার পা ভিজে যায়, সেই ভয়ে আমি নদী পার হ'তে পারছি না। আমাকে কাঁধে ক'রে নদীর ওপারে নিয়ে চল!"

তরোয়াল দেখে স্বামী ভোজানন্দ একটুও ভড়্কে গেল না। গম্ভীর স্বরে বললে, "নদীর এপারে রয়েছে আমার মাংসের বড়া। ওপারে আমি যাব কেন?"

—"হয় আমাকে পার ক'রে দাও, নয়—"

—"আচ্ছা বৎস, তাই হবে!" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভোজানন্দ দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর হেঁট হয়ে বললে, "নাও বাপধন, দয়া ক'রে তাড়াতাড়ি পিঠে চড়!"

রবীন তার পিঠে চড়লেন, কিন্তু তরোয়ালখানা খাপে পুরলেন না। ভোজানন্দ জলে নামল—নদী গভীর নয়, জল তার বুক পর্যন্ত উঠল মাত্র।

ম্রিয়মাণ ভাবে সে বললে, "দিন-কাল-ভারি খারাপ। শান্তিতে ব'সে দুখানা মাংসের বড়া খাবারও যো নেই। কোন্ পাজীর পা ভিজে যাবে, সেইজন্যে তাকে আবার কাঁধে তুলে নদী পার ক'রে দিতে হবে!"

রবীন কিছু বললেন না, খালি হাসতে লাগলেন।

ভোজানন্দ ওপারে গিয়ে উঠল। রবীন তার পিঠ ছেড়ে নেমে পড়লেন। হঠাৎ ভোজানন্দ খপ্ ক'রে হাত বাড়িয়ে রবীনের হাত থেকে তরোয়ালখানা কেড়ে নিয়ে বললে, "বৎস, এইবার আমার পালা। হয় আমাকে কাঁধে ক'রে আমার মাংসের বড়ার কাছে নিয়ে চল, নয় খেলে

এই তরোয়ালের খোঁচা !"

ভোজানন্দের মুখ দেখেই রবীন বুঝলেন, 'না' ব'লে কোনই লাভ নেই। তিনি হেঁট হ'লেন, ভোজানন্দ এক লাফে তার পিঠে চ'ড়ে বসল—সেই নরহস্তীর বিপুল বপু ওজনে বোধহয় পাঁচমণের কম নয় !

ভোজানন্দ বললে, "আমাকে খাবারের কাছে নিয়ে চল, তাড়াতাড়ি খাবারের কাছে নিয়ে চল !"

ওদিকে ঝোপের ভিতর থেকে সর্দারের অবস্থা দেখে ক্ষুদে জনার্দন আর সুন্দরলাল হেসে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল !

এপারে এসে ভোজানন্দের জ্যান্তো পাহাড়ের মতন দেহ যখন পিঠ ছেড়ে নিচে নামল, রবীন ধাঁ ক'রে তার ভুঁড়িতে বসিয়ে দিলেন দশমণ ওজনের এক লাথি। ভোজানন্দের বিশাল ভুঁড়ি কোনরকমে সে চোট্ সামলে নিলে বটে, কিন্তু হাতের তরোয়াল মাটিতে ফেলে সে হা হা ক'রে হাঁপাতে লাগল, ঠিক যেন হাপরের মত !

তরোয়ালখানা কুড়িয়ে নিয়ে রবীন বললেন, "এখন খাবারের কথা ভুলে যাও ভোজানন্দ বাবাজী ! শীগ্‌গির আমাকে ওপারে নিয়ে চল, নইলে তোমার কান নেব কেটে !"

ভোজানন্দের মুখে আনন্দের কোন লক্ষণই প্রকাশ পেলে না ! বিনাবাক্যব্যয়ে রবীনকে কাঁধে নিয়ে আবার সে নদীতে নামল। তারপর নদীর ঠিক মাঝখানে গিয়ে হঠাৎ হেঁট হয়ে এমন এক ঝাঁকানি মারলে যে রবীন ডিগ্‌বাজি খেয়ে ঝপাং ক'রে জলের ভিতরে গিয়ে পড়লেন !

ভোজানন্দ বললে, "যা নচ্ছার, যা ! হয় ডুবে মর্, নয় সাঁৎরে তীরে ওঠ্ ! আমি মাংসের বড়া খেতে চললুম।"

রবীন ডাঙ্গায় উঠে দেখলেন, ভোজানন্দ দুই পা ছড়িয়ে ব'সে কোলের উপরে বড়ার গামলা টেনে নিয়েছে।

ভোজানন্দ বললে, "দূর হ দুরাত্মা, দূর হ ! আমাকে শান্তিতে বড়া খেতে দে। নইলে এই গামলা ভাঙব তোরই মাথায় !"

রবীন খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠে বললেন, "স্বামী ভোজানন্দ, আর

ঝগড়া নয়—তোমার সঙ্গে আমি ভাব করতে চাই।"

—"তোমার নাম কি বাপু?"

—"রবীন চৌধুরী—লোকে ডাকে, রবি-ডাকাত ব'লে।"

এক লাফে ভোজানন্দ দাঁড়িয়ে উঠল। হাতি যে এমন চট্‌পট্‌ লাফ মারতে পারে, রবীনের সে ধারণা ছিল না।

ভোজানন্দ বিপুল বিস্ময়ে বললে, "কী! তুমিই রাঘব রায়কে নেংটি পরিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলে? তোমারই পিঠে চড়েছি আমি?"

রবীন বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু ভুলে যেও না বাবাজী, আমিও তোমার পিঠে চড়েছি! এখন তোমার মত কি? আমার সঙ্গে যেতে চাও?"

—"কোথায়, তোমাদের আড্ডায়? নারাজ নই, কিন্তু সেখানে আমার খ্যাঁট্‌ জুট্‌বে কি? রোজ আমার দশ সের ক'রে মাংস চাই।"

—"হে আদর্শ স্বামীজি, তোমাকে আমি রোজ একটা ক'রে হাতি মেরে খাওয়াব। তোমার মতন রত্নকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। তোমার খোরাক জোগাবার জন্যে আমরা সবাই উপোস করতেও রাজি।"

—"আচ্ছা, আমিও রাজি।"

—"ওহে ক্ষুদে জনার্দন, ওহে সুন্দরলাল! ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে দেখ, আমাদের দলে ভর্তি হ'ল এক সাধু-ডাকাত।"

তারা দু'জনে বেরিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। ক্ষুদে জনার্দনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে ভোজানন্দ বললে, "রবি, এই খোকা-তাল-গাছটিকে কোথেকে জোগাড় করলে হে? এ খোকাকে দুধ খাওয়াবার মতন ঝিনুক তোমাদের আড্ডায় আছে তো?"

ক্ষুদে জনার্দন খাপ্পা হয়ে বললে, "কি বলব নরহস্তী, তুমি নাকি সন্ন্যাসী, নইলে এই লাঠির বাড়ি মেরে তোমাকে শায়েস্তা করতুম।"

—"তাই নাকি খোকাবাবু, তাই নাকি? লাঠি খেলার কায়দা আমারও কিছু কিছু জানা আছে, পরীক্ষা করতে চাও?"

রবীন বললেন, "এখানে নয়, এখানে নয়, আড্ডায় ফিরে সে-পরীক্ষা হবে-অখন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তিনকড়ি সামন্তের কাণ্ড

রামু গিয়েছিল লুকিয়ে লুকিয়ে ময়নাপুরে, তার বাপের সঙ্গে দেখা করতে।

সুন্দরবনে ফিরে এলে-পর রবীন তাকে শুধোলেন, "রামু, বাইরের কোন নতুন খবর আছে?"

রামু বললে, "কর্তা, শুনলুম, পুষ্পপুরে মস্ত এক মেলা বসেছে। আজ তিনদিন ধ'রে মেলা চলছে। কুস্তি, লাঠি, ছোরা, তরোয়াল-খেলা হয়ে গেছে! কাল ধনুক-বাণ নিয়ে লক্ষ্যভেদের পালা। সব-চেয়ে-বড় তীরন্দাজকে একটি রূপোর তূণ উপহার দেওয়া হবে। বিচার করবেন কুমার রুদ্রনারায়ণ নিজে।"

রবীনের আগ্রহ জেগে উঠল তৎক্ষণাৎ। তিনি বললেন, "উপহারের কথা শুনে লোভ হচ্ছে। কিন্তু শুনেছি, নগরপাল অনন্তরামের লোক চন্দ্রলাল খুব ভালো তীরন্দাজ। নিশ্চয় সেও মেলায় থাকবে?"

রামু বললে, "লোকে বলছে, এবারে নাকি চন্দ্রলালেরও চেয়ে ভাল তীরন্দাজ বাহাদুরি দেখাতে আসবে!"

"কে সে?"

—"তার নাম গোবিন্দ, সে খোদ কুমার রুদ্রনারায়ণের লোক। লোকে বলাবলি করছে, তীর ছুঁড়ে সে নাকি মেঘ বিঁধ্তেও পারে!"

স্বামী ভোজানন্দ বললে, "সিদ্ধি খেলে আমারও মনে হয়, বাণ ছুঁড়ে আমি আকাশের চাঁদকেও ছ্যাঁদা ক'রে দিতে পারি!"

সকলে হেসে উঠল!

রবীন কিন্তু গম্ভীর। ভাবতে ভাবতে তিনি বললেন, "এই তীর-

ছোঁড়া পাল্লায় আমারও যোগ দিতে সাধ হচ্ছে। কুমার রুদ্রনারায়ণ যদি নিজের হাতে আমাকে রূপোর তূণ দিতে বাধ্য হন, তাহ'লে সেটা বড় যে-সে কথা হবে না!"

ক্ষুদে জনার্দন বললে, "কিন্তু কুমার রুদ্রনারায়ণই বলেছেন, তোমাকে ধরতে পারলে তিনি পঞ্চাশ মোহর বখশিস্ দেবেন, এটাও যেন ভুলে যেও না।"

সুন্দরলাল বললে, "কর্তা, নগরপাল অনন্তরাম যে মোহান্ত রাম-গিরির ভাই, এটাও আপনি জানেন তো?"

রবীন বললেন, "সবই জানি, কিছুই ভুলি নি! তবু ভিড়ের সঙ্গে মিশে মেলাটা দেখতে যেতে দোষ কি? আমাদের ভাঁড়ারে ছদ্মবেশের অভাব তো নেই! কি বল, তোমরাও আমার সঙ্গে যাবে নাকি?"

চারিদিকে আনন্দের ধ্বনি জাগল—"বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা!"

পরদিন সকালে সূর্য ওঠবার আগেই সকলে উঠেপ'ড়ে মহা উৎসাহে আপন-আপন চেহারা বদলাবার চেষ্টায় লেগে গেল। কেউ সাজলে খ্যাংরা-গুঁফো মাড়োয়ারী, কেউ সাজলে গালপাট্টাওয়ালা পাঁড়েচোবে, কেউ সাজলে ঝুঁটি-বাঁধা উড়িয়া, কেউ-বা চাষা; কেউ-বা মজুর! স্বামী ভোজানন্দ চলল, সন্ন্যাসী সাজেই। ক্ষুদে জনার্দন দুখানা নির্ভর-যষ্টি নিয়ে খোঁড়া ভিখারী হয়ে পড়ল।

মেলায় হাজির হয়ে সবাই দেখলে, চারিদিক লোকে লোকারণ্য! রাজ্যের সব শ্রেণীর লোকই সেখানে এসে জড়ো হয়েছে।

একদিকে রূপোর ঝালর ঝোলানো চাঁদোয়ার তলায় সিংহাসনের উপরে গম্ভীর মুখে বিরাজ করছেন রাজভ্রাতা কুমার রুদ্রনারায়ণ। তাঁর দুই পাশে যথাযোগ্য আসনে ব'সে আছেন রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ও সভাসদরা। সেখানে নগরপাল অনন্তরাম, তাঁর দাদা মোহান্ত-মহারাজ রামগিরি ও রাঘব রায়কে দেখা গেল।

তীর-ছোঁড়ার পাল্লা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হঠাৎ একটা ছেঁড়াখোড়া ময়লা কাপড়-জামা-পরা বুড়ো লোক একমাথা সাদাচুল ও

ধনুক-বাণ নিয়ে হন্তদন্তের মত ক্রীড়াক্ষেত্রের দরজার কাছে এসে হাজির হ'ল।

সেখানে ব'সে একজন কেরাণী, প্রতিযোগীদের কথা খাতায় লিখে রাখছিল। সে মুখ তুলে বললে, "কে তুমি বুড়ো? এখানে কি চাও?"

—"তীর-ছোঁড়ার পাল্লায় যোগ দিতে চাই।"

কেরাণী তো হেসেই অস্থির! তারপর বললে, "ঐ বুড়ো-হাতে তুমি ধনুকের ছিলে টানতে পারবে?"

বুড়ো বললে, "পারি কি না পারি, পরখ ক'রেই দেখুন না।"

কেরাণী বললে, "সে আর হয় না। প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে।"

বুড়ো কাঁচুমাচু মুখে মিনতি ক'রে বললে, "মশাই, আমি বুড়োমানুষ; বিশ ক্রোশ পথ ভেঙে আসতে আসতে দেরি হয়ে গেছে! দয়া ক'রে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না!"

হঠাৎ আকাশের দিকে চেয়ে কেরাণীর মাথায় এক খেয়াল জাগল।

সে বললে, "আকাশ দিয়ে ঐ যে চিলটা উড়ে যাচ্ছে, তুমি ওকে তীর মারতে পার ?"

কেরাণীর মুখের কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই বৃদ্ধ ধনুকে তীর লাগিয়ে ছিলা টেনে ছেড়ে দিলে। তীরবিদ্ধ চিলটা ঘুরতে ঘুরতে ক্রীড়াক্ষেত্রের একপাশে ঠিক রুদ্রনারায়ণের সামনে এসে পড়ল।

রুদ্রনারায়ণ সচমকে মুখ তুলে বললেন, "এ কি ব্যাপার! কে চিল-টাকে মারলে ?"

কেরাণী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হাত জোড় ক'রে বললে, "হুজুর, ঐ বুড়ো, উড়ন্ত চিলটাকে মেরেছে! এতক্ষণ পরে এসে, ও তীর-ছোঁড়া পাল্লায় নাম লেখাতে চায়! তবে ওর টিপ আছে বটে।"

রুদ্রনারায়ণ বললেন, "টিপ্ আছে না ছাই আছে! দৈবগতিকে চিলের গায়ে তীর লেগে গেছে! একে তালবুড়ো, তায় ঐ তো হা-ঘরের মতন চেহারা! ও আবার প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে।"

বুড়ো চেঁচিয়ে বললে, "পরীক্ষা করুন হুজুর, দয়া ক'রে পরীক্ষা করুন! এ-রাজ্যের যে-কোন লোকের সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে রাজি। আমি হচ্ছি, মুকুন্দপুরের তিনকড়ি সামন্ত, আমায় চেনে না কে ?"

নগরপাল অনন্তরাম উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "বুড়োটা বেজায় গোল-মাল বাধিয়েছে, ওকে এখান থেকে দূর ক'রে দাও!"

রুদ্রনারায়ণ বললেন, "না, না, ও ভেতরেই আসুক। আর কিছু না হোক্, একটু মজা হবে! ওর ভাঁড়ামি দেখে লোকে হেসে খুন হবে!"

তিনকড়ি সামন্ত ক্রীড়াক্ষেত্রের ভিতরে এসে দাঁড়াল। রুদ্রনারায়ণ ঠিক আন্দাজ করেছেন, তার চেহারা দেখেই সকলে হো হো হাসি শুরু ক'রে দিলে!

তখন শেষ-পরীক্ষার প্রথম পাল্লার সময় উপস্থিত হয়েছে। এতদূর এগিয়ে আসতে পেরেছে ষাট জনের মধ্যে কেবল ছয়জন লোক। বলা বাহুল্য, তাদের মধ্যে আছে নগরপাল মুকুন্দরামের পেটোয়া চন্দ্রলাল ও রুদ্রনারায়ণের পেটোয়া গোবিন্দও।

খানিক তফাতে রয়েছে চাঁদমারি। কালো জমির মাঝখানে সাদা চক্র। আবার সাদা চক্রের মাঝখানে কালো বিন্দু।

ছ'জনের মধ্যে প্রথম দু'জনের তীর সাদা চক্রের বাইরে গিয়ে পড়ল। আর দু'জনের তীর গিয়ে লাগল সাদা চক্রের প্রান্তে।

তারপর বিখ্যাত তীরন্দাজ চন্দ্রলাল সগর্বে পা ফেলে এগিয়ে এল —প্রতি বৎসরে সেই-ই এ-অঞ্চলে প্রথম পুরস্কার লাভ করে। লক্ষ্য স্থির ক'রে সে বাণ ত্যাগ করলে। বাণ, সাদা চক্রের কালো বিন্দুর এক ইঞ্চি পরে গিয়ে লাগল।

তখন রুদ্রনারায়ণের ইঙ্গিতে গোবিন্দ এসে ধনুক ধারণ করলে। তার বাণ গিয়ে লাগল ঠিক কালো বিন্দুর পাশেই। চারিদিকে 'ধন্য ধন্য' রব উঠল।

রুদ্রনারায়ণ ব্যঙ্গহাসি হাসতে হাসতে বললেন, "ওহে মুকুন্দপুরের তিনকড়ি সামন্ত! এইবারে তুমিও কার্দানি দেখাবে নাকি?"

তিনকড়ি প্রণাম ক'রে বললে, "হুকুম পেলেই কার্দানি দেখাই হুজুর! কিন্তু কি বখশিস্ মিলবে?"

রুদ্রনারায়ণ বললেন, "ঐ রূপোর তূণ আর ওর ভেতরে যত ধরে তত মোহর!" তিনি নিশ্চিত রূপেই জানতেন, এ পুরস্কার লাভ করবে তাঁর অনুগত গোবিন্দ ছাড়া আর কেউ নয়।

তিনকড়ি কোনরকম লক্ষ্য না ক'রেই অবহেলা-ভরে ধনুক তুলে বাণ নিক্ষেপ করলে এবং বাণ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার আগেই ফিরে চট্ ক'রে দাঁড়িয়ে বললে, "এ তো ছেলেখেলা!"

পর-মুহূর্তেই চারিদিকে গগনভেদী কোলাহল! তিনকড়ির বাণ বিদ্ধ করেছে ঠিক কালো বিন্দুকেই!

রুদ্রনারায়ণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তিনকড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নগরপাল অনন্তরাম বললে, "বাণটা দৈবাৎ ঠিক জায়গায় লেগেছে!"

মোহান্ত রামগিরি বললেন, তা নয়তো কি! ও বুড়ো কোথাকার

কে, এখানে ওর চালাকি-টালাকি খাটবে না।"

রুদ্রনারায়ণ হাঁকলেন, "এইবার সর্বশেষ পরীক্ষা।"

চাঁদমারি আরো তফাতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। এবারে পাল্লা দেবে খালি তিনজন—চন্দ্রলাল, গোবিন্দ ও তিনকড়ি। বাকি যে চার-জনের বাণ সাদা চক্রের বাইরে বা প্রান্তে গিয়ে পড়েছিল, এবারে তারা আর পরীক্ষা দেবার সুযোগ পেলে না।

এবারেও প্রথম পালা পড়ল চন্দ্রলালের। অনেকক্ষণ টিপ্ ক'রে সে ধনুকে টঙ্কার দিলে বটে, কিন্তু তার বাণ সাদা চক্রের বাইরে গিয়েই লাগল।

অনন্তরাম চিৎকার ক'রে উঠল, "চন্দরের বাণ হাওয়ায় বেঁকে গিয়েছে, ওকে আর-একবার সুযোগ দেওয়া হোক্।"

রুদ্রনারায়ণ বললেন, "একবারের বেশি কেউ তীর ছুঁড়তে পারবে না। গোবিন্দ, এইবারে তোমার পালা।"

গোবিন্দ প্রায় পাঁচ মিনিট ধ'রে লক্ষ্যস্থির ক'রে তীর ছুঁড়লে। তার তীর এবারেও কালো বিন্দুর এক পাশে লাগল।

তিনকড়ি ধনুক তুলে বললে, "হুজুর, আমার ওপরে কি হুকুম? আমি ঐ কালো ফোঁটার মাঝখানেও বাণ মেরে, গোবিন্দ তীরন্দাজের বাণকেও কেটে দুখানা ক'রে দিতে পারি, আবার ওর কাটা বাণটা মাটিতে পড়বার আগেই তাকেও কেটে দুখানা করা আমার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়।"

রুদ্রনারায়ণ গর্জন ক'রে বললেন, "কী! তুই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস্?"

—"ঠাট্টা নয় হুজুর, সত্যিকথা।"

—"কিন্তু যদি না পারিস্ তোর শূলদণ্ড হবে।"

—"দয়াল হুজুর, যা বলেন তাই।"

তিনকড়ি ধনুক তুলে এবারে সাবধানে লক্ষ্যস্থির করলে। তারপর কারুর চোখে পলক পড়তে-না-পড়তেই বিদ্যুতের মতন হাত চালিয়ে আরো দুবার ধনুকের ছিলা টানলে, সশব্দে।

কোথা দিয়ে কী যে হ'ল কেউ লক্ষ্য করবার সময় পেলে না—কেবল দেখা গেল, ঠিক কালো বিন্দুর মাঝখানে তার একটা বাণ বিঁধে রয়েছে এবং গোবিন্দের বাণের অর্ধেকটা আর চাঁদমারির উপরে নেই। পরীক্ষকরা ছুটে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, বাণের কাটা অংশটাও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে মাটির উপরে প'ড়ে রয়েছে!

তারপরেই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সেই বিরাট জন-সমুদ্রের জয়-কোলাহল জেগে উঠল।

কুমার রুদ্রনারায়ণ স্তম্ভিতের মতন ব'সে রইলেন, নিজের চোখকেও তিনি যেন আর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তারপর হঠাৎ চিৎকার ক'রে বললেন, "ও তীরন্দাজ নয়—ও হচ্ছে যাদুকর! ওকে পুরস্কার দেওয়া হবে না!"

মোহান্ত রামগিরি প্রতিধ্বনি ক'রে বললেন, "ঠিক, ঠিক! তিনকড়ি একটা শঠ যাদুকর! ও পুরস্কারের যোগ্য নয়!"

তিনকড়ি আচম্বিতে ধনুক-বাণ তুলে কুমার রুদ্রনারায়ণের বুকের দিকে লক্ষ্যস্থির ক'রে বললে, "হয় আপনার তূণ দিন—নয় আমার বাণ নিন!"

রুদ্রনারায়ণের মুখ মড়ার মতন সাদা হয়ে গেল! তাঁর বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, তিনকড়ি বাণ ছাড়লে এই বিপুল জনতার সকলে মিলে একসঙ্গে চেষ্টা করলেও তাঁকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করতে পারবে না! কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, "তোমার ধনুক নামাও তিনকড়ি, ও মোহর-ভরা রূপোর তূণ তোমারই। আমি ঠাট্টা করছিলুম!"

তিনকড়ি মাথা নেড়ে বললে, "উঁহু, উঁহু! ধনুক নামালে আবার আপনি ঠাট্টা করতে পারেন। কারুকে দিয়ে আগে তূণটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিন!"

গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে রুদ্রনারায়ণ বললেন, "কেউ গিয়ে বুড়ো গুণ্ডা-টাকে তূণটা দিয়ে এস তো!.........ওহে তিনকড়ি, সাবধান। দেখো, বাণটা যেন তোমার হাত ফশ্‌কে ছুটে না আসে!"

তিনকড়ি একগাল হেসে বললে, "আপনার রূপোর তূণটা পেলেই বাণটা তার ভেতরে রেখে দেব!"

মোহর-ভরা রূপোর তূণটা নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল রুদ্রনারায়ণ-এর প্রাণের বন্ধু রাঘব রায়। তিনকড়ির সামনে গিয়ে তূণসুদ্ধ হাত বাড়িয়ে সে বললে, "এই নে, তূণ নিয়ে এখনি বিদায় হ!"

তিনকড়ি ধনুক থেকে বাণ খুলে যথাস্থানে রেখে দিয়ে রূপোর তূণটা নেবার জন্যে যেমন সাম্‌নের দিকে হেঁট হ'ল, রাঘব রায় অমনি চট্‌ ক'রে হাত বাড়িয়ে তার মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলো মুঠোয় চেপে ধরলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই একমাথা পাকা চুল আর দাড়ি খ'সে পড়ল হাতের টানে।

পর মুহূর্তেই রাঘব চেঁচিয়ে উঠল—"রবি-ডাকাত! ছদ্মবেশী রবি-ডাকাত! ধর্‌, ধর্‌, ওকে ধর্‌!"

সমস্ত ভিড় চারিদিক থেকে ক্রীড়াক্ষেত্রের মধ্যে ভেঙে পড়ল—তারপর সে কি হট্টগোল, কি হুটোপুটি, কি ছুটোছুটি, ঝুটোপুটি, মাথা-ফাটাফাটি। জনতার মধ্যে কেবল রবীনের সঙ্গীরাই ছিল না, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ অনেক গরীব লোকও ছিল, তারা সবাই ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ফেললে। সেপাইরা হৈ-হৈ ক'রে হাতিয়ার নিয়ে তেড়ে এল—কিন্তু ক্ষুদে জনার্দন, স্বামী ভোজানন্দ ও রবীনের সাঙ্গোপাঙ্গদের বন্‌-বন্‌ ঘুরন্ত লাঠির বহর দেখে তাদের সমস্ত উৎসাহ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কারা ডাকাত আর কারা সাধু, তাও তারা বুঝতে পারলে না; কারণ, জনতার সবদিক থেকেই কেবলি শোনা যাচ্ছে—"জয়, রবি-ডাকাতের জয়! জয়, রবি-ডাকাতের জয়!"

মোহান্ত রামগিরি হতভম্বের মত বললেন, "অ্যাঁ! কালে-কালে হ'ল কি—হ'ল কি? ডাকাতের নামে জয়ধ্বনি! হ'ল কি—হ'ল কি?"

রুদ্রনারায়ণ সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিত-স্বরে বললেন, "আর এখানে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়! রবি-ডাকাতের বাণ পথভুল করে না!"

দেখতে দেখতে সম্ভ্রান্ত দর্শকদের আসন একেবারে খালি হয়ে গেল।

ভিতরে ভিতরে তখনো চ্যাঁচামেচি ও মারামারি চলছে বটে, কিন্তু যার জন্যে এই হাঙ্গামা, সেই রবি-ডাকাত ও তার দলবল যে কোন্ ফাঁকে কখন্ কোথা দিয়ে স'রে পড়েছে, সে-খবর কেউ জানতেও পারলে না।

নবম পরিচ্ছেদ

আনন্দের নিরানন্দ

এক গেরুয়া পোশাক-পরা, দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। কান ও কপাল পর্যন্ত ঢাকা পাগড়ি এবং দীর্ঘ গোঁফ-দাড়ির ভিতর থেকে তাঁর মুখের অধিকাংশই আবিষ্কার করবার উপায় নেই, কিন্তু তাঁর বড় বড় উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকালেই তাঁকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব'লে বোঝা যায়।

সন্ন্যাসী বনের পথ ধ'রে নিজের মনেই কি ভাবতে ভাবতে চ'লেছেন, হঠাৎ একটা শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখেন, এক বেজায় ঢ্যাঙা ও আর-এক বেজায় মোটা লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ছিপ্‌ছিপে চেহারার যুবক। এমন ভাবে তারা পথ জুড়ে আছে যে, আর কারুর চলবার উপায় নেই।

সন্ন্যাসী বললেন, "পথ ছাড়ো।"

যুবক হেসে বললে, "ঠাকুর, নিজের পথ নিজে ক'রে নাও।"

—"কে তোমরা?"

—"আমি রবি-ডাকাত।"

—"আমি ক্ষুদে জনার্দন।"

—"আমি স্বামী ভোজানন্দ।"

—"পথ ছাড়ো। আমি তোমাদের চিনি না।"

রবীন বললেন, "ঠাকুর, আমাদের নাম তো শুনলে, এখন তোমার পরিচয় কি বল দেখি?"

—"আমার পরিচয় নেই। আমি সন্ন্যাসী।"

রবীন পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে সন্ন্যাসীর আল্‌খাল্লা টিপেটুপে পরীক্ষা করতেই ভিতরে ঝন্ ঝন্ শব্দে কি বেজে উঠল।

—"ওটা বাজে কি?"

—"তরোয়াল।"

—"সন্ন্যাসীর কোমরে তরোয়াল!"

স্বামী ভোজানন্দ বললে, "ভুলে যেও না রবি, ভুলে যেও না! সন্ন্যাসী যখন মাছ ধরতে আর মাংসের বড়া খেতে পারে, তখন তরোয়াল ধারণ করতেই-বা পারবে না কেন?"

রবীন হাসিমুখে বললেন, "ঠিক বলেছ ভোজানন্দ! এই লোকটিও বোধহয় তোমার মতই সন্ন্যাসী! তারপর প্রভু! কোমরের তরোয়াল গেরুয়ায় চাপা দিয়ে এ-পথে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

সন্ন্যাসী গম্ভীরস্বরে বললেন, "তোমারই কাছে।"

রবীন বিস্মিতভাবে বললেন, "আমার কাছে! কেন?"

—"শুনেছি তুমি গরিবের বন্ধু। আমিও গরিবকে ভালোবাসি। তাই তোমার সঙ্গে যোগ দিতে এসেছি।"

—"গরিবকে কেবল মুখে ভালোবাসলেই হয় না, দীনদুঃখী দুর্বলের জন্য তুমি সর্বস্ব খোয়াতে পারো? প্রাণ দিতে পারো?"

সন্ন্যাসী আরো গম্ভীর, রহস্যময়-কণ্ঠে বললেন, "দীনদুঃখী দুর্বলকে সাহায্য করাই আমার জীবনের একমাত্র ধর্ম।"

রবীন একটু ভেবে বললেন, "প্রভু, পষ্ট কথা বলছি ব'লে রাগ করো না। তুমি গরিবের বন্ধু হ'তেও পারো। আবার শত্রুদের গুপ্তচরও হ'তে পারো। কারণ, সশস্ত্র-সন্ন্যাসীর কথা শাস্ত্রে লেখে না। তবে আপাতত তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু দু-চারদিন ভালো ক'রে

না দেখে তোমাকে আমি দলে নিতে পারব না।"

সন্ন্যাসী বললেন, "বেশ, তাই হোক্।"

ভোজানন্দ তখন কান পেতে কি শুনে বললে, "রবি, রবি!"

—"কি?"

—"গান গায় কে?"

রবীনও শুনে বললেন, "হ্যাঁ। যেন ভারি দুঃখের গান।"

—"দিব্যি তাজা গলা। গাইয়ের বয়স বেশি নয়।"

ক্ষুদে জনার্দন বললে, "সুন্দরবনে সশস্ত্র-সন্ন্যাসী, তার উপরে আবার নবীন গায়ক! দুনিয়াটা উল্‌টেপাল্‌টে যাবে নাকি?"

রবীন বললেন, "চল, দু'পা এগিয়ে দেখা যাক্, বাঘের সভায় গান শোনাতে এল কে? প্রভু, তুমিও এস।"

বেশিদূর যেতে হ'ল না। পথ যেখানে নদীর ধারে গিয়ে পড়েছে, সেইখানে ঘাসজমির উপরে পা ছড়িয়ে ব'সে একটি ছোক্‌রা জলের দিকে তাকিয়ে একমনেই গান গেয়ে চলেছে। ছোক্‌রার বয়স, উনিশ-বিশের বেশি নয়। দরদ-ভরা দুঃখের সুরে এমন তদ্গত হয়ে সে গান গাইছিল যে, রবীনদের পায়ের শব্দও শুনতে পেলে না।

রবীন তার কাঁধের উপরে একখানি হাত রেখে বললেন, "কে তুমি?"

ছোক্‌রা চম্‌কে উঠে গান থামিয়ে ফেললে। তারপরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে সকলকার মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

—"কে তুমি? তোমার নাম কি?"

—"আমার নাম, আনন্দ।"

—"নাম তোমার আনন্দ, কিন্তু গান গাইছ তুমি নিরানন্দের, আর তোমার দুই চোখ দিয়ে ঝরছে অশ্রুজল! আনন্দের এত নিরানন্দ কেন?"

আনন্দ নিরুত্তর হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে ব'সে রইল।

রবীন লক্ষ্য ক'রে দেখলেন, ছোক্‌রার চেহারা কেবল ভদ্র নয়, বেশ সুশ্রীও বটে। তার মুখ দেখে তাঁর মায়া হ'ল। তিনি নরম-গলায় বললেন, "আনন্দ, তোমার কি হয়েছে বল! তুমি কোথায় থাকো?"

কাপড়ের খুট দিয়ে চোখের জল মুছে আনন্দ ব'ললে, "রঘুনাথপুরে।"

সচমকে রবীন বললেন, "রঘুনাথপুরে ? তুমি রাঘব রায়ের প্রজা ?"

—"হ্যাঁ মশাই। ঐ রাঘব রায়ই হয়েছে আমার যম।"

—"আনন্দ, তুমি সব কথা আমাদের কাছে খুলে বল। কিছু লুকিও না।"

—"আপনারা শুনে কি করবেন ? কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।"

—"তবু সব আমি শুনতে চাই।"

আনন্দ অল্পক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, "খুব সংক্ষেপেই সব শুনুন। আমি বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। আমরা ধনী না হ'লেও গরিব নই। নিমাইবাবু হচ্ছেন আমাদের প্রতিবেশী। তাঁর মেয়ে শ্রীমতীর সঙ্গে আমি ছেলেবেলা থেকে খেলাধুলো ক'রে আসছি। সবাই জানত, শ্রীমতীর সঙ্গে এই বছরেই আমার বিয়ে হবে। নিমাইবাবু নিজেও এত-দিন ধ'রে শ্রীমতীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্যে সাধ্যসাধনা ক'রে আসছিলেন। কিন্তু আমার অদৃষ্টের ফেরে হঠাৎ সব উল্‌টে গেল! আজ শ্রীমতীর বিয়ে, কিন্তু আমার সঙ্গে নয়। শ্রীমতী আর আমি দুজনেই দু-জনকে ভালোবাসি। তাকে হারাতে হবে ব'লেই মনের দুঃখে আমি নির্জনে এসে ব'সে আছি। আমি আর গাঁয়ে ফিরব না।"

রবীন বললেন, "তোমাদের বিয়ে ভেঙে গেল কেন ?"

—"শ্রীমতী খুব সুন্দরী। তাই তাকে বিয়ে করতে চায়, জমিদার রাঘব রায়।"

সন্ন্যাসী সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, "রাঘব রায়! তার বয়স পঞ্চাশ বৎসর, আর তিন স্ত্রী বর্তমান!"

রবীন বেশি বিস্মিত হ'লেন সন্ন্যাসীর বিস্ময় দেখে। বললেন, "তুমি রাঘব রায়কে চেন নাকি ?"

সন্ন্যাসী সহজ ভাবেই বললেন, "কিছু কিছু চিনি বটে।...তারপর আনন্দ, এই বিয়েতে শ্রীমতীর বাবা মত দিয়েছেন ?"

—"হ্যাঁ। কিন্তু বোধহয় নিজের ইচ্ছায় দেন নি। কারণ, রাঘব রায় ভয় দেখিয়েছে, টাকার লোভও দেখিয়েছে।"

রবীন নিজের মনে খানিকক্ষণ শিস্ দিলেন। তারপর হঠাৎ শিস্ থামিয়ে বললেন, "আনন্দ, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এ বিয়ে হবে না।"

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রীমতীর বিয়ে

স্বামী ভোজানন্দকে দলে পেয়ে রবীনের বড় সুবিধা হয়েছিল। কারণ সে কেবল পাঁচজনের খোরাক একলা সাবাড় করতে পারত না, এত ভালো রাঁধতেও পারত যে, রবীনের দলের লোকেরা যখন-তখন বলে —'বনবাস হয়েছে আমাদের স্বর্গবাস।'

ক্ষুদে জনার্দন গোগ্রাসে মাংস গিল্‌তে গিল্‌তে বলে, "উঁহু, স্বর্গেও এমন পাকা রাঁধিয়ে মিলবে না। ভোজানন্দ ভায়া নরকে গেলে আমিও স্বর্গে যেতে রাজি হব না।"

ভোজানন্দ ক্ষাপ্পা হয়ে বলে, "খোকা-তালগাছের কথার ছিরি দেখ। আমি যে নরকে যাব, এ-খবর তোমায় কে দিলে?"

ক্ষুদে জনার্দনও ক্রুদ্ধস্বরে বলে, "দেখ নরহস্তী! আমাকে খোকা-তালগাছ ব'লে কখ্‌খনো ডেকো না। ও-নামে ডাকলেই আমি রেগে পাগল হয়ে যাই!"

ভোজানন্দ চোখ পাকিয়ে বলে, "তুমি খোকা-তালগাছ নও, কিন্তু আমি নরহস্তী? এ খোকামিও সইতে হবে নাকি?"

—"নরহস্তী বলব না তো অত মোটা মানুষকে কি ব'লে ডাকব শুনি?"

রেগে তিনটে হয়ে ভোজানন্দ বলে, "কী! আমি মোটা? আমার

এই হাতের গুলি দেখেছ? এর ওপরে পড়লে লোহার ডাণ্ডাও ভেঙে যায়! আমার গায়ে এক ছটাক চর্বি নেই—খালি মোটা মোটা হাড় আর পেশী। আমি ইচ্ছে করলে এখুনি এক টানে খোকা-তালগাছটাকে মাটি থেকে উপ্‌ড়ে ছুঁড়ে ঐ নদীর জলে ফেলে দিতে পারি!"

ক্ষুদে জনার্দন তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে তাল ঠুকে বলে, "তাহ'লে সেই ইচ্ছাটা একবার প্রকাশ ক'রে দেখনা ভায়া!"

ভোজানন্দও আস্তিন গুটোতে থাকে, তখন আর-পাঁচজনে এসে প'ড়ে হাঁ হাঁ ক'রে বলে, "স্বামীজি, ক্ষুদে-জনার্দনের ক্ষুদ্র কথায় কি কান দিতে আছে? ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে চেঁচিয়ে তোমার গলা ভেঙে ফেলো না, তার চেয়ে একটা গান ধর, আমরা সবাই শুনি!"

কেউ তার গান শুনতে চাইলেই ভোজানন্দের সব রাগ জল হয়ে যেত! কারণ, সে যাকে গান ব'লে মনে করত, তা শুনলে লোকের কান এবং প্রাণ পড়ত মূর্ছিত হয়ে। বেচারার বড় দুঃখ, সে গান ধরলেই তার কাছ থেকে শুধু মানুষ নয়, ভূচর খেচর উভচর—সর্বজাতীয় জীবই মানে মানে তফাতে স'রে পড়ে। অথচ তার গান গাইবার ও শোনাবার সখ অত্যন্ত প্রবল! কেবল তার মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্যেই রবীনের আড্ডা মাঝে মাঝে তার গান শোনবার জন্যে সাহস প্রকাশ করতে বাধ্য হ'ত।

কিন্তু সে বাঁ-কানে বাঁ-হাত চেপে ও ডানহাত ভঙ্গিভরে নেড়ে নেড়ে গান ধরবার উপক্রম করলেই ক্ষুদে জনার্দন সভয়ে কাছে এসে মিনতির সুরে বলত, "ভাই ভোজানন্দ! লক্ষ্মী দাদাটি আমার! আজ আর কষ্ট ক'রে তুমি গান গেও না! আমার সমস্ত অপরাধ মাপ কর—আমি আর কখনো তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না!"

আজ দুপুরে এইরকম একটা অভিনয়ের পর ভোজানন্দ গান গাইবার এবং জনার্দন মাপ চাইবার উপক্রম করছে, এমন সময়ে রবীন এসে প'ড়ে বললেন, "কি হে, এখনো তোমরা এখানে ব'সে ব'সে আড্ডা দিচ্ছ? আজ বৈকালে শ্রীমতীর বিয়ে দেখবার জন্যে আমাদের রঘুনাথপুরে যেতে হবে, সে কথা কি মনে নেই? ওঠ, ওঠ, তোড়জোড় কর!"

সন্ন্যাসী এতক্ষণ দূরে ব'সে সকলের কথা শুনতে শুনতে মৃদু মৃদু হাসছিলেন, তিনি এখন উঠে এসে বললেন, "তোমরা আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে তো?"

রবীন হেসে বললেন, "তুমিও যেতে চাও প্রভু? বেশ, চল। কিন্তু দরকার হ'লে তরোয়াল চালাতে পারবে তো?"

সন্ন্যাসী গম্ভীরস্বরে বললেন, "যথাসময়েই সে পরিচয় পাবে।"

রঘুনাথপুরে আজ ভারি ধুমধাম। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই জমিদার-বাড়ি আলোর মালা প'রে যেন পলাতক অন্ধকারকে উপহাস করতে লাগল। নহবতখানায় বাজছে মিষ্টি বাঁশী তালে তালে, তার তানে তানে জাগছে চারিদিকে উৎসবের আভাস। বাড়ির অঙ্গনে ছুটোছুটি করছে রঙীন কাপড়-চাদর-পরা দাস-দাসী-দ্বারবানের দল।

রঘুনাথপুরের পথে পথে আজ কেবল সাধারণ লোকদেরই ভিড় নেই—সেইসঙ্গে রয়েছে জম্‌কালো পোশাক-পরা সেপাই-শান্ত্রীরও জনতা। তার কারণ, দেশের রাজপ্রতিনিধি ও রাঘব রায়ের পৃষ্ঠপোষক কুমার রুদ্রনারায়ণও আজ এখানে এসেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বরযাত্রীরূপে। রাজ-পথের কোথাও মলিন কাপড়-পরা গরিব, বা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে ভিখারীর দেখা নেই। পাছে রুদ্রনারায়ণের সুখী-চোখের বালি হয়, সেই ভয়ে রাঘব রায়ের হুকুমে বরকন্দাজরা নিম্নশ্রেণীর সমস্ত লোককে নজরের বাইরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজ এখানে থাকবে শুধু আলো আর হাসি, নাচ আর গান, রঙ আর ছন্দ। পঞ্চাশ বছরের বর, তিন স্ত্রীর আঁচল ছেড়ে ষোলো বছরের বউকে বিয়ে করতে চলেছে, বড়ই আনন্দের কথা!

বরের শোভাযাত্রার সঙ্গে দেখা গেল মোহান্ত রামগিরি ও তাঁর গেরুয়া-পরা শিষ্যদেরও। তাঁরা বোধহয় এসেছেন বর-বউকে আশীর্বাদ করতে!

রঙচঙে পোশাক পরলে, আতর মেখে ফুলের মালা গলায় ঝোলালে এবং চুলে, ভুরুতে, গোঁফে কলপ মাখলেই ছোক্‌রা সাজা চলে, তাহ'লে

রাঘব রায়কে দেখে আজ নবীন যুবক ছাড়া আর কিছু বললে অন্যায় হবে! আ মরি মরি, দুষ্ট বিধাতার চক্রান্তে বরের গালদুটি তুব্‌ড়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু মুখে কি মন-মাতানো মৃদু হাসি! এমন ভ্যাখনহাসি বর দেখবার সৌভাগ্য ক'জনের হয়? বরের সেই পোশাক, মালা, চুল ও হাসির বাহার দেখে রঘুনাথপুরের রাজপথের দুই পাশে যত বাড়ির যত জানলায় যত কুলবধূ উঁকিঝুঁকি মারছিল, সবাই খিল্ খিল্ ক'রে হেসে গড়িয়ে না প'ড়ে পারে নি। রঘুনাথপুরের কুকুর-বিড়াল, কাক-চিলরাও সেদিন হেসেছিল কিনা জানি না, কারণ, তাদের হাসি মানুষ চেনে না। কিন্তু আঁস্তাকুড়ের আনাচে-কানাচে ব'সে ও-অঞ্চলের পাগলরা যে দুনিয়া কি মজার ঠাঁই ভেবে হেসে ফেলেছিল, সে-খবর আমরা পেয়েছি!

পাত্র সভাস্থ হ'ল। কনের বাপের মনের ভিতরে কি হচ্ছিল বাইরের কেউ তা জানলে না, কিন্তু তিনি মুখে খুব হাসছিলেন। হাসবেন না? হাসা তো উচিত! বরের বন্ধু দেশের রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং তাঁর অতিথি হয়েছেন, এটা কি কম ভাগ্যের কথা?

রুদ্রনারায়ণ ভারিক্কি-চালে কনের বাপকে ডেকে বললেন, "ওহে নিমাই, তোমার বরাত খুব ভালো! রঘুনাথপুরের জমিদার-বাড়ি আর রাজবাড়ি একই কথা, তোমার মেয়ে রাজার ঘরে পড়ল!"

নিমাইয়ের জবাব দেবার ভরসা হ'ল না, অত্যন্ত আপ্যায়িতের মত হেঁটমুখে মাথা চুলকোতে লাগল।

রাঘব রায় তখন মনে মনে বাসর-ঘরে গাইবার জন্যে গান নির্বাচন করছিল।

মোহান্ত রামগিরি বললে, "লগ্ন হয়েছে। এইবারে পাত্রকে ছাঁদ্‌না-তলায় নিয়ে যাও!"

অমনি সভার ভিতর থেকে নানা কণ্ঠে শোনা গেল—"পাত্রকে ছাঁদ্‌নাতলায় নিয়ে যাও! পাত্রকে ছাঁদ্‌নাতলায় নিয়ে যাও!"

রুদ্রনারায়ণ সভার বিপুল জনতার দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "আমার সামনে এমন অসভ্যের মত চ্যাঁচায় কারা? হঠাৎ

সভার ভিড় এত বেড়ে উঠল কেন?"

রামগিরি লক্ষ্য ক'রে বললে, "দেখে মনে হচ্ছে, বহু রবাহূত, অনাহূতের দল সভার ভিতরে এসে ঢুকেছে।"

রুদ্রনারায়ণ গর্জন ক'রে বললেন, "ওদের দূর ক'রে দাও।"

"পাত্রকে ছাঁদ্‌নাতলায় নিয়ে যাও—পাত্রকে ছাঁদ্‌নাতলায় নিয়ে যাও" বলতে বলতে এক ছোক্‌রার হাত ধ'রে একটি ছিপ্‌ছিপে লোক ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল।

তাকে দেখেই রুদ্রনারায়ণ চম্‌কে উঠলেন। এ যে সেই তীরন্দাজ তিনকড়ি—না, না, রবি-ডাকাত! তার কাঁধে আজ ধনুক নেই দেখে তবু তিনি কতকটা আশ্বস্ত হলেন।

রামগিরির বুক গুর্ গুর্ করতে লাগল। রাঘব রায়ের মুখ শুকিয়ে এতটুকু।

রবীন আবার চিৎকার ক'রে বললেন, "মহান্ত-মহারাজা হুকুম দিয়েছেন—পাত্রকে ছাঁদ্‌নাতলায় নিয়ে যাও। যাও না হে আনন্দ, ছাঁদ্‌নাতলায় যাও না! এত লজ্জা কিসের বাপু?" ব'লেই তিনি ছোক্‌রাকে সামনের দিকে ঠেলে দিলেন।

রুদ্রনারায়ণ আবার গর্জন ক'রে বললেন, "এ-সবের মানে কি?"

রবীন হাত জোড় ক'রে বললেন, "হুজুর, আজ যে আনন্দের সঙ্গে শ্রীমতীর বিয়ে! পাত্রকে ছাঁদ্‌নাতলায় নিয়ে যাও!"

রামগিরি চিৎকার ক'রে বললেন, "শ্রীমতীর সঙ্গে বিয়ে হবে জমিদার রাঘব রায়ের। কে তোমাকে এখানে আনন্দকে আনতে বললে?"

রবীন আবার রুদ্রনারায়ণের দিকে ফিরে জোড়-হাতে বললেন, "হুজুর, এ কি-রকম অন্যায় কথা, বিচার ক'রে দেখুন। একজন তিনবারের পর চারবার বিয়ে করার সুযোগ পাবে, আর-একজন একবারও পাবে না?...আর, রাঘব রায় এখানে কেন? ওর ছাঁদ্‌নাতলা তো শ্মশান ঘাট! হুকুম দেন তো ওকে সেইখানেই নিয়ে যাই!"

সভার নানা দিক থেকে পঞ্চাশ-ষাট জন লোক উচ্চৈঃস্বরে একসঙ্গে

হেসে উঠল।

রাঘব রায় মুখ লাল ক'রে ভয়ানক জোরে চিৎকার করলে, "ষড়যন্ত্র! ষড়যন্ত্র! রবি-ডাকাতের ষড়যন্ত্র!"

রুদ্রনারায়ণ হাঁকলেন, "পাইক! বরকন্দাজ! এখনি এই ডাকাতটাকে গ্রেপ্তার কর।"

সেপাই-শান্ত্রীরা এক পা এগুবার আগেই দেখা গেল, নানা দিকের অন্তরাল থেকে দলে-দলে অস্ত্রধারী লোক ছুটে এসে রবীনের চারিপাশ ঘিরে দাঁড়াচ্ছে!

রুদ্রনারায়ণ অসহায়ের মত চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, সভার কোন্ দিকটা বেশি নিরাপদ!

নিমাই কাঁদো কাঁদো মুখে কাতর স্বরে বললে, "রবীনবাবু! গরীবের ওপরে দয়া করুন! বিবাহ-সভায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবেন না!"

পিছন থেকে গম্ভীর স্বর জাগল, "না, আমি যখন আছি, তখন এখানে কখনো রক্তগঙ্গা বইবে না!"

রবীন সবিস্ময়ে ফিরে দেখলেন, সেই তরবারিধারী সন্ন্যাসীর দীর্ঘ মূর্তি একেবারে সভার মাঝখানে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

রুদ্রনারায়ণ হুম্‌কি দিয়ে বললেন, "তুমি আবার কে হে, বাপু, এখানে এলে মুরুব্বিআনা করতে?"

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বললেন, "আমি? তুমিও আমাকে চিনতে পারছ না?" বলতে বলতে তিনি মাথার পাগ্‌ড়ি আর পরচুলার গোঁফ-দাড়ি খুলে ফেললেন!

সভার সমস্ত লোক একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল চমৎকৃত হয়ে! তারপরেই চিৎকার জাগল... "জয় মহারাজা ইন্দ্রদমনের জয়! জয় মহারাজা ইন্দ্রদমনের জয়! জয় মহারাজা ইন্দ্রদমনের জয়!"

জয়ধ্বনি ও বিস্ময়-কোলাহল বন্ধ হ'লে পর ইন্দ্রদমন বললেন, "রুদ্রনারায়ণ, তোমার জন্যে আমি দুঃখিত। তোমার অবিচারে, অত্যাচারে সারা দেশে যে অরাজকতা উপস্থিত হয়েছে, সুদূর তীর্থক্ষেত্রেও আমার কানে গিয়ে সে কথা পৌঁছেছিল। আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু স্বচক্ষে সমস্ত দেখবার জন্যে আজ আমি ছদ্মবেশে দেশে ফিরে এসেছি, তোমার নামে একটা অভিযোগও মিথ্যা নয়।"

রুদ্রনারায়ণ ঘাড় হেঁট ক'রে বললেন, "মহারাজ, আমায় ক্ষমা করুন।"

—"ক্ষমা? ক্ষমার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর মোহান্ত রামগিরি, জমিদার রাঘব রায়! কুমার রুদ্রনারায়ণের অধঃপতনের প্রধান কারণই হ'চ্ছ তোমরা দুজন।"

রামগিরি ক্ষীণ স্বরে বললে, "মহারাজ—"

—"চুপ! তোদের কারুর কোন কথাই আর শুনতে চাই না। রুদ্রনারায়ণ! রামগিরি! রাঘব রায়! তোমাদের তিনজনকেই নির্বাসন-দণ্ড দিলুম। কাল সকালে তোমরা যদি আমার রাজ্যের মধ্যে থাকো, তাহ'লে তোমাদের প্রাণদণ্ড হবে! যাও, এখনি আমার সুমুখ থেকে দূর হয়ে যাও!"

তিন মূর্তি একসঙ্গে সভার ভিতর থেকে সুড়্‌সুড়্ ক'রে বেরিয়ে গেল!

কনের বাপের দিকে ফিরে ইন্দ্রদমন বললেন, "নিমাই, লগ্নের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়—আনন্দকে নিয়ে বিবাহের স্থানে যাও। আজ আমি

নিজে উপস্থিত থেকে বর-বধূকে আশীর্বাদ করব।"

আনন্দকে এখন মূর্তিমান আনন্দের মতই দেখাচ্ছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে তার সমস্ত নিরানন্দ!

রবীন এগিয়ে গিয়ে ইন্দ্রদমনের সুমুখে হাঁটু গেড়ে ব'সে প'ড়ে বললেন, "মহারাজ, চিনতে পারিনি, ক্ষমা করুন। আমার উপরে কি আদেশ প্রভু?"

—"ভালো কাজই কর, আর মন্দ কাজই কর, তুমি হ'চ্ছ ডাকাত।"

—"স্বীকার করছি। শাস্তি দিন।"

—"তোমাকে এই শাস্তি দিলুম, তুমি আর কখনো ডাকাতি করতে পারবে না।"

—"মহারাজ! রাজ্যে যদি শাসনকর্তা থাকেন, রক্ষক যদি ভক্ষক না হন, তা'হলে আমার ডাকাতি করবার প্রয়োজন কি?"

—"সাধু রবীন, সাধু! তোমার কথা আমি মনে রাখব।"

দূরে দাঁড়িয়ে স্বামী ভোজানন্দ চুপি চুপি বললে, "সব ভালো যার শেষ ভালো! কি আনন্দ, কি আনন্দ!" আমার একটা গান গাইবার সাধ হচ্ছে!"

শিউরে উঠে ক্ষুদে জনার্দন বললে, "সর্বনাশ! চুপ, চুপ! তুমি এখানে গান গাইলেই তোমার শূলদণ্ড হবে!"

আধুনিক রবিন্‌হুড্‌

আধুনিক রবিন্‌হুড্‌

এক

সিনেমায় গিয়ে কিংবা বই পড়ে বিলাতের উদার ডাকাত রবিন্‌হুডের সঙ্গে তোমাদের নিশ্চয় চেনাশুনা হয়েছে। রবিন্‌হুড্‌ ইংলণ্ডের সেরউড্‌ অরণ্যে বাস করত এবং ধনীদের টাকা লুটে গরিবদের বিলিয়ে দিত।

কিন্তু একালের আর একজন রবিন্‌হুডের নাম এখনো পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। সেকালে সত্যিই রবিন্‌হুড্‌ বলে কেউ ছিল কি-না, সে-সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু একালের এই রবিন্‌হুডের সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ নেই। সে সত্যিকার মানুষ।

তার আসল নাম—হুগো ব্রিট্‌উইজার। সে অস্ট্রিয়ার লোক এবং তার কার্যক্ষেত্র—ভিয়েনা শহরে।

হুগো রীতিমত ভদ্র পরিবারের ছেলে। সে শিক্ষিত ও ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু তার মাথা এত সাফ্‌ যে, নিজের যত্নে ও অধ্যবসায়ে সে আরো নানান বিদ্যায় পাকা হয়ে উঠেছিল।

তালা-চাবি, সিন্দুক, বাক্স ও গরাদে প্রভৃতি তৈরি করবার জন্যে যে-সব লোহা ও অন্যান্য ধাতু ব্যবহৃত হত, তাদের শক্তির খুঁটিনাটি সমস্ত সে জানত। লোহা ও ইস্পাতের উপরে কোন্‌ অ্যাসিডের কতটা প্রভাব, রসায়ন-বিদ্যা শিখে তাও সে জেনে নিয়েছিল। অক্সি-অ্যাসিটিলিন টর্চ দিয়ে কেমন করে ইস্পাতের দরজায় ছ্যাঁদা করতে হয়, তার তাও অজানা ছিল না।

সে নিজের হাতে নানারকম অদ্ভুত যন্ত্র তৈরি করতে পারিত। চোর-ডাকাত ধরবার জন্যে এ-কালের পুলিশ যে-সব বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করে, সে সমস্তই ছিল তার নখদর্পণে। বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভদের সমস্ত

চার্চুরীর কাহিনীই সে পড়ে ফেলেছিল। সে রীতিমত ব্যায়াম করত। জুজুৎসু, কুস্তি ও বক্সিংয়ের সব প্যাঁচই খুব ভালো করে শিখেছিল।

যখন তার সমস্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ হল, তখন হঠাৎ একদিন সে বাড়ি থেকে একেবারে গা-ঢাকা দিলে। বাড়ির লোকে জানলে, হুগো দেশ ছেড়ে আমেরিকায় গিয়েছে।

সে কিন্তু ভিয়েনা শহরেই লুকিয়ে রইল। ছোটলোকদের বস্তীর ভিতরে একখানা ঘর ভাড়া নিলে। দিন-রাত সেই ঘরে একলা বসে লেখাপড়া করতে লাগল এবং দাড়ি-গোঁফ কামানো ছেড়ে দিলে। কিছু-দিন পরে দাড়ি-গোঁফে তার মুখ এমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল, কোন চেনা লোকের পক্ষেও তাকে চেনা আর সহজ রইল না।

দুই

সেবার বড়দিনের মুখে অস্ট্রিয়ায় এমন হাড়ভাঙা শীত পড়ল যে, তেমন শীত আর কেউ কখনো দেখেনি।

অস্ট্রিয়া হচ্ছে শীতপ্রধান দেশ। সেখানে ঘরের ভিতরে কয়লার আগুন জ্বেলে না রাখলে ঠাণ্ডায় মারা পড়বার সম্ভাবনা হয়। তার উপরে আবার এই অতিরিক্ত শীত।

সুবিধে বুঝে দুষ্ট ব্যবসায়ীরা কয়লার দাম অসম্ভব বাড়িয়ে দিলে। ধনীদের কোনই বালাই নেই, বেশি ঠাণ্ডায় বেশি কয়লা কিনে পোড়াবার শক্তি তাদের আছে। কিন্তু যত অসুবিধা হল, গরীব বেচারীদের! চড়া দামে কয়লা কেনবার সঙ্গতি নেই,—অথচ চারিদিকে বরফ পড়ছে, দেহের রক্ত জমাট হয়ে যাচ্ছে। আগুন পোয়াতে না পেরে অনেকে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘুমিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু সে ঘুম আর এ-জীবনে ভাঙল না।

বড়দিন আসতে মাত্র দুদিন দেরি। শীতার্ত এক সন্ধ্যায় ভিয়েনার এক বড় ব্যবসায়ী তার দোকান-ঘর বন্ধ করবার উদ্যোগ করছে এমন সময় ফিট্‌ফাট্ পোশাক-পরা এক যুবক তার দোকানে এসে ঢুকল।

যুবক বললে, "আমি হচ্ছি কোন দয়ালু মস্ত ধনীর সেক্রেটারী। আমার মনিব তাঁর নাম প্রকাশ করতে রাজি নন। তিনি এক হাজার গরীব পরিবারকে কয়লা দান করতে চান। কিন্তু আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত কয়লা পাঠাতে হবে। যাদের কাছে পাঠাতে হবে, আমি এখনি তাদের ঠিকানা দিচ্ছি। কিন্তু আজকেই এত কয়লা পাঠাতে পারবে কি?"

ব্যবসায়ী বললে, "কেন পারব না? কিন্তু এত কয়লার দাম যে অনেক হাজার টাকা!"

যুবক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নোটের তাড়া বের করে বললে, "দাম নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।"

ব্যবসায়ী কয়লা পাঠাবার ব্যবস্থা করলে। যুবক সমস্ত দাম চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল।

রাত হয়েছে বলে ব্যবসায়ী নোটের তাড়া ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারলে না। লোহার সিন্দুকে নোটগুলো পুরে দোকান বন্ধ করলে। একদিনেই এই আশাতীত লাভে তার মুখে হাসি আর ধরে না।

সে-রাত্রে ভিয়েনায় এক হাজার দরিদ্র পরিবারের মধ্যেও হাসি-খুশির ধুম পড়ে গেল। দাতার দানে ঘরে ঘরে কয়লা পুড়ছে, শীতের চোটে প্রাণের ভয় আর নাই।

তিন

পরদিন প্রভাতে ব্যবসায়ীর মুখের হাসি শুকিয়ে গেল।

স্তম্ভিত চক্ষে সে দেখলে, তার লোহার সিন্দুক খোলা, কাল রাতে-পাওয়া সেই নোটের তাড়া তো নেইই, সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক টাকা অদৃশ্য হয়েছে। সে তখনি পুলিশের খবর দিতে ছুটল।

গোটা শহরে মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হল। কাগজে কাগজে অজানা দাতার এই অদ্ভুত দান ও অজানা চোরের এই অদ্ভুত চুরির কাহিনী এবং

লোকের মুখে মুখে কেবল তারই আলোচনা।

কে এই দাতা ? কে এই চোর ?

ইউরোপে ভিয়েনার পুলিশের ভারি সুনাম। কিন্তু সে সুনামে আজ কোন ফল হল না। এই বিস্ময়কর চোর এমন সুচতুর ও সাবধানী যে, ধরা পড়বার কোন সূত্রই পিছনে রেখে যায়নি!

দু-চারদিন যেতে-না-যেতেই উত্তেজনার উপরে আবার নতুন উত্তেজনা। ভিয়েনার শত শত খবরের কাগজে এই পত্রখানি বেরুলো :

> "ব্যবসায়ীর লোহার সিন্দুক থেকে আমি যা নিয়েছি, তা হচ্ছে আমার নিজের টাকা। ঐ নিচ ব্যবসায়ী এই শীতে অকারণে কয়লার দাম বাড়িয়ে গরীবদের অনেক কষ্ট দিয়েছে। তাই তার এই শাস্তি।
>
> ব্যবসায়ীর বাকি যে টাকাগুলো নিয়েছি, তা হচ্ছে আমার পারিশ্রমিক। ইতি—
>
> রবিন্‌হুড্।"

বলা বাহুল্য, আসলে এই আধুনিক রবিন্‌হুড্ আমাদের পূর্বপরিচিত হুগো ছাড়া আর কেউ নয়।

তারপরে প্রায়ই ভিয়েনা শহরে বড় বড় চুরির মহা ধুম পড়ে গেল। ধনীদের সুরক্ষিত অট্টালিকা, কৃপণের লোহার দরজা, দুর্ভেদ্য ইস্পাতের সিন্দুক, চোরের কাছে সমস্তই যেন নগণ্য হয়ে উঠল।

দেশব্যাপী অভিযোগে ও ক্রমাগত ছুটাছুটি করে ভিয়েনার বিখ্যাত পুলিশ-বাহিনীও দস্তুরমত কাহিল হয়ে পড়ল। কোন চুরিতেই চোর সামান্য সূত্রও রেখে যায়নি। চোরেরা হঠাৎ এমন অসম্ভব চালাক হয়ে উঠল কেমন করে ?

কিছুকাল পরে পুলিশ অনেক সন্ধান নিয়ে আবিষ্কার করলে যে, এক একটা বড় চুরি হবার পরেই শহরের গরীব লোকেরা অজানা দাতার কাছ থেকে বহু টাকা পুরস্কার পায়!

পুলিশ মাথা ঘামিয়ে বুঝতে পারলে যে, এ-সব চুরি বহু চোরের

কীর্তি নয়, সব চুরির মূলেই আছে নিশ্চয়ই সেই অদ্ভুত রবিন্‌হুড্‌!

কিন্তু এই আবিষ্কারেও কোন লাভ হল না। কে এই রবিন্‌হুড্‌? কোথায় সে থাকে?

চার

কিছুতেই যখন রবিন্‌হুডের ঠিকানা পাওয়া গেল না, তখন তাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে পুলিশ এক নতুন উপায় অবলম্বন করলে।

নানান খবরের কাগজে এক হঠাৎ-ধনী মাংস-ব্যবসায়ীর কথা প্রকাশিত হল। তার টাকাকড়ি, হীরা-জহরতের নাকি অন্ত নেই! সে নাকি এখন মাংস-ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে সৌখীন ধনীর মত শহরে নবাবী করতে এসেছে!

নানা থিয়েটারে ও উৎসবের আসরে তাকে সপরিবারে প্রায়ই দেখা যেতে লাগল। তার বউ ও মেয়েদের গায়ে এত জড়োয়ার গয়না যে, চোখ যেন ঝল্‌সে যায়!

কিন্তু বাড়িতে ফিরে তারা নাকি খুব সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। রাত দুপুরের আগেই তাদের বাড়ির সব আলো নিবে যায়!

এক রাত্রে বাড়ির সব আলো নিবে গেছে এবং সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

যে-ঘরে তাদের গয়নার সিন্দুক থাকে সেই ঘরে কেমন একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। যেন ইঁদুরেরা কুট্ কুট্ করে কি কাট্‌ছে!

অন্ধকারে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল এবং চারজন ডিটেক্‌টিভ দৌড়ে গিয়ে দেখল যে, লোহার সিন্দুকের সামনে একটি যুবক বসে আছে। রবিন্‌হুড্‌ পা দিয়েছে পুলিশের ফাঁদে!

হুগো কিন্তু পুলিশের চেয়ে ঢের বেশি চট্‌পটে!

এক মুহূর্তে তার হাতের রিভলভার ঘন ঘন গর্জন করে উঠল এবং আলোগুলো গুলির চোটে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল!

আবার আলো জ্বেলে দেখা গেল, ঘরের মেঝের উপরে এক ডিটেক্‌টিভ

আহত ও আর-একজন নিহত হয়ে রয়েছে এবং রবিন্‌হুড্ হয়েছে অদৃশ্য!

কিন্তু এত করেও হুগো পালাতে পারলে না।

অন্ধকার জানলা দিয়ে বেরিয়ে, দড়ি বেয়ে সে পথে গিয়ে নামতে না নামতেই একদল পুলিশের লোক এসে তাকে চারিদিক থেকে জড়িয়ে ধরলে!

মহাবলবান্ হুগো দানবের মত যুদ্ধ করতে লাগল, শত্রুর পর শত্রুকে বার বার কাবু করে ফেললে, কিন্তু তবু রক্ষা পেলে না! পুলিশের দল বড়ই ভারি, হাতে হাতকড়া পরে এতদিন পরে তাকে কারাগারেই যেতে হল!

পাঁচ

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় বন্দী হুগো কারাকক্ষের রক্ষীকে ডেকে বললে, "ওহে, আজ বোধহয় সমস্ত খবরের কাগজেই আমার কীর্তির কথা বেরিয়েছে?"

—"তা বেরিয়েছে বৈকি!"

—"সেগুলো আমাকে পড়াতে পারো? আমি দামও দেব, তোমাকে বকসিসও দেব।"

রক্ষী এতে কোন দোষ দেখলে না। খানিক পরেই সে বস্তা বস্তা কাগজ কিনে এনে দিলে। ভিয়েনা শহর তো কলকাতার মত নয়, সেখানে লোক থাকে উনিশ লাখের কাছাকাছি, আর তাদের প্রায় সকলেরই রোজ খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস। কাজেই ভিয়েনায় প্রত্যহ খবরের কাগজ বেরোয় শত শত। এই সমস্ত কাগজের স্তূপ এত উঁচু হল যে, হুগোর মূর্তি তার মধ্যে প্রায় ঢাকা পড়ে গেল।

কয়েদখানায় ঘরের বাইরে সমগ্র সশস্ত্র রক্ষী পায়চারি করছে এবং মিনিট পনেরো অন্তর জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে হুগোকে দেখা যাচ্ছে। প্রতিবারেই দেখে, সে যেন গর্বে স্ফীত হয়ে এক-মনে

খবরের কাগজে নিজের কীর্তিকাহিনী পাঠ করছে।

হুগো কিন্তু কাগজ পড়ছিল না। যেই রক্ষী চলে যায়, অমনি সে দাঁড়িয়ে ওঠে এবং অন্যদিকের একটা জানলার কাছে গিয়ে খুব ছোট্ট একখানা উকো বার করে গরাদের উপর ঘষতে থাকে। খুব পাতলা অথচ শক্ত ইস্পাতের পাতে এই উকো তার নিজের হাত তৈরি। পুলিশ জামা-কাপড় হাতড়ে তার সব জিনিস কেড়ে নিয়েছিল, কিন্তু এই উকো লুকানো ছিল তার জুতোর 'সোলে'র মধ্যে!

মাঝ-রাত্রে সে রক্ষীকে ডেকে বললে, "ওহে ভাই, আমার চোখ একে খারাপ, তায় এই কাম্‌রার আলোর জোর নেই। খবরের কাগজের এখানটা বড় ছোট ছোট হরফে ছাপা। জানলার কাছে এসে এ-জায়গাটা তুমি আমাকে পড়ে শোনাবে?"

রক্ষী রাজি হয়ে যেই গরাদের কাছে এল, হুগো অমনি নিজের উকো-দিয়ে-কাটা গরাদের লোহার আঘাতে তাকে একেবারে অজ্ঞান করে

ফেললে। তারপর হাত বাড়িয়ে রক্ষীর পকেট থেকে দরজা খোলবার চাবি বার করে নিলে।

শেষ-রাতে রক্ষী বদলাবার সময় এল। নতুন রক্ষী এসে পুরানো রক্ষীকে দেখতে না পেয়ে উপরওয়ালাদের খবর দিলে।

কামরায় কামরায় খোঁজাখুঁজির পর হুগোর ঘরে পুরানো রক্ষীর মৃতদেহ পাওয়া গেল। কিন্তু হুগো কোথায়? তার কয়েদীর পোশাক রয়েছে রক্ষীর দেহে, কিন্তু রক্ষীর পোশাক কোথায়?

ঘরের মেঝেতে অনেকগুলো খবরের কাগজ—পাকানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বন্দীর বিছানার গদী টুকরো টুকরো করে কাটা। এ-সবের অর্থ কি?

তারপর দেখা গেল, একটা জানলার একটা গরাদে নেই। এবং আর-একটা গরাদে থেকে পাকানো-খবরের কাগজের দড়ি ঝুলছে!

আশ্চর্য এই দড়ি! প্রথমে পাঁচ ছয়খানা খবরের কাগজ নিয়ে একসঙ্গে পাকানো হয়েছে। তারপর পাছে পাক্ খুলে যায়, সেই ভয়ে গদীর কাটা কাপড় জড়িয়ে তাকে শক্ত করা হয়েছে। তারপর একখানা পাকানো কাগজের সঙ্গে আর-একখানা কাগজ বেঁধে ফেলা হয়েছে। তারপর সেই দড়ি ধরে হুগো নিচে নেমে চম্পট দিয়েছে।

আজও সেই অদ্ভুত দড়ি ভিয়েনা-পুলিশের যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

ছয়

সেই সময়েই অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সঙ্গে প্রায় সারা-ইউরোপের মহাযুদ্ধ বাধল এবং সেই আধুনিক কুরুক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী কোলাহলে হুগোর কথা চাপা পড়ে গেল।

চার বৎসর পরে যখন মৃত্যুস্রোত বন্ধ হল, অস্ট্রিয়ার আকার ও শক্তি

তখন নগণ্য। এই জাতীয় অধঃপতনের সময়ে হুগোর কথা নিয়ে পুলিশও মাথা ঘামাতে পারেনি।

যে মাংস-ব্যবসায়ীকে অবলম্বন করে পুলিশ হুগোকে ধরেছিল, সে এখন সত্য সত্যই অগাধ টাকার মালিক! বড় বড় আমীর-ওমরাদের নিমন্ত্রণ করে প্রায়ই সে ভোজ দেয়!

একদিন এক বড় হোটেলে কাউন্ট রিচার্ড নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ হল এবং সেই আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হতে দেরি লাগল না।

কাউন্ট একদিন বললেন, "বন্ধু, এ-রকম ছোট ছোট ভোজ দিয়ে কোন লাভ নেই। এমন এক ভোজ আর বল-নাচ দাও, যা সারারাত ধরে চলবে! দেশের সমস্ত ধনী মেয়ে-পুরুষকে নিমন্ত্রণ কর। তাহলে তোমার খ্যাতির আর সীমা থাকবে না!"

মাংস-বিক্রেতা ধনী হয়ে আজ সম্ভ্রান্ত-সমাজে নাম কিনতে চায়। সে তখনি রাজি হয়ে গেল এবং এই বিরাট আয়োজনের ভার দিলে, কাউন্ট রিচার্ডের হাতে।

ভোজের রাত্রে ভিয়েনার সমস্ত সম্ভ্রান্ত নর-নারী মাংস-বিক্রেতার বাড়িতে এসে হাজির! চারিদিকে মণি-মুক্তায় বিদ্যুৎ জ্বলছে।

কাউন্ট তার বন্ধুকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "ওহে, এ-সব ব্যাপারে নাচের সময়ে প্রায়ই দামী গয়নাগাঁটি চুরি যায়। তোমার অতিথিদের বল, বেশি-দামী গয়নাগুলো আপাতত কিছুক্ষণের জন্যে তোমার লোহার সিন্দুকে তুলে রেখে দিতে। নাচ শেষ হলে আবার সেগুলো ফিরিয়ে দিও।"

সেই কথামতই কাজ হল।

শেষ-রাতে বল-নাচ হয়ে গেলে পর, অতিথিরা গয়না ফেরত চাইলেন।

কিন্তু লোহার সিন্দুক খুলে দেখা গেল, প্রায় চার লক্ষ টাকার গহনার একখানাও নেই। কাউন্ট রিচার্ডেরও খোঁজ পাওয়া গেল না!

দেশময় হৈ-চৈ! এমন চুরির কথা কেউ কখনো শোনেনি! সবাই

অবাক্! পুলিশও হতভম্ব!

কোন কোন খবরের কাগজ তখন মনে করিয়ে দিলে যে, এই মাংস-ব্যবসায়ীর বাড়িতেই রবিন্‌হুড্ ধরা পড়েছিল! আজ চার বছর পরে রবিন্‌হুড্ প্রতিশোধ নিয়েছে।

কথাটা পুলিশের মনে লাগল। চারিদিকে দলে দলে ডিটেক্‌টিভ ছুট্‌ল, কিন্তু দীর্ঘ দুই বৎসরের মধ্যে রবিন্‌হুডের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

সাত

দুই বৎসর পরে গুপ্তচরের মুখে খবর পাওয়া গেল, ভিয়েনা থেকে বিশ মাইল দূরে, ছোট্ট এক শহরে এক যুবক একাকী বাস করে। সে ধনী, কিন্তু কারুর সঙ্গে মেশে না। বাড়িতে বসে লেখাপড়া করে, ও মাঝে মাঝে বাইসাইকেলে চড়ে বেড়াতে যায়।

পুলিশ ভাবতে লাগল,—কে সে? কেন সে একলা থাকে? কেমন করে তার সংসার চলে? একবার তো তাকে দেখা দরকার!

হুগোকে চেনে এমন লোকের সঙ্গে একবার সশস্ত্র-পুলিশ পাঠানো হল।

দূর থেকে দেখা গেল, একজন লোক বাইসাইকেলে চড়ে আসছে।

হ্যাঁ! ঐ তো হুগো রবিন্‌হুড্!

পুলিশ বন্দুক তুললে, হুগোও রিভলভার বার করলে!

কিন্তু হুগো ধরা পড়ল না, পুলিশের গুলিতে মরণের মুখে আত্ম-সমর্পণ করলে।

বিচিত্র এই আধুনিক রবিন্‌হুডের জীবন। হুগো ধনীর টাকা চুরি করে গরীবকে দান করত। কিন্তু অসৎ পথে গিয়ে সৎকাজ করার যে কোন মূল্যই নেই, হুগোর অকালমৃত্যু সেইটেই প্রমাণিত করছে।

হুগোর যে বুদ্ধি, যে প্রতিভা ও যে সাহস ছিল, ভালো পথে থাকলে নিশ্চয়ই সে আজ দেশ-বিদেশে প্রাতঃস্মরণীয় অমর ব্যক্তি হতে পারত।

ভালো কাজ যদি করতে চাও, ভালো পথে থাকতে হবে।

পৃথিবীর প্রথম গোয়েন্দা-কাহিনী

তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ডিটেক্টিভ-গল্প শুনতে ভালোবাস। কেবল তোমরা কেন, পৃথিবীর সব দেশেই এ-শ্রেণীর গল্পের আদর আছে। অনেক লেখক কেবল ডিটেক্টিভ-কাহিনী লিখেই অমর হয়েছেন। বাংলাদেশের পুরানো গল্পে ও রূপকথাতেও গোয়েন্দা-কাহিনীর অল্পবিস্তর বিশেষত্ব পাওয়া যায়।

আধুনিক ভালো গোয়েন্দার গল্প বলতে কতকগুলো চমকদার ঘটনার সমষ্টি বোঝায় না ; কারণ, প্রধানত তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বুদ্ধির খেলা দেখানো। পাশ্চাত্ত্য দেশে আধুনিক গোয়েন্দা-কাহিনীর স্রষ্টা বলে আমেরিকান লেখক এডগার অ্যালেন পো'র নাম করা হয়। তিনি মাত্র গুটি-তিনেক ছোট ছোট গোয়েন্দার গল্প লিখে গেছেন, কিন্তু প্রত্যেকটি গল্পই অপূর্ব। সেগুলি কাল্পনিক গল্প হলেও সত্যিকার গোয়েন্দারাও যে তা পড়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে, এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে।

একবার আমেরিকায় একটি মেয়ে খুন হয়। তাই নিয়ে চারিদিকে মহা সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও পুলিশ খুনীকে ধরতে পারলে না। তখন পো-সাহেব সেই খুন অবলম্বন করে একটি ছোট গল্প লিখলেন। প্রথমটা সকলেই গল্প হিসাবেই তাকে গ্রহণ করলে। কিন্তু কিছুদিন পরে সত্যিকার খুনের সঙ্গে জড়িত একাধিক ব্যক্তি যে-সব কথা প্রকাশ করে দিলে তাতে জানা গেল যে, পো-সাহেবের সৃষ্ট কাল্পনিক ডিটেক্টিভের সন্দেহ ও অনুমানই সত্য।

ইংরেজ লেখক স্যর আর্থার কন্যান্ ডইলের নাম আজ কে না জানে? তাঁর লেখা সার্লক্ হোম্সের গল্প পৃথিবীর সব দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এড্গার অ্যালেন পো যদি গোয়েন্দার গল্প না লিখতেন, তাহলে সার্লক হোম্সের নাম আজ কেউ শুনতে পেত কিনা সন্দেহ।

তবে, আসলে আধুনিক গোয়েন্দা-কাহিনীর উৎপত্তি হয়েছে আঠারো শতাব্দীতে ফরাসী দেশে। তোমরা এখনও ভল্তারের বই পড়নি বোধ-হয়? রুসো নামে আর এক ফরাসী লেখকের সঙ্গে ভল্তারের রচনা ফরাসী-বিপ্লবের মূলে কাজ করেছিল যথেষ্ট। এই ভল্তারের একখানি উপন্যাস আছে, তার নাম—"জ্যাড্উইগ"। সেই উপন্যাসে দেখা যায়, রানীর কুকুর ও রাজার ঘোড়া হারিয়ে গেল, কিন্তু জ্যাড্উইগ পথের উপরে কেবল তাদের পদচিহ্ন দেখে বলে দিলে, কুকুরটা মদ্দা না মাদী, সেটা কোন্ জাতের, তার বাচ্চা হয়েছে কিনা ও তার ল্যাজ কত বড় এবং ঘোড়ার আকার কত উঁচু, তার পা খোঁড়া কি-না প্রভৃতি আরো অনেক আশ্চর্য কথা।

এই জ্যাড্উইগের বুদ্ধি-কৌশলে রাজা কেমন করে সাধু কোষাধ্যক্ষ পেয়েছিলেন, সে গল্পটা শোনবার মত।

একদিন রাজা দুঃখ করে বললেন, "জ্যাড্উইগ, আজ পর্যন্ত আমি কোন সাধু কোষাধ্যক্ষ পেলুম না। যাকে কোষাধ্যক্ষের পদ দিই, সে-ই দুহাতে টাকা চুরি করে। তুমি তো এত বুদ্ধিমান, সাধু কোষাধ্যক্ষ পাওয়া যায় কেমন করে, বলতে পারো?"

জ্যাড্উইগ বললে, "পারি মহারাজ! যে সব-চেয়ে ভাল নাচতে পারবে, সে-ই সাধু কোষাধ্যক্ষ।"

রাজা বললেন, "পাগলের মত কি যে বল, ঠিক নেই! ভালো নাচিয়ে হলেই সাধু হবে? যা নয় তাই!"

জ্যাড্উইগ বললে, "আমার কথা সত্য কিনা পরীক্ষা করে দেখুন না! আমি যা-যা বলি তার ব্যবস্থা করে দিন।"

—"কি ব্যবস্থা ?"

—"রাজসভার পাশের একখানা ঘরে রাশি রাশি হীরে-চুনী-পান্না রেখে দিন। তারপর যারা আপনার কোষাধ্যক্ষ হবার জন্যে দরখাস্ত করেছে, তাদের একে একে সেই ঘরে ঢুকে সভায় আসতে বলুন। ঘরের বাইরে সেপাই পাহারা দিক্, কিন্তু ভিতরে যেন কেউ না থাকে।"

রাজা তখনি জ্যাড্‌উইগের কথামত সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে যারা কোষাধ্যক্ষের পদ চায় তারা প্রত্যেকেই সেই রত্নগৃহের ভিতর দিয়ে একে একে রাজসভায় এসে দাঁড়াল।

রাজা বললেন, "তোমরা কোষাধ্যক্ষ হতে চাও ? বেশ, তাহলে নাচ আরম্ভ কর।"

—"সে কি মহারাজ ! নাচতে হবে ?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে নাচবে না তার আবেদনও গ্রাহ্য হবে না। ধর নাচ !"

রাজার সিংহাসনের পিছনে দাঁড়িয়ে জ্যাড্‌উইগ দেখলে, কোষাধ্যক্ষ-পদপ্রার্থীরা হতাশ মুখে নৃত্য শুরু করলে। কিন্তু তারা ভালো করে নাচতেই পারলে না—তাদের দেহ জড়ো-সড়ো ও আড়ষ্ট, মাথা হেঁট, দুই হাত শরীরের দুই দিকে সংলগ্ন, কারুর নাচেই স্বাধীন গতি নেই। ধুপ ধুপ করে মাটিতে পা ছুঁড়ে ধেই-ধেই করে নেচে তারা কেবল নাচের নামরক্ষা করছে মাত্র !

জ্যাড্‌উইগ ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "পাজী, ছুঁচো, বদমাইসের দল।"

কিন্তু একটি লোক চমৎকার নাচছে ! তার দেহে সঙ্কোচের কোন লক্ষণই নেই, মাথা উন্নত, হাত-পায়ের লীলা মনোরম।

জ্যাড্‌উইগ বললে, "মহারাজ, এই লোকটি সাধু। একেই আপনার কোষাধ্যক্ষের পদ দিন !"

রাজা বিস্মিত স্বরে বললেন, "কি করে তুমি জানলে যে, এই লোকটি সাধু ?"

জ্যাড্‌উইগ বললে, "মহারাজ, এই একশোজন লোক আপনার কোষাধ্যক্ষ হতে এসেছে। কিন্তু ঐ একজন ছাড়া বাকি সবাই যখন

একে একে রত্নগৃহের ভিতর দিয়ে এসেছে, তখন লোভ সামলাতে না পেরে মুঠো মুঠো হীরে-চুণী-পান্না তুলে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে ফেলেছে। কাজেই পাছে সেগুলো পকেট থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে ওরা ভালো করে নাচতেই পারছে না।"

রাজা দুঃখিতভাবে বললেন, "একশো জনের মধ্যে মোটে একজন সাধু।"

জ্যাড্‌উইগ বললে, "মহারাজ, একজন সাধু একাই একশো।"

বলা বাহুল্য, সেই সাধু ব্যক্তিই কোষাধ্যক্ষের কাজ পেলে। বাকি লোকগুলোর কাছ থেকে চোরাই মাল কেড়ে নেওয়া হল তো বটেই, তার উপরে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হল।

কিন্তু আঠারো শতাব্দীর ইউরোপের কথা তো অতি আধুনিক কথা। ডিটেক্‌টিভ গল্পের সৃষ্টি হয়েছে আরো বহু শতাব্দী আগে। পৃথিবীতে যখন ঐতিহাসিক যুগ সবে আরম্ভ হয়েছে, তখনকারও একটি ডিটেক্‌টিভ গল্প আমরা পেয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার আগে পৃথিবীতে আর কোন গোয়েন্দা-কাহিনী লেখা হয়নি।

এই গল্পের নায়ক বা ডিটেক্‌টিভ হচ্ছে দানিয়েল, বাইবেলে যিনি জ্ঞানী ব্যক্তি বলে বিখ্যাত। ঘটনাক্ষেত্র হচ্ছে বাবিলন।

প্রাচীন বাবিলনে এক মস্ত দেবতা ছিলেন, তাঁর নাম বেল্‌। তাঁকে 'মহা-পর্বত' বলেও ডাকা হত।

হিন্দুদের দেব-দেবীরা এক হিসাবে রীতিমত নির্লোভ। তাঁদের সামনে যত ভালো খাবারই ভোগ বলে ধরে দাও, তাঁরা নির্নিমেষ নেত্রে কেবল সেইদিকে তাকিয়ে থেকেই খুশি হন, পরে খাবারগুলো অদৃশ্য হয় প্রকাশ্য ভাবেই ভক্তদের ক্ষুধার্ত উদর-গহ্বরে। কে জানে মা-কালীর যদি মাংস খাবার শক্তি থাকত, তাহলে কালীঘাটে এতবেশি পাঁঠা বলি দেওয়া হত কি-না।

কিন্তু বাবিলনের বেল্‌ ছিলেন দস্তুরমতন পেটুক দেবতা। তাঁর সামনে ভোগ দিলে ভক্তদের একটি কণাও প্রসাদ পাবার উপায় ছিল না। অন্ততঃ বাবিলনবাসীরা সেই কথাই মনে করত।

প্রকাণ্ড দেবালয়, তার চূড়ো যেন আকাশ ভেদ করতে চায়। দেবালয়ের সঙ্গেই সংলগ্ন এক প্রাসাদে ঠাকুরের পুরোহিতরা বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাস করে।

ভোগমন্দিরে রাজবাড়ি থেকে রোজ বড় বড় থালায় রাশি রাশি উপাদেয় খাবার আসে, ঠাকুরের পেট ভরার জন্যে।

বেল্ ঠাকুর খাইয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু লোকের চোখের সামনে খেতে হয়তো তাঁর লজ্জা হয়। তাই তাঁর সামনে খাবারের থালাগুলো সাজিয়ে রেখে সবাই সরে পড়ে এবং রাত্রে মন্দিরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কিন্তু রোজ সকালে উঠে দেখা যায়—কি আশ্চর্য! পাথরের ঠাকুর বেল্ জ্যান্তো হয়ে সব খাবার খেয়ে হজম করে ফেলেছেন!

দেবতার শক্তি দেখে রাজার মনে ভক্তি-শ্রদ্ধা আর ধরে না এবং যাদের মন্ত্রশক্তিতে দেবতা এমন জাগ্রত, সেই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও লাভের অঙ্ক বেড়ে উঠল রীতিমত।

এমন সময় ঘটনাক্ষেত্রে দানিয়েলের প্রবেশ। জাতে তিনি ছিলেন ইহুদী, বাবিলনে এসেছেন যুদ্ধে বন্দী হয়ে। কাজেই বেলের উপরে তাঁর একটুও ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই।

দানিয়েল সমস্ত দেখে-শুনে একদিন বললেন, "মহারাজ, পাথুরে দেবতার পেটের ভিতরটাও নিরেট পাথরে ভর্তি হয়ে আছে, রাশি রাশি মিষ্টান্ন, ফল আর মাংসের লোভে সে পেট ফাঁপা হতে পারে না। বেল্ এ-সব খাবার খান না।"

রাজা বললেন, "কি যে বল তার মানে হয় না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, রাত্রে মন্দিরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ থাকে। মন্দিরের ভিতরে জনপ্রাণী থাকে না, তবু খাবার কোথায় উড়ে যায়?"

দানিয়েল বললেন, "আমার মুখে সে কথা শুনলে আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমার কর্তব্য আমাকে করতে দিন, তারপর কাল সকালেই আপনাকে দেখাব, বেল্ খাবার খান না।"

সে-রাত্রেও ষোড়শোপচারে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হল।

তারপর দানিয়েল এসে প্রথমে মন্দিরের মেঝের উপরে সর্বত্র ভালো করে ছাই ছড়িয়ে দিলেন এবং তারপর মন্দিরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন।

সকাল হল। রাজাকে সঙ্গে করে দানিয়েল মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরজা খোলা হল। কিন্তু ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, ঠাকুর চেটেপুটে সব থালার খাবার খেয়ে ফেলেছেন।

রাজার পুরোহিতরা ও সাঙ্গোপাঙ্গরা দানিয়েলকে লক্ষ্য করে বললে, "কোথাকার এক অবিশ্বাসী ইহুদী এসে আমাদের এত-বড় ঠাকুরের শক্তিতে সন্দেহ করে! কী স্পর্ধা!"

রাজা দেবমূর্তির দিকে তাকিয়ে ভক্তিভরে গদগদ স্বরে বললেন, "হে বাবিলনের সনাতন দেবতা, হে মহাপ্রভু বেল্! অসীম তোমার

মহিমা, জাগ্রত তোমার উদর !"

দানিয়েল কিন্তু কিছুমাত্র দমলেন না। হাসিমুখে বললেন, "মহারাজ, মন্দিরের মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখুন !"

ছাই-ছড়ানো মেঝের দিকে তাকিয়ে রাজা সবিস্ময়ে বললেন, "একি ! এখানে এত ছাই কেন ? ছাইয়ের উপরে এত পায়ের দাগ এল কেমন করে ? এ যে দেখছি পুরুষের পায়ের দাগ, মেয়ের পায়ের দাগ, শিশুর পায়ের দাগ ! এ-সবের মানে কি ?"

দানিয়েল বললেন, "মানে খুব স্পষ্ট, মহারাজ ! মন্দিরের পিছনে এক গুপ্তদ্বার আছে। পুরুতরা তাদের বউ আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেবতার ভোগ পেট ভরে খেয়ে পালায়। কিন্তু কাল যে আমি এখানে ছাই ছড়িয়ে রেখেছি, অন্ধকারে সেটা তারা দেখতে পায়নি। তাই পায়ের দাগই তাদের ধরিয়ে দিলে !"

তখন রাজার চোখ ফুটল। বেলের উপরে তাঁর ভক্তি কমল কিনা জানি না, কিন্তু পুরোহিতদের প্রাণদণ্ড হল !

সত্যিকার দানব-দানবী

তোমাদের কাছে প্রায়ই আমি ভূতের গল্প, বা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী বলে থাকি। কিন্তু আজ আমি তোমাদের কাছে একটি ডিটেক্‌টিভের গল্প বলব।

এটি তোমরা বাজে গাল-গল্প বলে মনে কোরো না। ইউরোপের অস্ট্রিয়া দেশে এই সত্য ঘটনাটি ঘটেছিল। আমরা ঘটনাটি উদ্ধার করব পুলিশের নিজের ডায়েরি থেকেই।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পুলিশের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার পুলিশের মস্ত একটি তফাৎ আছে, সেটিও তোমাদের জানিয়ে রাখি। অন্য অন্য দেশের পুলিশ চুরি-ডাকাতি-খুনের কিনারা করবার জন্যে বাইরের কারুর দরজায় গিয়ে

ধর্ণা দেয় না। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার পুলিশ যখন কোন গোলমেলে মামলায় পড়ে, তখন প্রায়ই সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের সাহায্য নিয়ে থাকে।

প্রফেসররা পুলিশকে সাহায্য করেন শুনে তোমরা বোধহয় অবাক হচ্ছ? কিন্তু এতে অবাক হবার কিছুই নেই। কারণ, অষ্ট্রিয়ার ইউ-নিভার্সিটিতে অপরাধ-তত্ত্বের একটি বিভাগ আছে। ঐ প্রফেসররা সেই বিভাগেই ছাত্রদের শিক্ষা দেন। ওখানকার এক-একজন প্রফেসর অপরাধ তত্ত্বে এত বেশি পণ্ডিত যে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভরাও তাঁদের কাছে হার মানতে বাধ্য। নিচের ঘটনাটি শুনলেই তোমরা প্রফেসরদের বাহাদুরির কিছু কিছু প্রমাণ লাভ করবে।

বিখ্যাত ভিয়েনা শহর যে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী, এ-কথা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। ঐ ভিয়েনা শহরের পুলিশের বড়-সাহেবের কাছে একদিন ডাক-যোগে একটি পার্সেল এল।

পার্সেলের মোড়ক খুলেই বড়-সাহেবের চক্ষু স্থির আর কি! মোড়কটি

পুরানো খবরের কাগজের। তার ভিতরে একটি চল্‌তি সিগারেটের প্যাকেট, এবং প্যাকেটের মধ্যে রয়েছে মানুষের বাঁ হাত থেকে কেটে-নেওয়া একটি তর্জনী! দেখলেই বোঝা যায়, আঙুলটা কাটা হয়েছে মেয়েমানুষের হাত থেকে!

পাঁচ দিন পরে আবার এক পার্সেল এসে হাজির। তার মধ্যে রয়েছে স্ত্রীলোকের ডান হাত থেকে কেটে-নেওয়া একটি মধ্যমাঙুলি! আঙুলে আবার একটি বিয়ের আংটি!

বড়-সাহেব তো হতভম্ব! এ কী ভয়ানক কাণ্ড! পুলিশের বড়-সাহেব হয়ে জীবনে তিনি অনেক ভীষণ ব্যাপার দেখেছেন, কিন্তু এমন ভয়াবহ ব্যাপার তাঁর কল্পনারও অতীত! সাধারণ হত্যাকারী চুপি চুপি খুন করে মানে মানে কোনরকমে পালিয়ে যেতে পারলেই বাঁচে! কিন্তু এই পার্সেল দুটো যে পাঠিয়েছে, সে এত-বড় অসমসাহসী যে, নিজের পৈশাচিক কাণ্ডের নমুনা বার বার পুলিশের বড়-সাহেবের গোচরে আনতেও সঙ্কুচিত নয়!

সাধারণ খবরের কাগজের মোড়ক, সাধারণ সিগারেটের প্যাকেট এবং পার্সেলের উপরের ঠিকানাও লেখা একটি নতুন টাইপরাইটারের সাহায্যে। ডাকঘরের ছাপও ভিয়েনা শহরের।

ভিয়েনা শহরে কলকাতার চেয়েও বেশি লোক বাস করে, তার জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে-আঠারো লক্ষ। এত-বড় শহরের লক্ষ লক্ষ বাসিন্দার ভিতর থেকে কোন্ শয়তান যে পুলিশের বড়-সাহেবের সঙ্গে এই বীভৎস কৌতুক করছে, তা অনুমান করবার কোন সূত্রই পার্সেলের ভিতর থেকে পাওয়া যায় না। অথচ এই পাপিষ্ঠকে তাড়াতাড়ি ধরতে না পারলে পুলিশের নিন্দার আর সীমা থাকবে না!

আর কোন উপায় না দেখে বড়-সাহেব তখনি ইউনিভার্সিটির একজন পরিচিত প্রফেসরের কাছে ছুটে গেলেন।

প্রফেসর তাঁর বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষাগারে বসে সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন, "আঙুল দুটো দেখি!"

বড়-সাহেব মোড়ক, সিগারেটের প্যাকেট, কাটা-আঙুল দুটো ও আংটি বার করে টেবিলের উপরে রাখলেন।

খানিকক্ষণ মন দিয়ে পরীক্ষা করবার পর প্রফেসর বললেন, "হুঁ, আঙুলের অবস্থা দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, তর্জনীর পর যখন মধ্যমাঙুলি কেটে নেওয়া হয়, হতভাগ্য স্ত্রীলোকটি তখনো জ্যান্তো ছিল। মড়ার দেহ থেকে কাটা আঙুল এ রকম হয় না। হয়তো এখনো সে জ্যান্তো আছে। একটি জীবন্ত মেয়ের দুই হাত থেকে দুটো আঙুল কেটে নেওয়া হয়েছে, তাকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে খুন করা হচ্ছে।"

বড়-সাহেব শিউরে উঠে বললেন, "ভয়ানক প্রফেসর। ভয়ানক। আপনি তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করুন, হয়তো অভাগিনীকে এখনো আমরা বাঁচাতে পারি।"

প্রফেসর আঙুলের দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করে বললেন, "আঙুল দুটি দেখে বলা যায়, এ কোন সাধারণ ছোটলোকের মেয়ের আঙুল নয়। তারপর আঙুল দুটো যে-রকম সূক্ষ্মভাবে কাটা হয়েছে, তা দেখে মনে হয়,—"

বড়-সাহেব সাগ্রহে বললেন, "কি মনে হয় প্রফেসর, কি মনে হয়?"

"মনে হয়, শব-ব্যবচ্ছেদ করতে হত্যাকারী খুব অভ্যস্ত, আর ব্যবচ্ছেদ করবার অস্ত্রশস্ত্র তার কাছেই আছে। বড়-সাহেব, আমার বিশ্বাস, হত্যাকারী হয় সাধারণ ডাক্তার, নয় অস্ত্র-চিকিৎসক, নয় সে শব-ব্যবচ্ছেদাগারে কাজ করে। কারণ, অব্যবসায়ী লোক এমন কৌশলে আঙুল কাটতে পারে না।"

বড়-সাহেব এতক্ষণ পরে একটা বড় সূত্র পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

প্রফেসর বললেন, "এভাবে যন্ত্রণা দিয়ে যে নরহত্যা করে, সে নিশ্চয়ই নিষ্ঠুরতার ভক্ত। আংটিতে ঐ সূতোটা বাঁধা কেন?"

বড়-সাহেব হাস্য করে বললেন, "প্রফেসর, ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে ও-সূতোটা অত মন দিয়ে দেখবার দরকার নেই। হাত দিয়ে না ছুঁয়ে আংটিটা তুলবো বলে আমিই ঐ সূতো বেঁধেছি।"

প্রফেসর অতসী-কাঁচের ভিতর দিয়ে রঙীন সুতোটা দেখতে দেখতে বললেন, "সুতো আপনি বাঁধতে পারেন, কিন্তু সুতোর যে অংশ আংটির গায়ে বাঁধা ছিল, সেখানটা এমন বে-রঙা হয়ে গেছে কেন? আচ্ছা, দেখা যাক্।"

খানিকক্ষণ সুতোটা নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা করে প্রফেসর বললেন, "সুতোর ভিতরে **indigotin disulphonic** অ্যাসিড রয়েছে।"

বড়-সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, "ও-অ্যাসিড তো আমার ছিল না! কি কি কাজে ঐ অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়?"

প্রফেসর বললেন, "উপস্থিত ক্ষেত্রে হয়তো উল্‌কি তোলবার জন্যই ঐ অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়েছে। হুঁ, যা ভেবেছি তাই। এই দেখুন, কাটা মধ্যমাঙ্গুলির উপর থেকে উল্‌কি তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু অ্যাসিডে চামড়া ক্ষয়ে গেলেও, দাগ দেখে বোঝা যায়, আঙুলে উল্‌কিতে আঁকা ছিল একটা ছোট্ট সাপ।"

বড়-সাহেব বললেন, "ছোট্ট সাপ!"

—"হ্যাঁ, বড়-সাহেব! হত্যাকারী বোধহয় কোন স্ত্রীলোকের হাতে জোর করে একটা সাপ এঁকে দিয়েছিল! সে বোধহয় বলতে চেয়েছিল —'তুমি কালসাপিনীর মত দুষ্ট, তাই তোমার আঙুলে এই ছাপ দেগে দিলুম!' কিন্তু তারপরও স্ত্রীলোকটি বোধহয় তাকে পুলিশের ভয় দেখায়। হত্যাকারী তখন হয়তো বলে,—'তুমি আমাকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছ? বেশ, তাহলে পুলিশের কাছে যে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দেবে, তোমার সেই আঙুলই কেটে নিয়ে পুলিশের কাছে আমি উপহার পাঠাব!' কিন্তু আঙুলটা পাঠাবার সময়ে সাবধানী হত্যাকারী উল্‌কিটা তুলে ফেলবার চেষ্টা করেছিল!"

বড়-সাহেব বললেন, "প্রফেসর, এইবারে আপনি কবির মত কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন! এ-সব স্বাভাবিক কথা নয়।"

প্রফেসর হেসে বললেন, "হ্যাঁ, আমার এ অনুমান মিথ্যা হতেও পারে। কিন্তু মনে রাখবেন, আমরা কোন স্বাভাবিক হত্যাকারীর কীর্তি নিয়ে

আলোচনা করছি না ; কিন্তু সে-কথা এখন থাক্ ; আপনাকে আসল পথ তো আমি দেখিয়ে দিয়েছি। আপনি অস্ত্র-চিকিৎসকদের মধ্যেই হয়তো হত্যাকারীর সন্ধান পাবেন।"

পুলিশের বড়-সাহেবের হুকুমে তখনি দলে দলে ডিটেক্‌টিভ ও গুপ্তচর, ভিয়েনার বিভিন্ন শব-ব্যবচ্ছেদাগারে ও অস্ত্র-চিকিৎসকদের বাড়ির দিকে ছুটল এবং প্রত্যেক ডাক্তারের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা হল। ভিয়েনার বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে পুলিশ এতক্ষণ পরে একটা যেন দ্বীপের মত ঠাঁই খুঁজে পেলে, গোয়েন্দাদের আর দিশে-হারার মত হাবুডুবু খেতে হল না! এই খোঁজাখুঁজির ফলে কয়েকজন অসাধু ডাক্তার ধরা পড়ল বটে, কিন্তু আসল অপরাধী তখনো নিরুদ্দেশ হয়েই রইল।

তারপর একদিন একটি যুবক অস্ত্র-চিকিৎসক পুলিশের বড়-সাহেবের কাছে এসে যা বললে তা হচ্ছে এই :—

"আসল অপরাধী কে তা আমি জানি না বটে, কিন্তু আমার মনে একটা সন্দেহের উদয় হয়েছে।

কিছুদিন আগে আমাদের হাসপাতালে, আনা উইস্ নামে একটি মেয়ে-ডাক্তার কাজ করতে আসে। আনা যত রোগী দেখত, তাদের সকলকেই বলত, ডাঃ স্মিট্‌জ্-এর কাছে গিয়ে অস্ত্র-চিকিৎসা করতে। অথচ ডাঃ স্মিট্‌জ্ আমাদের হাসপাতালের দলভুক্ত নন্। পরে জানা যায়, ডাঃ স্মিট্‌জের সঙ্গে আনার বিয়ের কথা চল্‌ছে।

তারপর ডাক্তার-মহলে কানাঘুষায় শোনা গেল, ডাঃ স্মিট্‌জ্ নাকি একই রোগীর উপরে অকারণে বার বার অস্ত্র-প্রয়োগ করে ডবল তে-ডবল ফি আদায় করেন। যেন তিনি খুব সহজেই তাড়াতাড়ি বড়লোক হয়ে উঠতে চান!

কিছুদিন পরে শুনলুম, আনার সঙ্গে ডাঃ স্মিট্‌জের বিয়ের সম্পর্ক ভেঙে গেছে, তিনি বার্থা নামে আর একটি মেয়ে-ডাক্তারকে বিয়ে করতে চান।

দিন কয়েক হল, আনা আমাদের হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দিয়ে

চলে গিয়েছে। ডাঃ স্মিট্‌জ্‌ও এখন শহরের বাইরে গিয়েছেন, আর বার্থারেরও কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।"

গোয়েন্দারা এইবারে ডাঃ স্মিট্‌জের সন্ধান করতে লাগল।

স্মিট্‌জের এক পরিচিত রোগী খবর দিলে, সে ডাক্তারকে সামার্লিং-এর ট্রেন ধরতে দেখেছে। সামার্লিং হচ্ছে অস্ট্রিয়ারই একটি পাহাড়ে জায়গা, লোকে সেখানে হাওয়া বদলাতে যায়।

পাহাড়ের কোন নির্জন স্থানে একটি বাড়ি। গোয়েন্দারা সেইখানেই ডাঃ স্মিট্‌জ্‌কে আবিষ্কার করলে।

তখন অনেক রাত হয়েছে, স্তব্ধতা ভেদ করে সশব্দে বইছে কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস। অন্ধকার আকাশে একটা তারা পর্যন্ত উঁকি মারছে না। গোয়েন্দারা চুপি চুপি বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই সভয়ে শুনতে পেলে, মৌন রাত্রি হঠাৎ কেঁপে উঠল স্ত্রী-কণ্ঠের তীব্র ও তীক্ষ্ণ আর্তনাদে! কে যেন বিষম যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠেই আবার থেমে পড়ল!

আধ-অন্ধকারে একটা প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া মূর্তি আস্তে আস্তে সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল—তার পিছনে পিছনে একটি স্ত্রীলোক।

একজন ডিটেক্‌টিভ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, "ডাক্তার, তুমি আমাদের বন্দী।"

ডাক্তার এক লাফে পিছিয়ে গিয়ে বাড়ির দরজা আবার বন্ধ করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তার আগেই গোয়েন্দারা তাকে চারিদিক্ থেকে ঘিরে ফেললে। তখন আরম্ভ হল বিষম এক ধস্তাধস্তি। কিন্তু সেই বিপুলবপু মহা-বলিষ্ঠ ডাক্তারকে কাবু করা সহজ নয় দেখে, একজন গোয়েন্দা রিভলভারের বাঁট দিয়ে এত জোরে তার মাথায় আঘাত করলে যে, সে তখনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তার সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটিও ধরা পড়ল। সে হচ্ছে, বার্থা। ডাক্তারের নতুন বউ।

বাড়ির ভিতরের একটা ঘরে, অস্ত্রোপচারের টেবিলের উপরে পাওয়া গেল হতভাগিনী আনাকে অর্ধ-অচেতন অবস্থায়। তার দুই হাতে ব্যাণ্ডেজ

বাঁধা, ইথারের গন্ধে ঘর পরিপূর্ণ।

কয়েক ঘণ্টা পরে আনা বললে, "হ্যাঁ, ডাঃ স্মিট্জ্ আমাকে বিয়ে করবেন বলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে অস্ত্র-চিকিৎসা করবার জন্যে রোগীদের পরামর্শ দিতুম। একই রোগীর দেহে অকারণে বার বার অস্ত্র চালিয়ে ডাক্তার অন্যায়রূপে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতেন।

তারপর ডাক্তার আমাকে ছেড়ে, বার্থাকে বিয়ে করতে চান। সেই-জন্যে আমি রাগ করে বলি, তাঁর অন্যায় চিকিৎসার কথা পুলিশের কাছে প্রকাশ করে দেব। ডাক্তারও তখন খাপ্পা হয়ে একদিন আমাকে ধরে জোর করে আমার হাতে উল্কির এক সাপ এঁকে দেন।

তারপরেও আমি পুলিশে খবর দিতে চাই শুনে তিনি আমার কাছে মাপ চেয়ে অনুতপ্তভাবে বললেন, "আচ্ছা, আমি তোমাকেই বিয়ে করব। কিন্তু বিয়ের আগে আমি হপ্তাখানেকের জন্যে সামার্লিং-এ হাওয়া বদ্লাতে যেতে চাই, তুমিও আমার সঙ্গে চল।"

আমি খুব খুশি হয়ে বোকার মত ডাক্তারের সঙ্গে এখানে চলে আসি। তারপর আমার এই দুর্দশা হয়েছে। ডাক্তার আর বার্থা দুজনে মিলে আমার দু-হাতের দুটো আঙুল কেটে নিয়েছে। আঙুল কেটে নিয়ে ডাক্তার আমাকে বলেছে, 'কালসাপিনী! তোমার আঙুলে কালসাপ এঁকে দিয়েছি, তবু তোমার চৈতন্য হয়নি। আচ্ছা, ধীরে ধীরে সমস্ত হাত কেটে নিয়ে আমি তোমার বন্ধু পুলিশকেই উপহার দেব।'

আপনারা না এলে এই দানব আর দানবী আমার দেহকে খণ্ড খণ্ড করে আমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করত।"

ডাঃ স্মিট্জের আর বিচার হল না। কারণ, গোয়েন্দার রিভল্ভারের চোটে তার খুলি ফেটে গিয়েছিল এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়। বার্থা গেল জেলখানায়।

ভিয়েনা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের বাহাদুরিটা দেখলে তো? যেন মন্ত্রশক্তি-বলেই শূন্যতার ভিতর থেকে সূত্র আবিষ্কার করে অনুমানে তিনি যা যা বলেছিলেন, তার একটা কথাও মিথ্যা হল না, এবং তিনি না থাকলে পুলিশ এ-মামলার কোনই কিনারা করতে পারত না।

পারিসের কুব্জ রাজা

পারিসের পুলিশ-দপ্তরে একটি আশ্চর্য ছোক্‌রার জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ আছে, সেইটিই তোমাদের শোনাব। মনে রেখ, এই অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনীর একটি বর্ণও আমার বানানো নয়।

নাম তার—আবাদি। সে নিশ্চয় কোন হাড়-গরিব হা-ঘরে বাপ-মায়ের ছেলে। যখন তার বয়স মোটে এক দিন, সেই সময়েই তার বাপ-মা তাকে পারিসের রাজপথে ফেলে পালিয়ে যায়।

আবাদি রাস্তায় পড়ে বেড়াল-কুকুরের বাচ্চার মত কাঁদতে লাগল। এক বুড়ি ন্যাক্‌ড়া কুড়ুনী সেখান দিয়ে যেতে যেতে তার কান্না শুনতে পেলে। সে খালি ন্যাক্‌ড়া কুড়ত না, পথে পথে ভিক্ষাও করত। বুড়ি বুঝলে, এই খোকাটিকে দেখিয়ে সে খুব সহজেই লোকের মন ভেজাতে পারবে। সে তখনি আবাদিকে কোলে করে নিয়ে গেল।

বুড়ি যা ভেবেছিল, তাই। তার কোলে ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া-জড়ানো, অতটুকু একটি কচি খোকাকে দেখে সকলেরই দয়ামায়ার সঞ্চার হয়।
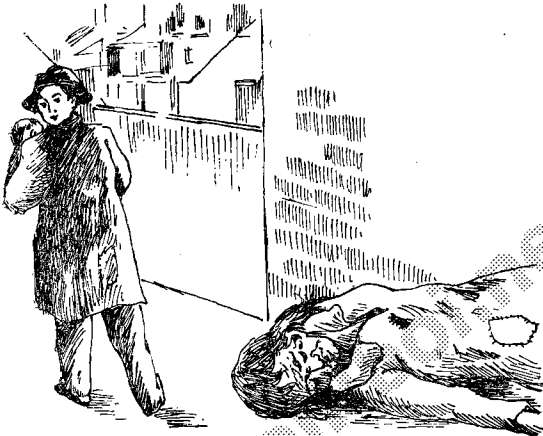
প্রত্যেকেই বুড়ির হাতে কিছু-না-কিছু গুঁজে দেয়। এইভাবে তার রোজগার খুব বেড়ে গেল।

ইতিমধ্যে একদিন উঁচু জায়গা থেকে পাথরের মেঝের উপরে পড়ে গিয়ে আবাদির শিরদাঁড়া গেল দুম্‌ড়ে বেঁকে। বয়সে কচি বলে সে প্রাণে বেঁচে গেল বটে, কিন্তু তাকে দেখতে হল বিকলাঙ্গ কুঁজোর মত।

এদিকে বুড়ির রোজগার দেখে পারিসের অন্যান্য ভিখারির চোখ টাটিয়ে উঠল। তারা বুঝলে, বুড়ির শ্রীবৃদ্ধির কারণ হচ্ছে ঐ আবাদি।

অন্য এক ভিখারি একদিন বুড়িকে খুন করে আবাদিকে চুরি করে নিয়ে গেল। সেখান থেকে সে কিছুদিন পরে আবার হাত-ফের্তা হল। বছর-কয়েক বয়সের মধ্যে আবাদি এইভাবে নানা ভিখারির ঘরে আশ্রয় লাভ করলে।

নানা চরিত্রের ভিখারীর সঙ্গে থেকে, ছয় বছর বয়সেই আবাদি হয়ে উঠল খুব চালাক-চতুর। সে জাল-অন্ধ ও নকল-খোঁড়া সেজে কেবল ভিক্ষা করতেই শিখলে না, চুরি-বিদ্যাতেও তার হাতে-খড়ি হল। ক্ষুদে দেহ নিয়ে যে-কোন গর্ত দিয়ে গলে সে লোকের বাড়ির ভিতরে ঢুকত, তারপর যা পেত তাই নিয়েই বাইরে পালিয়ে আসত। পথে কোন অন্ধ বা পঙ্গু ভিখারি বসে আছে, হঠাৎ আবাদি এসে তার ভিক্ষা-করা টাকা-পয়সা তুলে নিয়ে দিলে দে-ছুট্।

আবাদির মতন ছেলে যে চুরি-জুয়াচুরি শিখবে, এটা খুব আশ্চর্য কথা নয়! সে মানুষ হয়েছে চোর-জুয়াচোরের ঘরেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, লেখাপড়ার দিকে ছিল তার অত্যন্ত প্রাণের টান। কোন মাস্টার সে পায়নি, কেউ তাকে পড়াশুনো করতে বলেনি, কিন্তু তবু কি বিচিত্র উপায়ে সে লিখতে পড়তে শিখেছিল তা জানো?

তার ভিখারী-মনিবরা প্রতিদিন যখন এক দুই তিন করে পয়সা গুণত ও হিসাব করত, আবাদি তখন মন দিয়ে শুনত! এই উপায়ে সে ছোটখাটো অঙ্ক শিখে নিলে। পারিসের রাজপথে বিজ্ঞাপনের 'পোস্টার'

ও বিভিন্ন রাস্তার নাম দেখে তার বর্ণ-পরিচয় হয়ে গেল। পড়তে শিখলে বটে, তাকে বই কিনে দেবার লোক নেই। কিন্তু আঁস্তাকুড় খুঁজে সে গৃহস্থদের ফেলে-দেওয়া ছেঁড়া বই ও পুরানো খবরের কাগজ কুড়িয়ে আনত এবং তার দ্বারাই পুস্তকের অভাব দূর করত।

আরো একটু বড় হয়ে আবাদি পথের ধারের 'বুক-স্টল' থেকে দোকানীর অগোচরে বই চুরি করতে লাগল। পথে-ঘাটে বা পার্কে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ছবির ও গল্পের বই নিয়ে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ কোথা হতে আবাদি এসে চিলের মতন ছোঁ মেরে বই কেড়ে নিয়ে আবার কোথায় চম্পট দিলে। পারিসের বড় বড় বাড়ির নিচে মাটির তলায় কুঠুরি থাকে। এমন একটি কুঠুরি ছিল আবাদির আড্ডা। সেখানে সে রীতিমত একটা লাইব্রেরি বানিয়ে ফেললে।

তার মতন বুদ্ধিমান ছেলে যদি সৎপথে থাকত, তাহলে আজ হয়তো পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় ও শ্রদ্ধা-সম্মানের অধিকারী হতে পারত। কিন্তু অসৎপথে গিয়ে সে প্রকৃত মানুষ হবার সব সুযোগ থেকেই বঞ্চিত হয়েছে। পুলিশ-দপ্তরের বাইরে কোথাও তার ঠাঁই নেই।

আবাদির বয়স যখন এগারো বছর, তখন সে স্বাধীন, কোন ভিখারীর তাঁবে আর কাজ করে না। জোর করে বা ধমক দিয়ে তাকে তাঁবে রাখবার ক্ষমতাও কোন ভিখারির ছিল না। প্রথম প্রথম সে অন্ধ বা পঙ্গু ভিখারীদের পুঁজিপাটা লুট করেই অন্নের সংস্থান করত। তারপর অত অল্প লাভে তার মন আর খুশি হত না। তের বছর বয়সে এক ধনীর বাড়িতে হানা দিয়ে সে অনেক টাকা কড়ি নিয়ে সরে পড়ল। পুলিশ এই ছোট্ট কুঁজো চোরের বর্ণনা পেলে, কিন্তু তার খোঁজ পেলে না। পনেরো বছর বয়সে আবাদি তার মতন আরো তিনজন ছোকরা সহকারী পেলে, তারা তাকে 'সর্দার' বলে ডাকতে শুরু করলে। দু-বছরের মধ্যে তার দলে আরো তিনটি ছোকরা যোগ দিলে। দল নিয়ে আবাদি-সর্দার নিয়ম ক'রে চুরি-ব্যবসা চালাতে লাগল। একদিন তারা এক গুদামে

চুরি করতে ঢুকেছে, এমন সময়ে পাহারাওয়ালার আবির্ভাব! কিন্তু আবাদি-সর্দার ও তার দলবলের হাত থেকে বিষম উত্তম-মধ্যম লাভ করে পাহারাওয়ালা হল কুপোকাৎ! সতেরো বছর বয়েসে আবাদি প্রথম রক্তের স্বাদ পেলে। এক ডিটেক্‌টিভ তাকে গ্রেপ্তার করতে এল, কিন্তু আবাদি ছোরা মেরে তাকে বেহুঁশ করে ফেললে।

আবাদির দলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারিস-শহরে চুরি-রাহাজানি অসম্ভব বেড়ে উঠল। কারুর লোহার সিন্দুক ভাঙে, কারুর পকেট যায় কাটা, কারুর মাথায় পড়ে লাঠি। শহরে হৈ-চৈ উঠল।

আবাদির এই সময়কার একখানা ডায়েরী পাওয়া গিয়েছে। তাতে সে লিখেছে: "জীবন হচ্ছে, যুদ্ধ। যে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তাকেই আমি মারব। মানুষের সমাজে দুটো দল দেখি। একদলের সব আছে, আর-একদলের কিছুই নেই। যাদের সব আছে, তাদের মাথা কেটে নিয়ে আমি আমার অভাব পূরণ করতে চাই। দুর্বলকে ভক্ষণ করুক বলিষ্ঠরা এবং পুলিশ গণনা করুক ক-জন মারা পড়ল।"

সত্যসত্যই পুলিশকে গণনা আরম্ভ করতে হল। একের নম্বর হচ্ছে —কেচ্। কেচ্ ছিল আবাদি-সর্দারের ডানহাত। সর্দার কানাঘুষোয় খবর পেলে, তাকে পথ থেকে সরিয়ে কেচ্ দলপতি হতে চায়! দুদিন পরেই পুলিশ কেচের মৃতদেহ আবিষ্কার করলে। তার বুকে ছোরার আঘাত!

দুইয়ের নম্বর হচ্ছে, এক জহুরী। আবাদি-সর্দার তার দোকান আক্রমণ করেছিল এবং সে বোকার মত বাধা দিতে গিয়েছিল। তখনি তার মুণ্ড গেল উড়ে।

তিনের ও চারের নম্বর হচ্ছে, এক গৃহস্থ ও তার মেয়ে। আবাদি-দলের একজন চুরি করতে গিয়ে গৃহস্থের বন্দুকের গুলিতে মারা পড়ে। দিনকয় পরে আবাদি প্রতিহিংসা নেবার জন্যে গৃহস্থ ও তার মেয়েকে হত্যা করে এল।

এইভাবে পুলিশের গণনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলল।

সারা শহরে হল মহা বিভীষিকার সঞ্চার, কারুরই ধন-প্রাণ আর নিরাপদ নয়। অন্ধকার পাতাল-রাজ্যের কুজ-রাজা আবাদি, বয়স তার

আঠারো বৎসর মাত্র, কিন্তু এই বিকলাঙ্গ বালকের ভয়ে সকলেই থরহরি কম্পমান।

পারিসের বিশ্ববিখ্যাত পুলিশের লজ্জা ও অপমানের সীমা নেই। তারা আবাদির নাম শুনেছে, চেহারার বর্ণনা পেয়েছে, কিন্তু তার ঠিকানা জানে না। উপরওয়ালাদের কাছে ধমক খেয়ে খেয়ে, বড় বড় নামজাদা ডিটেক্‌টিভদের প্রাণ হল ওষ্ঠাগত।

মার্টিন নামে এক ছোকরা তখন গোয়েন্দা-বিভাগে সবে ঢুকেছে। সে ভাবলে, আবাদি-সর্দারকে যদি ধরতে পারি, তাহলে আমার উন্নতিতে বাধা দেয় কে? সেও তলে-তলে খোঁজ নিতে লাগল, কিন্তু কোথাও তার পাত্তা পেল না।

ইতিমধ্যে আর-এক খবর শোনা গেল। পেরুগিন্ নামে এক দুরাত্মা তার খুড়িকে খুন করে প্রাণদণ্ডের হুকুম পেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই সে কারারক্ষীকে হত্যা করে জেল ভেঙ্গে পালিয়েছে। পুলিশ সন্দেহ করে, সে নাকি পারিসে এসেই লুকিয়ে আছে। নানান খবরের কাগজে পেরুগিনের চেহারারও বর্ণনা বেরুলো। তার গায়ের জোরও যেমন ভয়ানক, শরীরও তেমনি লম্বা-চওড়া। একে আবাদি-সর্দারকেই নিয়ে লোকের প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ, তার উপরে আবার এই খুনে পেরুগিনের কথা শুনে সকলের পিলে গেল চম্‌কে। এখন কাকে রেখে কাকে সামলানো যায়?

পারিসের কোন কোন কফিখানায় ভদ্রলোকেরা প্রাণ গেলেও ঢোকে না। সেখানে কেবল চোর, ডাকাত ও হত্যাকারীর আড্ডা বসে। তোমরা বোধহয় জান না, কলকাতাতেও ওই ধরনের কফিখানা আছে, তাদের মালিকরাও গুণ্ডাদের সর্দার।

পারিসের ঐ শ্রেণীর কফিখানায় হঠাৎ একজন নতুন লোকের আবির্ভাব হল। লম্বায়-চওড়ায় চেহারা মস্ত-বড়, সে কারুর সঙ্গেই কথা কয় না, নিজের মনেই খেয়ে-দেয়ে চলে যায়।

চোর ও বদমাইসের দলে কৌতূহল জাগল, এই লোকটা কে?

কফিখানার মালিক বললে, "চেহারা আর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, ও সেই পেরুগিন্ ছাড়া আর কেউ নয়। খবরের কাগজে আমি পড়েছি, মার্সিলিসের জেল ভেঙ্গে পেরুগিন্ পালিয়ে এসেছে।—আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটু আলাপ করেই দেখা যাক্না কেন?"

মালিক, লোকটির কাছে গিয়ে শুধোলে, "কি হে ভায়া, মার্সিলিস থেকে আসছ নাকি?"

লোকটি লাফ মেরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "তোর নিকুচি করেছে! যদি এসেই থাকি, হয়েছে কি?" বলেই সে কোমরবন্ধে হাত দিলে। তার কোমরবন্ধে রয়েছে মস্ত এক ছোরা!

মালিক বললে, "হুঁ, তুমি দেখছি একটি জাঁহাবাজ বাজপক্ষী! বহুৎ আচ্ছা, এস তবে, আমার সাঙাতদের সঙ্গে বসে খেয়ে-দেয়ে একটু ফুর্তি করবে চল!

লোকটি নারাজ হল না। দলে গিয়ে মিশল বটে, কথাবার্তা বড়-একটা কইলে না। নাম জিজ্ঞাসা করাতে বললে, "ফ্রাঙ্কোইস্"। কিন্তু সবাই বুঝলে, তার আসল নাম—পেরুগিন্।

আবাদির কানে এই খবর গেল। সে স্থির করলে, এমন কাজের লোককে হাতছাড়া করা হবে না। তার আড্ডায় ফ্রাঙ্কোইসের নিমন্ত্রণ হল। কিন্তু আবাদি-সর্দার বয়সে ছোক্‌রা হলে কি হয়, সে মহা হুঁশিয়ার ব্যক্তি। প্রথমেই সে দেখা দিলে না, আগে আড়াল থেকে লুকিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে ফ্রাঙ্কোইস্‌কে পরীক্ষা করলে। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হলে পরে সে বেরিয়ে এল!

কিন্তু ফ্রাঙ্কোইস প্রথমটা কিছুতেই তার দলে ভর্তি হতে রাজি হল না। কয়েকদিন সাধাসাধির ও অনেক লোভ দেখাবার পর শেষটা সে স্বীকার পেলে।

ঠিক সেই সময়ে ফ্রান্সের এক মন্ত্রীর বাড়ি লুট করবার জন্যে দলের মধ্যে ষড়যন্ত্র চলছিল। মন্ত্রি-বাড়ির এক দাসী ছিল আবাদি-সর্দারের চর। সে এসে খবর দিয়েছে, বাড়ির সমস্ত লোকজন নিয়ে মন্ত্রী বিদেশে

হাওয়া খেতে গেছেন, বাড়িতে আছে খালি সে আর একজন দ্বারবান।

আবাদি ঠিক করলে, প্রথমেই এই ব্যাপারে ফ্রাঙ্কোইস্‌কে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সে তার সাহস, বুদ্ধি ও শক্তি পরীক্ষা করবে।

যথাসময়ে সন্ধ্যার পর আবাদি-সর্দারের এক চ্যালা একখানি দামী মোটরগাড়ি চুরি করে নিয়ে এল। আবাদি ও ফাঙ্কোইস্ দস্তুরমত হোম্‌রা-চোম্‌রার মত সাজপোশাক পরে মন্ত্রীর বাড়ির উদ্দেশে রওনা হল।

তখন পথঘাট নির্জন। তাদের সন্দেহ করতে পারে এমন কেউ নেই।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে আবাদি ও ফ্রাঙ্কোইস্ দেখলে, একখানা আরাম-চেয়ারে আধ-শোওয়া অবস্থায় দ্বারবান নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দিচ্ছে।

আবাদি তার মোটা লাঠিগাছটা বাগিয়ে ধরে পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেল।

আচম্বিতে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত দ্বারবান এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে আবাদিকে ধরে তুলে আছাড় মারলে!

আবাদি মাটির উপরে পড়েই চোখের নিমেষে অটোমেটিক রিভলভার বার করে বারংবার ঘোড়া টিপতে লাগল, কিন্তু কী ভয়ানক, ঘোড়া পড়ে তবু টোটা ফাটে না!

আবাদি চিৎকার করে উঠল, "ফ্রাঙ্কোইস্! গুলি করে ওকে মেরে ফেল!"

কিন্তু দ্বারবানের পাশে দাঁড়িয়ে তার বন্ধু হাসতে হাসতে বললে, "আমি ফ্রাঙ্কোইস্ নই, আমি পেরুগিন্‌ও নই—আমি হচ্ছি, ডিটেক্‌টিভ মার্টিন! তোমার রিভলভার থেকে আমিই টোটা সরিয়ে ফেলেছি!"

হিংস্র গোখ্‌রোর মত ফোঁশ্ করে উঠে আবাদি বললে, "ও, তাই নাকি? বেশ, তাহলে ধর আমাকে!"...বলেই, সে জামার পকেট থেকে সুদীর্ঘ এক ছোরা বার করে ফেললে!

মার্টিনের সঙ্কেত শুনে তখনি গুপ্তস্থান থেকে পাঁচজন সশস্ত্র পাহারা-ওয়ালা আত্মপ্রকাশ করলে!

বিফল আক্রোশে পাগলের মত হয়ে আবাদি দীর্ঘ ছোরাখানা শূন্যে

তুলে তীব্রবেগে মার্টিনকে ছুঁড়ে মারলে। এমন তার হাতের টিপ্ যে, মার্টিন সাঁৎ করে সরে না দাঁড়ালে ছোরাখানা নিশ্চয়ই তার বুকে গিয়ে বিঁধত!

মার্টিন বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে আবাদির গলা টিপে ধরে বললে, "হতভাগা, শয়তান! তোকে বধ করলেও কোন পাপ হয় না, কিন্তু তা আমি করব না। নে, এখন হাতকড়ি পর্!"

মার্টিনের নখদর্পণে ছিল আবাদির সব ঘরের খবর। একে-একে তার দলের প্রত্যেকেই ধরা পড়ল।

আবাদিকে অভয় দিয়ে বলা হল, "তুমি যদি সরকারী-সাক্ষী হয়ে সব কথা স্বীকার কর, তাহলে তোমার দলের সবাইকে শাস্তি দিয়ে, তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।"

সে সদর্পে বললে, "আমি হচ্ছি, আবাদি-সর্দার! দলের প্রত্যেককে রক্ষা করব বলেই আমি সর্দার হয়েছি। আমি তাদের কারুর বিপক্ষেই সাক্ষী হব না, আমার যা হয়, হোক!"

—"তোমাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তুমি কি করবে?"

—"যা করছিলুম তাই করব! আড্ডায় ফিরে গিয়ে আবার নতুন দল গড়ব।"

বিচারের ফলে, আবাদিকে সুদূর কালিফোর্ণিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হল, কারাবাসের জন্যে।

আবাদি বললে, "তোমরা হুকুম দিয়েছ বলেই যে আমাকে যাবজ্জীবন কারাবাস করতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমি ঠিক আবার পালিয়ে আসব।"

কিন্তু আবাদি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেনি। কারাগারেই জ্বর-রোগে অকালে তার মৃত্যু হয়।

মানুষ যা চায়, আবাদি নিজের চেষ্টায় সে-সমস্তই অর্জন করেছিল—বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি। কেবল কুপথে গিয়েই সে সব ব্যর্থ করলে।

এ-যুগের সবচেয়ে বড় ডাকাত

এক

আজ পর্যন্ত অনেক ডাকাত ও খুনীর গল্প শোনা গেছে, কিন্তু, ফরাসী-ডাকাত বোনোটের ভয়ঙ্কর দলের কাছে সে-সব গল্প হচ্ছে খুব ঠাণ্ডা গল্প।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বরের সকালবেলায় ঝর্‌ঝর্‌ করে বৃষ্টি ঝরছে।

পারিসের এক বড় ব্যাঙ্ক সবে দরজা খুলেছে। কেবি ও পীম্যান নামে ব্যাঙ্কের দুই কর্মচারী কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে এখনি আসবে, কর্তৃপক্ষ তাদেরই জন্য অপেক্ষা করছেন।

ব্যাঙ্কের কাছেই রাস্তার উপরে একখানা মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—তার জানালা-দরজা বন্ধ, কিন্তু মেসিন বন্ধ নয়।

কেবি ও পীম্যানকে দেখা গেল ;—তারা গল্প করতে করতে ব্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে আসছে।

তারা ব্যাঙ্কের দরজার কাছে এল। হঠাৎ বন্ধ মোটরগাড়ির দরজা খুলে দুজন লোক রাস্তার উপরে লাফিয়ে পড়ল—তাদের হাতে রিভলভার।

তাদের রিভলভার গর্জন করলে—কেবি মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল। একজন লোক তার হাতের টাকার ব্যাগ নিয়ে টানাটানি করতে লাগল, কিন্তু কেবি আহত হয়েও ব্যাগ ছাড়তে রাজি নয় দেখে সে আবার রিভলভার ছুঁড়ে তাকে একেবারে কাবু করে ফেললে। তারপর সে ব্যাগ নিয়ে এক লাফে মোটরের উপরে চড়ে বসল।

রাস্তা তখন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। অনেক লোক মোটরের দিকে ছুটে এল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মোটরের ভিতর থেকে দুদিকে দুখানা হাত বেরিয়ে পড়ল—প্রত্যেক হাতেই এক-একটা রিভলভার অগ্নি উদ্‌গার করছে। জনতার বীরত্ব উবে গেল—যে যেদিকে পারলে পালিয়ে

প্রাণ বাঁচালে। একখানা লরি পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না—মোটরখানা তীরের মতন বেগে তাকে এড়িয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল।

পুলিশের টনক নড়ল। তাদের চরেরা চারিদিকে খোঁজ নিয়ে এসে খবর দিলে, মোটরের মধ্যে ছিল বোনোট্ নামে একজন লোক ও তার সঙ্গীরা। মোটরখানাও একটা নদীর ধারে পাওয়া গেল—সেখানা চুরি-করা মোটর।

কিন্তু বোনোট্‌কে পুলিশ কিছুতেই আর ধরতে পারে না। সে ভারি চালাক—আজ এ-বাসা, কাল ও-বাসা করে বেড়াতে লাগল, কোথাও ছু-একদিনের বেশি থাকে না। পুলিশ যখন খোঁজ পেয়ে তাকে ধরতে যায়, তখনি গিয়ে দেখে বোনোট্ আগেই তাদের ফাঁকি দিয়ে সরে পড়েছে। এইভাবে এগারো বার সে পুলিশের চোখে ধুলো দিলে।

থিয়েইস্ নামক স্থানে দুজন ধনী লোক বাস করত—স্বামী ও স্ত্রী। এক রাত্রে কারা তাদের খুন করে অনেক টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল। পুলিশ সন্ধান নিয়ে জানলে, এ হচ্ছে, বোনোটের দলের কাজ।

একদিন একজন পুলিশের লোক হঠাৎ দেখতে পেলে, চমৎকার একখানা মোটর চালিয়ে বোনোট্ রাজপথ দিয়ে যাচ্ছে। সে এক-লাফে মোটরের পা-দানীর উপর উঠে পড়ল—কিন্তু বোনোটের গুলি খেয়ে পরমুহূর্তেই তাকে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হল। সে মোটরখানাকেও পরে শহরের একজায়গায় ভাঙা-চোরা অবস্থায় পাওয়া গেল এবং সেখানাও চুরি-করা মোটর।

মাসখানেক পরে কাউন্ট রৌগেট তাঁর মোটরে চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, আচম্বিতে তিনজন বন্দুকধারী লোক এসে গাড়ি থামিয়ে বললে, "গাড়িখানা এখনি আমাদের ছেড়ে দিতে হবে।"

ড্রাইভার ইতস্ততঃ করলে—সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলিতে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। কাউন্ট গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু তিনিও গুলি খেয়ে যত জোরে পারেন পা চালিয়ে দিলেন।

বন্দুকধারীরা হচ্ছে বোনোট্ ও তার দুজন সঙ্গী। কাউন্টের গাড়িতে আরো কয়েকজন দলের লোককে তুলে নিয়ে তারা আর-এক ব্যাঙ্কের দরজায় এসে দাঁড়াল। তারপর দরজায় দুজন লোককে পাহারা দেবার জন্যে রেখে তিনজন সঙ্গী নিয়ে বোনোট্ বুক ফুলিয়ে ব্যাঙ্কের ভিতরে প্রবেশ করলে।

তারপর তারা দুচোখা গুলি চালাতে লাগলো। ব্যাঙ্কের তিনজন লোককে হত ও আহত করে ভাণ্ডার লুটে টাকা নিয়ে ডাকাতের দল আবার সরে পড়ল।

এবারে পুলিশ অনেকটা সাবধান হয়েই ছিল। মোটরে ও মোটর-বাইকে চড়ে দলে দলে পুলিশ, ডাকাতদের পিছনে পিছনে ছুটল।

কিন্তু তাদের কাছে যায় কার সাধ্য। গাড়ির ভিতর থেকে রাশি রাশি গুলি ছুটে আসছে। একটা স্টেশনের কাছে এসে ডাকাতরা মোটর থেকে নেমে ট্রেনে চড়ে বসল। পুলিশের লোকেরা পরের স্টেশনে গিয়ে তাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু তার আগেই পথের একটা বাঁকের মুখে এসে ট্রেন যখন তার গতি কমিয়ে দিলে, বোনোট্ নিজের লোকজন নিয়ে গাড়ি থেকে অদৃশ্য হল।

পারিসের সমস্ত লোক ক্ষেপে উঠে বলতে লাগল—পুলিশ কোন কাজের নয়, তাদের অকর্মণ্যতায় আমরা এইবারে ধনে-প্রাণে মারা পড়ব।

পুলিশের বড়কর্তা প্রমাদ গুণে নিজেই কোমর বেঁধে কার্যক্ষেত্রে নামলেন। এমন ভয়ানক সাহসী ডাকাতের কথা তিনি কখনো শোনেননি। ইচ্ছা করলে এরা অনায়াসেই বিদেশে গিয়ে পুলিশকে কলা দেখাতে পারে, কিন্তু তা না করে পুলিশের চোখের সামনে শহরে বসে এরা যা-খুশি-তাই করছে। পুলিশের বড়সাহেব বোনোট্‌কে আবিষ্কার করবার জন্যে একশো কুড়িজন ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত করলেন।

দুই

গজির ব্যবসা ছিল, চোরাই-মাল কেনা। পুলিশ সে-খবর রাখত।

ডিটেক্‌টিভ জোইন ও কোল্‌মার একদিন সদলবলে গজির বাসায় গিয়ে বললেন, "তুমি নিশ্চয় বোনেটের খবর রাখো। শীগ্‌গির তার ঠিকানা বল।"

গজি বললে, "দোতলায় একটা ঘরে একখানা খাতায় বোনেটের ঠিকানা লেখা আছে। আমি এখনি গিয়ে নিয়ে আসছি।"

জোইন ও কোল্‌মারের কেমন সন্দেহ হল, তাঁরাও গজির সঙ্গে সঙ্গে উপরে গেলেন।

একটা ঘরের সামনে গিয়ে গজি বললে, "ঐ যাঃ, ঘরের চাবিটা নিচে ফেলে এসেছি। আপনারা একটু দাঁড়ান, চাবি নিয়ে আমি এখনি ফিরে আসছি।"—সে আবার একতলায় নেমে গেল।

কিন্তু ঘরের দরজায় চাবি দেওয়া ছিল না। কারণ, কোল্‌মার ঠেলতেই দরজা খুলে গেল।

জোইন ও কোল্‌মার রিভলভার বার করে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন —তৎক্ষণাৎ নিবিড় অন্ধকার ভেদ করে আর-একটা রিভলভারের অগ্নিশিখা গর্জে উঠল।

কোল্‌মার তখনি সেইদিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অন্ধকারেই কাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে মাটির উপরে পেড়ে ফেললেন।

কিন্তু সে কাবু না হয়ে উল্‌টে রিভলভার ছুঁড়ে কোলমারকেই জখম করলে। তারপর জোইনের পালা! বোনোটের রিভলভার আবার অগ্নিবৃষ্টি করলে, জোইনও ধরাশায়ী হলেন।

রিভলভারের শব্দে নিচে থেকে একজন পুলিশের লোক ছুটে এল। একটা দেশালাইয়ের কাঠি জ্বেলে সে দেখলে, ঘরের মেঝের উপরে রক্ত-গঙ্গার মাঝখানে তিন-তিনটে মৃতদেহ স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে। তার পায়ের শব্দ পেয়ে বোনোট্‌ও মৃত্যুর ভান করে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

পাহারাওয়ালাটা তাড়াতাড়ি খবর দেওয়ার জন্যে আবার নিচের দিকে ছুটল। সেই ফাঁকে উঠে পড়ে বোনোট্‌ জানলা খুলে বেরিয়ে ছাদে চড়ে চম্পট দিলে!

তিনদিন পরে বোনোট্‌ গ্রেনঘড্‌ নামে এক দপ্তরীকে আক্রমণ ও আহত করলে। সে মিথ্যা সন্দেহ করেছিল যে, ঐ দপ্তরীই তার বিরুদ্ধে থানায় খবর দিয়ে এসেছে!

তিন

ডুবইস্‌ ছিল বোনোটের বিশেষ বন্ধু। গোয়েন্দারা খবর পেলে, বোনোট্‌ তার বন্ধুর মোটরগাড়ির কারখানায় লুকিয়ে আছে।

তখনই পুলিশের ফৌজ সেইদিকে ছুটল!

বোনোট্‌ তখন কারখানার বাইরে একখানা মোটর-বাইকে চড়বার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ পুলিশের আবির্ভাব দেখেই সে বাড়ির বাইরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে ছুটল এবং সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারও ছুঁড়তে লাগল। দুজন ইন্‌স্পেকটার তার অব্যর্থ লক্ষ্যে আহত হলেন। পুলিশের পল্‌টনও বাড়ি আক্রমণ করলে, কিন্তু অশ্রান্ত গুলিবৃষ্টির চোটে সকলে আবার পিছিয়ে আসতে বাধ্য হল।

কারখানা-বাড়িটা ছিল একেবারে খোলা জায়গায়। কোনো দিক

দিয়েই লুকিয়ে তার কাছে এগুবার উপায় ছিল না।

চারিদিক্ থেকে খবর পেয়ে দলে দলে লোক বন্দুক প্রভৃতি নিয়ে ছুটে এল—পুলিশকে সাহায্য করবার জন্যে।

কিন্তু বোনোট্ ও তার স্যাঙাত ডুবইসের রিভলভারের ঘন ঘন গর্জন শুনে কেউই আর বাড়ির কাছ ঘেঁষতে ভরসা করলে না!

বেলা দশটার সময় পুলিশ-সাহেব বুঝলেন, কেবল পাহারাওয়ালাদের সাহায্যে বোনোট্‌কে বন্দী করা যাবে না! তখন খবর দিয়ে সৈন্যদের আনানো হল!

খড়ে-বোঝাই মালগাড়ির আড়ালে লুকিয়ে সৈন্যেরা ডিনামাইট দিয়ে বাড়ির দেওয়ালের খানিকটা উড়িয়ে দিলে।

কিন্তু তবু বিশেষ সুবিধা হল না। বরং ভাঙা-দেওয়ালের ভিতর দিয়ে বোনোট্ ও ডুবইসের বন্দুক আরো বেশি গুলিবৃষ্টি করবার সুযোগ পেলে!

বৈকাল পর্যন্ত সমানে যুদ্ধ চলল—একপক্ষে পুলিশ-বাহিনী, সৈন্যদল ও সারা শহরের বাসিন্দা, ও অন্যপক্ষে মাত্র দুটি প্রাণী! এমন যুদ্ধ কখনো হয়নি!

কিন্তু অসম্ভব কবে সম্ভব হয়? সৈন্যেরা ডিনামাইটের সাহায্যে বাড়ির আরো-খানিকটা ভেঙে ফেলে তার চারিদিকে আগুন লাগিয়ে দিলে।

তারপর সকলে একসঙ্গে বাড়িখানাকে আক্রমণ করলে।

বাড়ির ভিতর থেকে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

নিচের তলায় দেখা গেল, ডুবইসের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, তার গায়ে তিন-তিনটে গুলির চিহ্ন! উপর-তলার ভগ্নস্তূপের ভিতরে গিয়ে পুলিশ-সাহেব প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলেন না।

তারপর দেখলেন, রাশীকৃত আজে-বাজে জিনিসের তলা থেকে একখানা হাত দেখা যাচ্ছে এবং সেই হাতে রয়েছে একটা রিভলভার!

হাতসুদ্ধ রিভলভারটা কাঁপতে-কাঁপতে উঠে আর-একবার অগ্নিবৃষ্টি করলে!

সেইসঙ্গে পুলিশ-সাহেবও রিভলভার ছুঁড়লেন।

হাতখানা নেতিয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

সেই হাত ধরে পুলিশ-সাহেব বোনোট্‌কে টেনে বার করলেন।

বোনোটের তখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। তার দেহের বারো জায়গায় ও মাথার তিন জায়গায় বুলেটের ক্ষতচিহ্ন!

শহরের বাসিন্দারা বোনোটের দেহকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবার উপক্রম করলে। অনেক কষ্টে তাদের নিবারণ করে বোনোট্‌কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু বিশ মিনিট পরেই তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

তার জামার ভিতরে পাওয়া গেল লেখাটুকু :

"আমি আমারই মত জীবনযাপন করব। প্রত্যেক লোকেরই বাঁচবার অধিকার আছে। কিন্তু তোমাদের ঐ পাপী ও নির্বোধ সমাজ যখন আমাকে বাঁচতে দিতে রাজি নয়, তখন কি আর করা যায়? আমাকে মরতেই হল!"

চার

ডাকাত-সর্দার বোনোট্ মরল বটে, কিন্তু তার ডানহাত ও বামহাত এখনো বেঁচে আছে! তার দল এখনো ভাঙেনি।

গার্ণিয়ার আর ভ্যালেট্‌, এরাই ছিল বোনোটের ডানহাত আর বামহাতের মত।

কিন্তু সারা দেশের চোখে তারা কতদিন ধুলো দিতে পারে? হপ্তা-দুয়েক পরে খবর পাওয়া গেল, তারা নদীর ধারে একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করছে! কেবল তাই নয়, দরকার হলে লড়াই করবার জন্যে তারা এই বাড়িখানাকে কেল্লার রসদখানায় পরিণত করেছে এবং এ-বাড়িখানাও এমন জায়গায় আছে যে, কোনোদিক থেকেই লুকিয়ে তার কাছে ঘেঁষবার উপায় নেই।

তখনি বাড়িখানাকে অবরোধ করবার ব্যবস্থা হল। চোদ্দখানা মোটর

ভর্তি করে পুলিশের লোক ছুটল এবং তাদের সঙ্গে চলল শত শত সৈন্য, কলের-কামান-শ্রেণী ও অনেকগুলো সার্চলাইট। এ যেন কোন দেশ-জয়ের আয়োজন।

আক্রমণকারীরা যথাস্থানে হাজির হয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, খবর পেয়ে তাদের আগেই হাজার হাজার লোক শত শত মোটরে চড়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

তখন রাতের বেলা। উজ্জ্বল সার্চলাইটগুলো কিন্তু রাতকেও দিন করে ফেললে। বড় বড় লোহার থামের আড়ালে দেহ ঢেকে পুলিশ ও ফৌজ ডাকাতদের বাড়ি আক্রমণ করলে, কলের-কামানগুলো চেঁচিয়ে লোকের কানে তালা ধরিয়ে দিতে লাগল, এবং চতুর্দিক্ কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল থেকে থেকে ডিনামাইটের গভীর গর্জনে।

গার্নিয়ার ও ভ্যালেট্ও হাত গুটিয়ে বসে রইল না, তাদেরও বন্দুকের গুলিতে আক্রমণকারীদের কেউ কেউ হত ও আহত হল।

নয় ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলল অশ্রান্তভাবে। অসংখ্যের বিরুদ্ধে মাত্র দুজনের আত্মরক্ষার এমন কাহিনী কোন ইতিহাসেই লেখা নেই।

রাত চারটের সময়ে বন্দুক, রিভলভার ও কলের-কামানের অগ্নি-বৃষ্টিতে ক্ষত বিক্ষত সেই ছোট বাড়িখানা ডিনামাইটের মুখে প্রায় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল।

কিন্তু তখনো তার ভিতর থেকে আর একবার বুলেটের ঝড় ছুটে এল—সেই শেষ-বার। তারপর সব চুপচাপ। পুলিশ ও সৈন্যগণ সেখানে গিয়ে পেলে কেবল গার্নিয়ার ও ভ্যালেটের মৃতদেহ। অসংখ্য গুলির চোটে তাদের দেহ ঝাঁজরা হয়ে গেছে।

কিছুদিনের ভিতরেই বোনোট্-সম্প্রদায়ের আর সব লোকও ধরা পড়ল। অনেকের যাবজ্জীবন জেল হল এবং অনেকে গিলোটিনে প্রাণ দিলে। কেউ করলে আত্মহত্যা।

কিন্তু বোনোটের দলের কেউ কম যায় না। ক্যারুয়ি নামে বোনোটের এক সঙ্গীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে। কিন্তু পাছে সে আত্মহত্যা করে,

এই ভয়ে তাকে উলঙ্গ অবস্থায় জেলখানায় বন্ধ করে রাখা হল। তবু একদিন সে ফাঁক পেয়ে বানরের মত দেওয়াল বেয়ে পাঁচ তলায় ছাদের উপরে গিয়ে উঠল এবং চিৎকার করে বললে, "ঘড়িতে যেই বারোটা বাজবে, অমনি আমি এখান থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দেব!"

জেলের কর্তা কাকুতি-মিনতি করে বললেন, "ছিঃ, অমন কাজ কি করতে আছে? লক্ষ্মীছেলেটির মতন নিচে নেমে এস!"

ক্যারুয়ি সে-কথা আমলেই আনলে না।

জেলের কর্তা তখন পাঁচ-তলার ছাদে লোক পাঠিয়ে তাকে ধরবার উদ্যোগ করলেন। ক্যারুয়ি তখন কাকুতি-মিনতি ক'রে বললে, "ছিঃ, অমন কাজ কি করতে আছে? বেলা বারোটার আগে কারুকে ওপরে পাঠিও না, তাহলে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে যে।"

জেলের কর্তা তার কথা আমলেই আনলেন না, তাকে ধরবার জন্যে লোক পাঠালেন। কিন্তু সে লোক উপরে আসবার আগেই ক্যারুয়ি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করলে!

এই বোনোট্ ও তার দলের কথা যখন মাঝে মাঝে ভাবি তখন মনে হয় যে, বিপথে চালিত হয়ে এদের এমন অতুলনীয় বীরত্বও ব্যর্থ হয়ে গেল। নিজেদের সাহস ও শক্তির অপব্যবহার না করলে পৃথিবীর শ্রদ্ধা-পূজা লাভ করে আজ হয়ত তারা নিত্য-স্মরণীয় হতে পারত।

হিংস্রুক পশুজীবন যাপন করে বলেই বাঘ-সিংহকে কেউ বীর বলে ডাকে না।

ইয়াঙ্কি খোকা-গুণ্ডা

ইয়াঙ্কি বলে ডাকা হয়, আমেরিকানদের। আর গুণ্ডা কাকে বলে তোমরা সকলেই তা জানো। গুণ্ডা নেই এমন দেশও বোধহয় দুনিয়ায় নেই। কিন্তু গুণ্ডামিতে এখন সকল দেশের সেরা বোধকরি ইয়াঙ্কিদেরই

দেশ। আজ তাদেরই দেশের বালক-গুণ্ডাদের কথা কিছু কিছু বলব।

প্রথমেই ইয়াঙ্কি গুণ্ডাদের নাম থেকেই শুরু করি। তাদের অনেকেরই ডাক-নাম ভারি মজার। যথা—খোকামুখো উইলি, পঙ্গু চার্চি, ক্ষ্যাপা বাচ, মস্ত মাইক্, পুঁচকে মাইক্, নকল হাঁস, নরকের বিড়াল ম্যাগি, হুচি-কুচি মেরি, খাই-খাই জোন্স, গ্যু গ্যু নক্স, ঝোড়ো লুই, ঘুঘু লিজি, সিদ্ধ ঝিনুক ম্যালয়, পুরুত প্যাডি, গল্‌দা-চিংড়ি কিড্, ছেঁড়া-ন্যাক্‌ড়া রিলে, ওদের ধরে-খাও জ্যাক্ প্রভৃতি।

ওদেশী-গুণ্ডাদের আড্ডাগুলোর নামও চমৎকার। যথা—আঁস্তাকুড়, নরকের রান্নাঘর, নরকের গর্ত, দেয়ালের গর্ত, মড়াঘর, প্লেগ, ধ্বংস, গোল্লায় যাবার পথ, রক্তের বালতি, আত্মহত্যার ঘর প্রভৃতি। ঐসব নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আমেরিকার গুণ্ডারা—জ্ঞান-পাপি।

অনাথ ছেলেরা লেখাপড়া না শিখলে ও গুরুজনের উপদেশ না পেলে কি হয়, আমেরিকায় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কারণ, আমেরিকার গুণ্ডারা গুণ্ডামি করতে শেখে প্রায় ছেলেবেলা থেকেই। ওখানকার কয়েকটি বিখ্যাত বালক-গুণ্ডাদের নাম হচ্ছে, চল্লিশ ছোট্ট চোর, ক্ষুদে মরা খরগোস, খোকা-গুণ্ডাদল প্রভৃতি। ঐসব দলের ছোকরাদের বয়স আট-দশ-বারোর বেশি না হলেও চুরি, জুয়াচুরি, পকেট কাটা, রাহাজানি ও খুনখারাপি প্রভৃতিতে তারা ধাড়ীদের চেয়ে কিছুমাত্র কম শয়তানি দেখায়নি!

ওদের একটি দলের দলপতির নাম খোকামুখো উইলি। সে নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে "গ্রাণ্ড-ডিউক থিয়েটার" নামে একটি রঙ্গালয় খুলে বাহাদুরির পরিচয়ও দিয়েছিল। তারা নিজেরাই নাটক লিখে অভিনয় করত! সিন ও সাজপোশাকের জন্যে তাদের কোন ভাবনাই ছিল না। কারণ, যা যা দরকার, শহরের বড় বড় থিয়েটারের ভাণ্ডার থেকে চুরি করে আনলেই চলত! এই শিশু-থিয়েটারের দর্শক হত নিউ-ইয়র্ক শহরের যত অনাথ বালক-বালিকা ও বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ছেলেরা এবং আসনের দাম ছিল মাত্র পাঁচ আনা পয়সা! কিছুদিন

থিয়েটার খুব-জোরে চলল। বাচ্ছা-গুণ্ডাদের ট্যাঁকে পয়সা আর ধরে না। কিন্তু তাদের বাড়-বাড়ন্ত অন্যান্য ছোকরা-গুণ্ডাদের দল সইতে পারলে না! তারা অভিনয়ের সময়ে রোজ এসে এমন দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু করলে যে, পুলিশ শেষটা শিশু-থিয়েটার উঠিয়ে দিতে বাধ্য হল।

পুঁচকে মাইক্ বলে এক ছোক্‌রা-গুণ্ডা মস্ত এক দুষ্ট ছেলের দল গড়ে কিছুকাল বেজায় উৎপাত শুরু করেছিল। তার নাম ছিল 'উনিশ নম্বর রাস্তার দল'। ও-দলের ছোক্‌রাদের স্বভাব ছিল এমনি ভয়ানক যে, পুলিশ পর্যন্ত তাদের কাছে ঘেঁষতে চাইত না! তাদের অত্যাচারে সে-অঞ্চলে পাদরীদের ইস্কুল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেত, কারণ ভালো ছেলেরা চোখের সামনে বসে পড়াশোনা করবে, এটা তাদের সহ্য হত না! ক্লাস বসলেই তারা বড় বড় ইট-পাথর ছুঁড়ত এবং পুঁচকে মাইক্ ঘরের ভিতর মুখ বাড়িয়ে মাস্টারদের ডেকে বলত, "ওরে বুড়ো পাদরির দল, তোরা নরকে যা—নরকে যা!"

তোমরা শুনলে অবাক হবে যে, কোন কোন শিশু-গুণ্ডাদলের চাঁই ছিল, বালিকা! 'চল্লিশ ছোট্ট চোর-দলে'র সর্দারনীর নাম ছিল পাগ্‌লী ম্যাগি কার্সন। নয় বছর বয়সেই সে চল্লিশটি শিশু-চোর নিয়ে শহরের লোকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। প্রত্যেক শিশু-চোরই তার হুকুমে প্রাণের তোয়াক্কা রাখত না। কিন্তু তার বয়স যখন বারো বৎসর, সেই-সময়ে মিঃ পিজ্ নামে এক পাদরী সাহেব তাকে সদুপদেশ দিয়ে শেলাইয়ের কাজ শেখান। শেলাইয়ের কাজে পাগ্‌লী ম্যাগির এমন মন বসে গেল যে, শিশু-গুণ্ডাদের মায়া কাটিয়ে সে একেবারে লক্ষ্মীমেয়ে হয়ে পড়ল! তারপর এক ভদ্র-পরিবারে আশ্রয় পেয়ে বিয়ে করে সে সুখে দিন কাটিয়ে দেয়।

ক্ষ্যাপা বাচ্ নামে আর-এক ছোক্‌রার কীর্তি শোনো। আট বছর বয়সে বাপ-মা হারিয়ে সে হয় অনাথ। তারপর দুষ্টু ছেলেদের দলে ভিড়ে সে একটা কুকুর চুরি করে তার নাম রাখলে র‍্যাবি এবং তাকে

হরেক রকম কৌশল শেখালো। রাস্তা দিয়ে মেম্-সাহেবারা হাতব্যাগ ঝুলিয়ে চলেছে, কোথা থেকে ঝড়ের মত ছুটে এল র‍্যাবি এবং চিলের মত ছোঁ মেরে হাতব্যাগ মুখে করে দিলে ভোঁ-দৌড়! তারপর র‍্যাবি ল্যাজ নাড়তে নাড়তে একেবারে মনিবের কাছে গিয়ে হাজির!

ক্ষ্যাপা বাচ্ আরো ঢের ফন্দি জানত। সেও একটা ছোট-খাটো চোরের দল গড়ে তুলেছিল। এবং তার কার্যপদ্ধতি ছিল এইরকম। বিশ-ত্রিশ জন শিশু-পকেটমার নিয়ে সে পথে বেরিয়ে পড়ত। নিজে যেত বাইসাইকেল চড়ে। পথে কোন বুড়ি বা দুর্বল লোক দেখলেই ক্ষ্যাপা বাচ্ তার গায়ে ইচ্ছা করে বাইসাইকেলের ধাক্কা লাগিয়ে দিত এবং তারপর গাড়ি থেকে নেমে পড়ে চেঁচিয়ে এমন গালাগালি শুরু করত যে, মস্ত ভিড় জমে যেত। কৌতূহলী লোকেরা যখন ব্যাপার কি জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠত, তখন ক্ষ্যাপা বাচের স্যাঙাতরা সকলের পকেটে সুপটু হাত চালিয়ে টপাটপ্ মনিব্যাগ প্রভৃতি তুলে নিয়ে সরে পড়ত! বলা বাহুল্য, দলের প্রধান পাণ্ডা বলে লাভের অংশ বেশির ভাগই হত তার পাওনা।

তোমরা পকেটমারের ইস্কুলের নাম শুনেছ?···না? কিন্তু আমেরিকায় সত্যি-সত্যিই এই ইস্কুল ছিল, আজও হয়তো আছে।

কোন দাগী পুরানো ও বয়স্ক গাঁটকাটা হয় এর মাস্টার। রাজ্যের ক্ষুদে বদমাইসরা হয় এর ছাত্র। ক্লাসে সাজানো থাকে নানান ভঙ্গিতে সারে সারে সাজ-পোশাক-পরানো মূর্তি। ছাত্রেরা সাবধানে সেই-সব মূর্তির পকেট কেটে বা পকেটে হাত চালিয়ে জিনিস তুলে নিতে চেষ্টা করে। প্রায়ই এমন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, পকেটের ভিতরে জামার কাপড়ে হাত লাগলেই টুং-টুং করে ঘণ্টা বেজে ওঠে। পকেট কাটতে গিয়ে ছাত্রদের এরকম কোন ভুল হ'লেই মাস্টার চোর পাহারাওয়ালার পোশাক প'রে এসে সপাসপ্ বেত মারতে থাকে!

ছোক্‌রা-গুণ্ডাদের দলে এক-একজন ভীষণ প্রকৃতির লোকও দেখা গেছে। যেমন, গোবর-গণেশ লুই। নাম তার গোবর-গণেশ বটে কিন্তু

গোঁফ ওঠবার আগেই সে মানুষ খুন করতে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল। খুব ভালো পোশাক পরে সর্বদাই সে ফিট্‌ফাট্‌ হয়ে থাকত বটে কিন্তু তার মনের ভিতরটা ছিল নোংরা ও ভয়াবহ।

কিড্‌ টুইস্ট্‌—আমেরিকার এক নামজাদা গুণ্ডা-সর্দার। বয়সে, গায়ের জোরে ও সহায়-সম্পদে সে লুইয়ের চেয়ে ঢের বড়। লুই কিন্তু এম্‌নি ডান্‌পিটে ছেলে যে, তাকেও গ্রাহ্য করত না। যে-টুইস্টের নাম শুনলে মহা ধড়িবাজ ইয়াঙ্কি-ডাকাতরা পর্যন্ত পালিয়ে যায়, লুই একদিন তার সঙ্গেই ঝগড়া করে বসল! অথচ সেদিন টুইস্টের সঙ্গে ছিল ঝোড়ো লুই নামে আর-একজন এমন ষণ্ডা গুণ্ডা, যে হাতের চাপে মানুষকে ভেঙে দুখানা করে ফেলতে পারত।

ঝগড়াটা বাধল এক হোটেলের দোতলায়। কিড্‌ টুইস্ট্‌ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, "ওহে ছোক্‌রা, শুনেছি তুমি খুব চট্‌পটে! আচ্ছা, এখনি ঐ জানলা দিয়ে রাস্তায় লাফ মারো দেখি।"

লুই বেচারা একলা মারামারি করতেও পারলে না, অত-উঁচু থেকে তার লাফ মারবারও ভরসা হল না। সে ইতস্ততঃ করতে লাগল।

কিড্‌ টুইস্ট চোখ রাঙিয়ে পকেট থেকে রিভলভার বার করতে উদ্যত হল। তখন লুই আর কি করে, বাধ্য হয়ে জানলা থেকে মারলে এক লাফ!

অল্প বয়স, হাল্‌কা দেহ, কাজেই দোতলা থেকে নিচে পড়েও তার খুব বেশি লাগল না। কিন্তু সে গুণ্ডা-সর্দার টুইস্টের উপরে মর্মান্তিক চটে গেল।

রাস্তায় দাঁড়িয়েই সে শুনতে পেলে, উপরে বসে টুইস্ট্‌ হেঁড়ে গলায় অট্টহাস্য করছে! লুই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, এ অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে সে জলগ্রহণ করবে না!

তখনি সে ফোন্‌ করে দলের জন-ছয়েক লোককে আনিয়ে হোটেলের দরজার কাছে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খানিক পরেই দেখা গেল, কিড্‌ টুইস্ট্‌ ও ঝোড়ো লুই সকলের

সভয় সেলাম কুড়োতে কুড়োতে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছে!

গোবর-গণেশ লুই হেসে বললে, "কিড্, এইদিকে এস।"

কিড্ টুইস্ট্ মুখ তুলে তাকাতে-না-তাকাতেই লুই রিভলভারের দুই গুলিতে তার মাথা ও বুক ছ্যাঁদা করে দিলে। পরমুহূর্তে তার মৃতদেহ পথের উপরে পড়ে গেল।

ঝোড়ো লুই বেগতিক দেখে পালাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু গোবর-গণেশের সাঙ্গোপাঙ্গরা তাকেও কুকুরের মত গুলি করে মেরে ফেললে।

একজন পাহারাওয়ালা দৌড়ে এল, কিন্তু গোবর-গণেশের রিভলভার আবার গর্জন করতেই সে বুদ্ধিমানের মত চট্‌পট্ সরে পড়ল।

কিছুদিন পরে গোবর-গণেশ যেচে পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করলে।

বিচারক তার নিতান্ত কাঁচা বয়স দেখে তাকে এগারো মাসের জন্যে সংশোধনী-কারাগারে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

গোবর-গণেশ লুই অবহেলা ভরে বললে, "মোটে এগারো মাস? ওঃ, ভারি তো! আমি শূন্যে পা তুলে মাথার উপর ভর দিয়েই এগারো মাস কাটিয়ে দিতে পারি।"

আর-এক ছোক্‌রা-গুণ্ডার গল্প বলে আমরা এবারের পালা শেষ করব। তার নাম হচ্ছে, ওনি ম্যাডেন। কিন্তু লোকে তাকে ডাকে, 'খুনী ওনি' বলে।

বিলাতে তার জন্ম। এগারো বছর বয়সে সে আসে আমেরিকায়। সতেরো বছর বয়সেই সে 'খুনী ওনি' নাম অর্জন করে। তার মারাত্মক বীরত্ব দেখে বড় বড় ইয়াঙ্কি-গুণ্ডারা মুগ্ধ হয়ে তার দলে গিয়ে ভর্তি হয়। তারপর একে একে পাঁচটা নরহত্যা করে খুনী ওনি সর্বপ্রথম পুলিশের পাল্লায় পড়ে জেল খাটে।

খুনী ওনি যখন পথে বেরুত, তখন তার সঙ্গে থাকত অনেক রকম অস্ত্রশস্ত্র। প্রথমবার জেল খাটবার আগে সে কখনো শারীরিক পরিশ্রম

করেনি। সারাদিন ঘুমিয়ে থাকত এবং সারারাত হোটেলে নেচে-গেয়ে ফুর্তি করে বেড়াত। টাকার দরকার হলেই রাহাজানি ও নরহত্যা করত —যাকে বলে, আদর্শ হিংস্র পশুর জীবন।

জেল থেকে বেরিয়ে সে আবার দুটি মানুষকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ আবার তার পিছনে লাগে। কিন্তু সাক্ষীর অভাবে তাকে ধরতে পারে না।

খুনী ওনি বুঝলে, এখন দিন-কয়েকের জন্য গা-ঢাকা দিয়ে ভালো-মানুষ সাজা উচিত। সে তখন কয়েকজন স্যাঙাতকে নিয়ে ভদ্রপাড়ায় একখানা বাড়ি ভাড়া করলে—বাড়িওয়ালার নাম কিটিং। সে সাধু ও গৃহস্থ ব্যক্তি; ভাড়াটেরা কোন শ্রেণীর লোক, ঘুণাক্ষরেও তা কল্পনা করতে পারেনি।

কিন্তু স্বভাব না যায় মলে। বিশেষ, বাঘ আর কতদিন শান্ত হয়ে থাকতে পারে? খুনী ওনি আর তার চ্যালা-চামুণ্ডারা সারা রাত নেচে-কুঁদে, হট্টগোল করে এত-বেশি ফুর্তি করতে লাগল যে, পাড়ার ভদ্র-লোকদের পক্ষে আশেপাশে তিষ্ঠানো দায় হয়ে উঠল।

একদিন সন্ধ্যায় তারা গান-বাজনা আরম্ভ করেছে, এমন সময়ে বাড়িওয়ালা কিটিং এসে হাজির।

বিরক্তমুখে ভারিক্কে-চালে কিটিং বললে, "পাড়ার লোকে রাগ করছে। আমার বাড়িতে এত গোলমাল করলে আমি তোমাদের উঠিয়ে দেব।"

ভারি মিঠে হাসি হেসে ওনি বললে, "বলেন কি মশাই, আমাকে আপনি উঠিয়ে দেবেন?...বেশ, বেশ। আচ্ছা, আপনি কি ওনি ম্যাডেনের নাম শুনেছেন?"

—"খুনী ওনি? তার নাম কে শোনেনি?"

—"বেশ, বেশ। তাহলে আর-একটা নতুন খবর শুনে রাখুন। আমারই নাম খুনী ওনি।"

কিটিং-বেচারা আর-একটাও কথা কইলে না, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিচে নেমে গেল। তারপর আর কোন হট্টগোলই সে কানে তুললে না,

পুলিশেও খবর দিলে না। কারণ, সে জানত, খুনী ওনিকে ধরিয়ে দিলে তার দলের লোকেরা এসে তাকে টিপে মেরে ফেলবে।

কিন্তু সে চুপ করে থাকলে কি হবে, পাড়া-পড়সীদের আর সহ্য হল না। থানায় খবর গেল। একজন পাহারাওয়ালা তদারক করতে এল। কিন্তু সে এসেই যেই শুনলে ভাড়াটের নাম খুনী ওনি, অমনি চোখ কপালে তুলে সরে পড়ল।

তারপর পুলিশ এল সদলবলে, সশস্ত্র হয়ে। কিন্তু খুনী ওনি তো সহজ ছেলে নয়, সহজে ধরাও দিলে না। রীতিমত একটা খণ্ডযুদ্ধের পরে তবে পুলিশ—খুনী ওনি ও তার বন্ধুদের পাকড়াও করে মারতে মারতে থানায় নিয়ে যেতে পারলে।

পরদিনেই বিচার। জজ-সাহেব কিন্তু খুনী ওনিকে নাবালক দেখে তাকে সৎপথে থাকতে উপদেশ দিয়ে মুক্তি দিলেন।

গুণ্ডাদের জগতে খুনী ওনির শত্রুও ছিল ঢের, কারণ, অনেকে তাকে হিংসা করত।

একদিন এক নাচঘরে খুব নাচ-গান চলছে, শত শত লোক আমোদ করছে, এমন সময়ে খুনী ওনি ধীরে ধীরে সেখানে প্রবেশ করলে। তাকে দেখেই সবাই ভয়ে তটস্থ, নাচ গেল থেমে এবং অনেকেই পালাবার উপক্রম করলে!

ওনি সবাইকে অভয় দিয়ে হেসে বললে, "তোমরা যত খুশি নাচো —গাও—আমোদ কর! ভয় নেই, আজ আমি মারামারি করতে আসিনি।" আবার নাচ শুরু হল, খুনী ওনি নিতান্তই নিরীহের মতন ব'সে নাচ দেখতে লাগল।

কিন্তু তখনি তার শত্রু-মহলে খবর রটে গেল যে, খুনী ওনি আজ একলা পথে বেরিয়েছে!

এগারো জন শত্রু নাচঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ওনি বাইরে আসতেই এগারোটা রিভলভার গুলিবৃষ্টি করলে। ছয়টা ওনির গায়ে ঢুকল—সে রাজপথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

হাসপাতালে পুলিশ যখন জিজ্ঞাসা করলে, "কারা তোমাকে মেরেছে।" ওনি তখন বললে, "সে-কথায় তোমাদের দরকার কি? কারুর নাম আমি বলব না। আমার চ্যালারাই তাদের শাস্তি দেবে।"

ওনি মিথ্যে জাঁক দেখায়নি। হপ্তাখানেকের মধ্যেই তার এগারো জন শত্রুর মধ্যে তিনজনকে পরলোকে প্রস্থান করতে হল।

এবং ওদিকে ছয়-ছয়টা গুলি খেয়েও খুনী ওনি মরল না। কিছু দিন পরে সে আবার সুস্থ দেহে হাসপাতাল থেকে ফিরে এল।

ইয়াঙ্কি-গুণ্ডাদের গল্প তোমাদের হয়তো ভালোই লাগছে; তোমাদের মধ্যে যারা 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার' খোঁজ, তারা হয়তো ভাবছো, কী মজার ওদের জীবন। কিন্তু তোমরা হয়তো জানো না যে, গুণ্ডারা প্রায় সকলেই জীবনে কখনো সুখী হতে পারে না। অধিকাংশ গুণ্ডারই পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সের ভিতরেই প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়; অনেকে যাবজ্জীবন কারাবাস ভোগ করে; যারা পুলিশকে ফাঁকি দেয়, তারা অনেকেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা নিজেদের মধ্যেই মারামারি করে অল্প বয়সেই মারা পড়ে।

দীর্ঘজীবী গুণ্ডা জেলখানার বাইরে খুব কমই দেখা যায়। যে দু-চারজন বাঁচে, তারা প্রভুত্ব ও শক্তি হারিয়ে প্রায় ভিখারীর মত কষ্ট পায়, কারণ, কোন গুণ্ডারই আধিপত্য বেশি দিন থাকে না। পরলোকের কথা কেউ জানে না। কিন্তু ইহলোকেই বেশির ভাগ গুণ্ডার পরিণাম হয় ভয়ঙ্কর। সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপনের পক্ষে পৃথিবীতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে, সৎপথ, এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই।

ফরাসী বিপ্লবে বাঙালীর ছেলে

কিছু কম দুশো বছর আগেকার কথা।

পৃথিবীর স্থলপথে তখন ডাকাতদের ভিড়, আর জলপথে বোম্বেটেদের জয়যাত্রা।

পৃথিবীর দেশে দেশে তখন দাস-ব্যবসা চলছে পুরো-দমে। বোম্বেটেরা জলে করত যাত্রীদের জীবন ও সর্বস্ব হরণ এবং আফ্রিকার ডাঙায় নেমে করত কালো মানুষ চুরি। লাল মানুষদের দেশ আমেরিকায় উড়ে গিয়ে জুড়ে বসে সাদা-মানুষরা গোলাম আর কুলির কাজে খাটাবে বলে এইসব কালো মানুষকে দাম দিয়ে কিনে নিত।

কালো মানুষ বলতে সাধারণত বোঝায়, কাফ্রীদের। হতভাগ্য কাফ্রী জাতি! ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকেই দেখি, পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য দেশেই কাফ্রীরা বন্দী হয়ে গোলাম রূপে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটছে! রোমে, আরবে—এমন কি, ভারতেও রাজা-বাদশা ও বড়লোকদের ঘরে ঘরে কাফ্রী গোলাম রাখার প্রথা ছিল।

আঠারো শতাব্দীতে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সম্ভ্রান্ত সমাজের সুন্দরী বিলাসিনীরাও সখ করে কাফ্রী গোলাম পুষতো। গোলামদের গায়ের রং সাদা নয় বলে তাদের মানুষ বলেই মনে করা হত না। আমরা যেমন কুকুর, বিড়াল ও পাখিদের আদর করে পুষি, অথচ তাদের উচ্চতর জীব বলে মনে করি না, ইউরোপীয় সৌখীন মেয়েরাও ঐ কাফ্রী গোলামদের সেই ভাবেই দেখতেন। দিগ্বিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়নের ছোট বোন

পলিন স্পষ্টই বলেছিলেন, "কাফ্রীদের সামনে আবার লজ্জা করব কেন? কাফ্রীরা মানুষ নাকি?"

আর-একটা কথা জানিয়ে রাখি। ইউরোপীয় সুন্দরীদের কাছে তখন সবচেয়ে বেশি আদর ছিল, কাফ্রী-জাতের ছোকরা গোলামদের।

বাঙালীদের রঙ কাফ্রীদের মতন কালো নয় বটে, কিন্তু তামাটে। সাহেবদের চোখে তামাটে ও কালো রঙের মধ্যে কোন তফাৎ ধরা পড়ে না। তারা দুই রঙকেই এক বলে ধরে নিয়ে গালাগালি দেয়। অথচ পর্তুগাল ও স্পেনের অনেক ইউরোপীয়েরও গায়ের রঙ অনেক ভারত-বাসীর চেয়ে কালো। কিন্তু ইউরোপে জন্মেছে বলে তারা কালো হলেও কালো নয়।

প্রায় দুশো বছর আগে বাংলায় ছিল ফিরিঙ্গী-বোম্বেটেদের বিষম দৌরাত্ম্য।

পূর্ব-বাংলা নদনদী-প্রধান বলে ফিরিঙ্গী-বোম্বেটে সেইখানেই অত্যাচার করবার সুবিধা পেত বেশি। তারা নৌকায় ও ছোট ছোট জাহাজে চড়ে নদী বেয়ে দেশের ভিতরে ঢুকত। মাঝে মাঝে ডাঙায় নেমে গ্রাম বা শহর লুট করে আবার পালিয়ে যেত। বোম্বেটেদের জ্বালায় পূর্ব-বাংলা তখন অস্থির হয়ে উঠেছিল।

একদিন শ্যামল বাংলার এক কালো শিশু হয়তো গ্রামের পথে বা নদীর ধারে আপন মনে নেচে-খেলে বেড়াচ্ছিল; কিংবা হয়তো সে স্নেহময়ী মায়ের কোলে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে খেলার স্বপন দেখছিল। হয়তো তার নাম ছিল কালু বা ভুলু, কানাই বা বলাই। হয়তো সে ছিল বাঙালী মুসলমানের ছেলে—তার নাম ছিল করিম বা অন্য-কিছু। এ-সব বিষয়ে ঠিক করে আমি কিছু বলতে পারি না। কারণ, ইতিহাস এ-সম্বন্ধে নীরব। ইতিহাস কেবল বলে, ঐ অনামা খোকাটি বাংলারই ছেলে।

গ্রামে হানা দিতে এসে ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদের শনির দৃষ্টি পড়ল হঠাৎ সেই খোকাটির উপরে। তাদের মনে পড়ে গেল, ইউরোপের সুন্দরী-মহলে কৃষ্ণবর্ণ শিশু-গোলামের ভারি আদর। এ কাফ্রী-শিশু নয় বটে, কিন্তু রঙ যার সাদা নয়, তাকে কাফ্রী ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

বোম্বেটেরা বাংলার সেই দুলালকে চুরি করে পালিয়ে গেল।

সেদিন সেই শিশু মাকে হারিয়ে এবং তার মা কোলের ছেলেকে হারিয়ে কত কেঁদেছিল, ইতিহাস তার বর্ণনা করেনি, কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি। আরো কল্পনা করতে পারি, সেখানকার সেই কান্না সারা জীবনই জেগে ছিল তার বুকের ভিতরে। এবং যারা তার এই কান্নাকে স্থায়ী করেছিল, সে যে তাদের ক্ষমা করতে পারেনি, এটাও আমরা জানতে পারব যথাসময়ে।

চল, তোমাদের কত সাগর কত নদীর ওপারে, কত যুগ আগেকার নতুন দেশে নিয়ে যাই।

দেশের নাম হচ্ছে, ফ্রান্স। দুশো বছর আগে ইউরোপে ফ্রান্সের তুলনা ছিল না। ফরাসীরা যে খাবার খায়, সারা ইউরোপ তাই খেতে ভালোবাসে; ফরাসীরা যে পোশাক পরে, সারা ইউরোপ তারই নকলে সাজগোজ করে।

এই বিখ্যাত দেশের মস্ত রাজা তখন পঞ্চদশ লুই। একদিকে লুই যে নির্দয় রাজা ছিলেন, তা নয়; কিন্তু রাজা হতে গেলে যে-যে গুণের দরকার, পঞ্চদশ লুইয়ের মধ্যে তা ছিল না। তিনি রাজকার্য দেখতেন না, সর্বদাই তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকতেন। ফলে ফ্রান্স হয়ে পড়ে অরাজক দেশের মত এবং প্রজাদের হয় অত্যন্ত দুরবস্থা। এইজন্যেই পঞ্চদশ লুইয়ের মৃত্যুর পর ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে প্রজারা ক্ষেপে উঠে বিদ্রোহী হয়ে রাজা-রাণী ও আমীর-ওমরাদের হত্যা করে। ইতিহাসে ঐ-সব ঘটনা ফরাসী-বিপ্লব নামে বিখ্যাত।

কাউণ্ট দ্যুব্যারীর বউয়ের সঙ্গে পঞ্চদশ লুইয়ের অত্যন্ত বন্ধুত্ব হয়—সে মাদাম দ্যুব্যারী নামে সুপরিচিত।

দ্যুবারী ছিল খুব সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। রাজা তার গল্প শুনতে ভালোবাসেন, তার পরামর্শে ওঠেন বসেন। দ্যুব্যারীর মুখের কথায় বড় বড় ওমরাকে রাজপদ থেকে বঞ্চিত করা হয়, আবার তার একটি ইঙ্গিতে পথের ভিখারীও আমীর হয়ে দাঁড়ায়! সকলেই তার অনুগ্রহ লাভের জন্য ব্যস্ত। কারণ, আগে সে খুশি না হলে, রাজা খুশি হন না।

দ্যুব্যারী রাজবাড়িরই এক মহলে থাকে। রাজা নিত্য তাকে দামী দামী ভেট পাঠান। নয় মণ ওজনের সোনার তাল এনে রাজা তার

ড্রেসিং টেবিলের আসবাব গড়িয়ে দিলেন। তার এক-একটি পোর্সিলেনের কফির পিয়ালার দাম হাজার হাজার টাকা। তার জামা-কাপড়ের দাম যে কত লক্ষ টাকা, সে হিসাব রাখা অসম্ভব। তার জড়োয়া গহনার বিনিময়ে একটি রাজ্য বিকিয়ে যায়। এইভাবে হ্যুব্যারীর মন রাখবার জন্যে রাজা দু-হাতে প্রজার টাকা খরচ করেন। রাজ্যময় অভাবের হাহাকার, কিন্তু প্রজাদের কাছ থেকে কেড়ে-আনা অর্থে হ্যুব্যারীর প্রমোদ-কক্ষ আলোকোজ্জ্বল! হ্যুব্যারীর নাম শুনলে প্রজারা জ্বলে ওঠে।

একটা তুচ্ছ নারীর শক্তি রাজার চেয়েও বেশি দেখে দেশের আমীর-ওমরারাও হ্যুব্যারীর উপরে খড়গহস্ত হয়ে উঠল।

হ্যুব্যারীর একটি কাফ্রী খোকা-গোলাম পোষবার শখ হল! বাজার থেকে তখনি একটি গোলাম কিনে আনা হল—যেমন করে কিনে আনা হয় বানর বা কুকুর।

সে হচ্ছে ফিরিঙ্গীদের চুরি-করে-আনা আমাদের সেই বাংলার অনামা ছেলে।

সোনার খাঁচায় বন্দী করলে বনের পাখি কি খুশি হয়? দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে বাপ-মায়ের আদরের কোল হারিয়ে বাংলার ছেলে ফিরিঙ্গী-রাজবাড়ির গোলামী পেয়ে কি খুশি হয়েছিল? একটু পরেই আমরা জানতে পারব।

গোলামকে হ্যুব্যারীর ভারি পছন্দ হল। পোষা কুকুরকে নাম দিতে হয়, নতুন গোলামকে কি-নামে ডাকা যায়?

সবাই শুধোয়, "ওরে তোর নাম কি?"

বাঙালীর ছেলে, ফরাসী ভাষা জানে না, কাজেই চুপ করে থাকে।

তখন একজন প্রিন্স তার নাম দিলেন, 'জামোর'। ইতিহাসে বাংলার ছেলে এই নামেই বিখ্যাত হয়ে আছে।

হ্যুব্যারীর কৃপায় জামোর খাঁটি সোনার কাজ-করা বহুমূল্য পোশাক পেলে। তার জন্যে ব্যবস্থা হল ভালো ভালো খাবারের। রাজবাড়ির ঘরে ঘরে হ্যুব্যারীর আদরের দুলাল হেসে-নেচে-খেলে বেড়ায়। যেখানে আমীর-ওমরার প্রবেশ নিষেধ, সেখানেও জামোরের অবাধ গতি।

আমীর-ওমরারা জামোরকে প্রসন্ন রাখতে ব্যস্ত, কারণ, সে দ্যুব্যারীর প্রিয়পাত্র। দ্যুব্যারী এক মিনিটও তাকে চোখের আড়ালে রাখতে পারে না—এত তাকে ভালোবাসে।

কিন্তু বাংলার ছেলে জামোর কি বুঝতে পারেনি, দ্যুব্যারী নিজের পোষা কুকুরকেও তার চেয়ে কম ভালোবাসেন না?

সাধারণ লোকেরা জামোরকে কাফ্রী বলেই জানত। কিন্তু ঐতিহাসিকরা স্পষ্টভাষায় তাকে "native of Bengal" বলে বর্ণনা করেছেন। বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর Decrenze দ্যুব্যারীর সঙ্গে জামোরের একখানি তৈল-চিত্র এঁকেছিলেন। দ্যুব্যারী কফির পেয়ালা নিয়ে পান করছে, আর বালক জামোর ঠিক প্রিয় কুকুরের মত কর্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে ট্রে হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। তার রঙ কালো বটে, কিন্তু তার নাক-মুখ-চোখে 'কাফ্রীত্ব' নেই। রাজ-চিত্রকর স্বচক্ষে জামোরকে দেখেই তার মূর্তি এঁকেছিলেন।

প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক গন্‌কোর্ট এই বলে জামোরের বর্ণনা করেছেন: "তাকে বিকটাকার মনুষ্যত্বের নমুনারূপে দেখা হত। সে সকলকে জল-খাবারের থালা যোগাত, মেয়েদের ছাতা বহন করত, খুশি হলে ডিগবাজি খেত। আঠারো শতাব্দীর বিজাতীয় রুচি এই শ্রেণীর ছোট্ট বিকৃতাকার জীবকে অত্যন্ত পছন্দ করত এবং নিগ্রোদের ভাবত ক্ষুদ্র দু-পেয়ে জন্তুর মত।

বাংলার ছেলে জামোর ফ্রান্সে থেকে নিশ্চয়ই ফরাসী ভাষা শিখেছিল। এবং সে যখন শুনত, তাকে বিকটাকার কাফ্রী ও দু-পেয়ে জন্তুর মতন দেখা হয়, তখন তার মন কি কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠত? এত সানুগ্রহ সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য কি তখন তার সর্বাঙ্গে বিষাক্ত কাঁটার মত বিঁধত না? শীঘ্রই এর উত্তর পাওয়া যাবে।

বাঙালী হচ্ছে—কাফ্রী। বাঙালী হচ্ছে—দু-পেয়ে জন্তু। কেননা, তার চামড়া কটা নয়।

ফ্রান্সের রাজার ছিল অনেক প্রাসাদ এবং প্রত্যেক প্রাসাদেই সর্বময় কর্তারূপে থাকতেন একজন করে গভর্নর। গভর্নরের পদে তখন পদবী-ওয়ালা সম্ভ্রান্ত লোক ছাড়া আর কারুকে বসানো হত না। একদিন রাজার কাছে দ্যুব্যারী আবেদন জানালে, "মহারাজ, আপনার লুসিয়েনেস্

প্রাসাদে গভর্নরের আসন খালি হয়েছে। আমার জামোরকে ঐ আসনে বসাতে চাই।"

পঞ্চদশ লুই চম্‌কে উঠে বললেন, "বল কি! সম্ভ্রান্ত লোক ছাড়া আর কেউ যে গভর্নরের পদ পায় না। জামোর গভর্নর হলে অন্যান্য গভর্নরদের মান কোথায় থাকবে? রাজ্যের লোক কি মনে করবে?"

দ্যুব্যারী বললে, "রাজ্যের লোকের কথা আমি গ্রাহ্য করি না! এখানকার আমীর-ওমরারা আমার শত্রু। আমি তাদের বুঝিয়ে দিতে চাই, আমার চোখে তারা জামোরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়।"

রাজা হেসে বললেন, "বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। এস জামোর, আজ থেকে তুমি গভর্নর! তোমার মাহিনা হল চারশো টাকা।"

সে-যুগে চারশো টাকার দাম এখনকার চেয়ে ঢের বেশি ছিল।

যে-দেশে জামোরের জন্ম, সেখানে পশু-বানরের বিবাহে কোন কোন মানুষ-বানর লাখ টাকা খরচ করেছে। সে-ও পোষা কুকুর-বিড়ালের মতন জীবন্ত খেলনা, তাকে গভর্নরের পদে বসিয়ে তার মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান দেখানো হল না, বরং তার নিচতাকে যে উঁচু করে তুলে ধরা হল দেশের উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মাথা নিচু করবার জন্যেই, এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি যে বাঙালীর ছেলে জামোরের ছিল না, এ-কথা মনে করা চলে না।

গন্‌কোর্ট হয়তো সেইজন্যেই বলেছেন, "প্রাসাদ হল গভর্নর জামোরের —বনের পাখির সোনার খাঁচার মত।"

'বিকটাকার মানুষ', 'দু-পেয়ে জন্তু' জামোর মহামান্য গভর্নর হয়ে মুখে নিশ্চয় একগাল হেসেছিল, কিন্তু তার অপমানিত মনের মধ্যে কী প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল, পরের দৃশ্যেই আমরা তা দেখতে পাব।

পরের দৃশ্যের যবনিকা তুললুম প্রায় বিশ বৎসর পরে।

ইতিমধ্যে পঞ্চদশ লুই মারা পড়েছেন, ষোড়শ লুই কয়েক বৎসর রাজ্য করে, পূর্বপুরুষদের পাপে নির্দোষ হয়েও বিদ্রোহী প্রজাদের হাতে রাণীর সঙ্গে প্রাণ দিয়েছেন।

সমস্ত ফরাসী জাতি রক্ত-পিপাসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সকলেরই মুখে এক কথা,—"এতদিন ধরে যারা প্রজাদের রক্ত শোষণ করেছে, আমাদের অনাহারে রেখে আমাদেরই কষ্টার্জিত অর্থে বিলাসের খেলনা কিনেছে, আজ তাদের রক্ত চাই!"

জামোর সেদিন রাজবাড়িতে ছিল না,—ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহী প্রজাদের সঙ্গে। সে আর বালক নয়, পূর্ণবয়স্ক যুবক। সেদিন সে আর কারুর গোলাম নয়, বাংলার সুনীল আকাশেরই মতন স্বাধীন। সেদিন সে ভালো করেই বুঝতে পেরেছে, তাকে 'দু-পেয়ে জন্তু' ভেবে এতদিন কারা তার মনুষ্যত্বকে ব্যঙ্গ করেছে!

বিচারালয়ের কাঠগড়ায় উঠে বন্দিনী ডুব্যারী সভয়ে স্তম্ভিত-নেত্রে দেখলে, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল, রাজবাড়ির পোষা জ্যান্তো খেলনা, বিকটাকার মনুষ্যত্বের নমুনা, জামোর। আজ জামোরের

মুখে কৃপাপ্রার্থী আবদারের হাসি নেই, তার দুই চক্ষে জ্বল্ জ্বল্ করছে বাংলাদেশের মুক্ত জাগ্রত মনুষ্যত্বের প্রতিহিংসা-বহ্নি!

জামোর একে একে ডুব্যারীর সমস্ত কথা প্রকাশ করে দিলে।

শেষ দৃশ্য।

চারিদিকে বিপুল জনতা। সকলেই চিৎকার করছে—"মার্, মার্। যারা মনুষ্যত্বকে মর্যাদা দেয়নি, গরিবকে মানুষ ভাবেনি, তাদের সকলকে হত্যা কর্।"

গিলোটিনের তলায় হাড়িকাঠে গলা দিয়ে অভাগিনী ত্যুব্যারী সকাতরে চেঁচিয়ে উঠল, "বাঁচাও, বাঁচাও। দয়া কর। আমার যথাসর্বস্ব দান করব।"

ভিড়ের ভিতর থেকে নিষ্ঠুর ভাষায় কে বললে, "তোমার যথাসর্বস্ব তো প্রজাদেরই নিজস্ব সম্পত্তি।"

গিলোটিনের খাঁড়া নেমে এল। ত্যুব্যারীর ছিন্নমুণ্ড আর কোন কথা কইলে না।

এ-দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। জনতার ভিতরে কি জামোরও ছিল?

জানি না।

ইতিহাস আর তাকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

শিকল-পরা বাঙালী গোলাম জামোর, ফরাসীদের সাহিত্যে ও চিত্রকলায় অমর হয়ে আছে। কিন্তু গোলামীর শিকল খুলে স্বাধীন জামোর কোথায় গেল, সে-কথা কেউ বলতে পারে না।

বনের পাখিকে সোনার খাঁচায় বন্দী করে কেউ ভেব না, তার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করছে। তোমরা যাকে মনে কর পাখির আনন্দের গান, সে হচ্ছে পাখির দারুণ অভিশাপ।